ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ -সহ রবীন্দ্রনাথ। ১৩১০

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
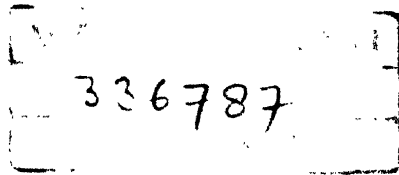
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র । ত্রয়োদশ খণ্ড

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে
লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮ : মার্চ ১৯৯২

শ্রীনিরঞ্জন সরকার ও শ্রীঅনাথনাথ দাস
-কর্তৃক সংগ্রথিত ও সম্পাদিত

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস । ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট । কলিকাতা ৪

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

১

২৫ মে ১৯০২

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

E.B.S.R

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

এইমাত্র আপনার চিঠি পাইলাম: আমি কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে আসিয়াছি। পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করিতেছিলাম। এখানে আসিয়া শরীর কিছু যেন ভাল আছে অন্তত মন নিরুদ্বেগ থাকাতে অনেক কাজ করিতে পারিতেছি। শীঘ্র ফিরিব সংকল্প ছিল কিন্তু বোধহয় বিলম্ব হইতে পারে। কাজ পড়িয়াছে।

পনেরো দিনের অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া গেলে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না। রুগ্‌ণ কন্যাকে ফেলিয়া চলিয়া আসিবেন এরূপ প্রত্যাশা করিব না।

কন্যার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে আমার মতে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শ্রেয় নহে কিন্তু নিকটে যখন হোমিয়োপ্যাথির ব্যবস্থা নাই তখন উপায়ান্তর দেখি না।

যাহা হউক, রথীর ভার আপনার উপর দিয়া আমি নিশ্চিন্তই আছি জানিবেন। ইতি ১১ই জ্যৈঃ ১৩০২ [১৩০৯]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ জুলাই ১৯০২

ওঁ [শিলাইদহ]

নমস্কার সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অদ্য আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যেরূপ ছুটি ইচ্ছা করিয়াছেন সেইরূপ লইবেন। এ পত্র যথাসময়ে পৌঁছিবে কি না জানি না। যে যে magazines বিলাত হইতে আনাইবার কথা ছিল তাহার তালিকা সুবোধ আজও আমাকে পাঠাইল না— সেইজন্য এ পর্য্যন্ত সেগুলি আনাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। ইতি ৩২শে আষাঢ়, ১৩০৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৭ জুলাই ১৯০২]

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

রেবাচাঁদ আর ফিরিবেন না। সুবোধ আজ রাত্রে বোলপুরে যাইতেছে। অবিনাশ বসু নামক Kinder Garten ওয়ালা একটি শিক্ষক পয়লা অগষ্ট হইতে কাজ আরম্ভ করিবেন। আপাততঃ আপনারা সকলে ভাগ করিয়া কাজ করিবেন—দেখিবেন ছোট ছেলেদের মধ্যে কোনপ্রকার

উচ্ছৃঙ্খলতা না দেখা দেয়— যথাসময়ে সমস্ত কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমাকে আজ রাত্রেই পুরী যাইতে হইবে। সেখানে আমার জমি আছে তাহা লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ গোল করিতেছে তাহা নিষ্পত্তি করিয়া আসিতে হইবে। হয়ত আমার বোলপুরে ফিরিতে আরো সপ্তাহখানেক বিলম্ব হইতে পারে। আপনারা কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হোরিকে এক ঘণ্টা করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ইংরাজি পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না কি? আমার শরীর মাঝে যেরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার চেয়ে ভাল আছে। আপনারা নূতন গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন কি? ইতি রবিবার [১১ শ্রাবণ ১৩০৯]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২০ অক্টোবর ১৯০২]

ওঁ

[কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

জগদানন্দ রেমিটেণ্ট্ জ্বরে শয্যাগত। সুবোধ তাহার কন্যার পীড়ায় আবদ্ধ। এই সকল আশঙ্কাতেই আমি পূজার সময় বিদ্যালয় বন্ধ রাখিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলাম। যাহা হউক্, এখন কি করিয়া সেখানকার কাজ চলিবে ভাবিয়া পাইতেছি না। পণ্ডিতমহাশয় নানা অনুনয় করিয়া স্বদেশ

হইতে তাঁহার পরিজনদের কলিকাতায় আনিতে গেছেন। সপ্তাহের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে— কিন্তু আমার মনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বাড়ীতে ব্যাম লইয়া আমি নড়িতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার মনে অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। সমস্ত যেন খেলার মত বোধ হইতেছে। সুবোধ যদি এখনও না আসিয়া থাকে তাহাকে একটা টেলিগ্রাফ করিয়া দিবেন। নরেন্দ্রও কি আসেন নি? তাঁহাকেও তাড়া দিবেন। এণ্ট্রেন্স্ ক্লাসের অঙ্কের কি গতি হইবে? রেমিটেণ্ট্ জ্বর সারিতে কতদিন লাগিবে এবং তাহার পরে বললাভ করিতেও কতদিন বিলম্ব হইবে কিছুই বলা যায় না— তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়াও দীর্ঘকাল জগদানন্দ পূরা কাজ করিতে পারিবেন না এবং মাঝে মাঝে জ্বরেও পড়িবেন তাহাতে সন্দেহ নাই— এজন্য আমি বারম্বার তাঁহার কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল হইয়াছে। আমি ঠিকা লোকের চেষ্টায় রহিলাম কিন্তু উভয়ের বেতন বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে— অতএব জগদানন্দ যে পর্য্যন্ত না আরাম হন ও পূরা কাজ করিবার বললাভ করেন ততদিন তাঁহাকে ক্ষতিস্বীকার করিতেই হইবে। ইতিমধ্যে আপনারা মিলিয়া, রথীদের অঙ্কচর্চ্চার যাহাতে ব্যাঘাত না হয় সে চেষ্টা করিবেন। শিক্ষকাভাবে আজকাল ছেলেদের অনেকটা সময় হাতে থাকিবে— বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন যাহাতে নষ্ট হইবার দিকে না যায়। রথীকে আপনার ঘরে শুতে দিবেন— তাহাকে প্রেম প্রভৃতির সঙ্গ হইতে দূরে রাখিবেন এবং

সর্ব্বপ্রকার নিয়মরক্ষায় বিশেষরূপে ব্রতী করিবেন। ছাত্রদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন শৈথিল্য ঘটিতে দিবেন না। আমি জানি আপনি এ সকল বিষয়ে উদাসীন নহেন তথাপি একান্ত উদ্বেগবশত আপনাকে লিখিলাম। এই অরাজকতার সময়টুকু আপনাকে বিশেষ সচেষ্ট ও সতর্কভাবে চালাইতে হইবে। ইতি বৃহস্পতিবার [৬ কার্ত্তিক ১৩০৯]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৭ অক্টোবর ১৯০২]

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

সিংহ তাহার বাড়িতে কালীপূজার দিনে রথী ও প্রেম সিংহকে লইয়া যাইবার জন্য ধরাধরি করিতেছে। এ প্রস্তাবে আমার উৎসাহ নাই। রথীর পড়াশুনার মধ্যে সম্প্রতি কোনপ্রকার অনিয়ম ঘটিতে দিতে ইচ্ছা করি না— বিশেষত যদি দৈবাৎ সেখানে গিয়া অসুখ বিসুখ হয় তবে মুস্কিলে পড়িতে হইবে— অতএব সাবধান থাকাই ভাল। প্রেমের পক্ষেও সকল দিক বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন তাহাই করিবেন।

সিংহের হাত দিয়া সেখানকার লাইব্রেরির জন্য Grant Duff's Mahrattas এবং Letters from a Mahratta Camp বই পাঠাইতেছি। আশা করি সে যথা অবস্থায়

আপনার হাতে তাহা দিবে। এ গ্রন্থ পড়িতে আপনার ঔৎসুক্য হইবে জানিয়াই কিনিয়াছি। পড়িবার সময়, যে সকল ঘটনা স্বতন্ত্রভাবে কাব্যে নাটকে বা উপাখ্যানে লিখিবার যোগ্য বোধ করিবেন দাগ দিয়া রাখিবেন।

সুবোধ এখনো আসিয়া পৌঁছিল না শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। সুবোধের সঙ্গে অচ্যুতের ফিরিবার কথা ছিল তাহার কিরূপ ব্যবস্থা হইল জানি না। এবারে ছাত্রদিগকে যাহাতে ভূগোল পড়ান হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিবেন। ভূগোল সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনভিজ্ঞতা অদ্ভুত ও হাস্যকর।

আশা করি রথীসন্তোষের পড়াশুনা অব্যাঘাতে চলিতেছে। নরেন্দ্র তাহাদিগকে জিয়োমেট্রি পড়াইতেছেন কিন্তু আ্যালজেব্রা ও পাটিগণিত বোধহয় বন্ধ আছে।

আমি এখানে রোগতাপ লইয়া অত্যন্ত উন্মনা আছি। আমার স্ত্রীর রোগ এখনো সারিবার দিকে গিয়াছে বলা যায় না। রেণুকার এখনো sore throat চলিতেছে— মীরা কাল জ্বরে পড়িয়াছে। কেবল শমী সম্প্রতি ভাল আছে। সে বোলপুরে যাইবার জন্য সর্ব্বদাই কাতরতা প্রকাশ করিতেছে। আমি যে কবে বোলপুরে ফিরিতে পারিব কিছুই বলিতে পারি না। ডাক্তার ছুটি চাহিতেছিলেন— কিন্তু এখন আমার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে কোনক্রমেই ছুটি দেওয়া চলে না— এইজন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ সত্ত্বেও দিতে পারিলাম না।

হরিচরণ যে সংস্কৃত পাঠ লিখিতেছিলেন সেটা বোধহয় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। হোরির খবরটা দিবেন। ইতি সোমবার [১০ কার্তিক ১৩০৯]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নভেম্বর ১৯০২]

ওঁ

[কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

আপনার চিঠি পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম।

এখানে আমার উদ্বেগের কারণ দূর হয় নাই। যদি[ও] স্ত্রীর অন্যান্য উপসর্গ শান্ত হইয়াছে তথাপি দুর্ব্বলতা এত অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে যে আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কুঞ্জবাবু শীঘ্রই বোলপুরে যাইবেন। আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানাবিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপনকার্য্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছি [করিয়াছেন]।

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত করিয়া ইঁহাকে লিখিয়া দিলাম। সেই লেখা আপনারা পড়িয়া

দেখিবেন— যাহাতে তদনুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইঁহাকে সেইরূপ সাহায্য করিবেন।

বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বভার আমি আপনাদের তিন জনের উপর দিলাম— আপনি জগদানন্দ ও সুবোধ। এই অধ্যক্ষ-সমিতির সভাপতি আপনি ও কার্য্যসম্পাদক কুঞ্জবাবু। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা পাশ করাইয়া লইবেন এবং সকল কা[ে]জই আপনাদের নির্দ্দেশমত চলিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছি আপনারা তাহা দেখিয়া লইবেন। নিয়মগুলির যেরূপ পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিবেন না।

রমাকান্তবাবুর ছেলে গেছেন আমি জানি। কুঞ্জবাবুর সঙ্গেও দুই একটি ছেলে যাইবে— ইহারাও বেতন দিবে।

অচ্যুতের আসা সম্বন্ধে আমি সন্দেহ করি। অক্ষয়বাবু বোধহয় বিরক্ত হইয়াছেন।

রথীদের কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিবেন। এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য করিবেন।

আপনার Reader অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া বড়ই খুসি হইলাম। কপি করিয়া আমাকে পাঠাইলে আমার মন্তব্য জানাইতে চেষ্টা করিব।

ঐতিহাসিক পাঠও আপনাকে লিখিতে হইবে। যখন অবসর পান ইহাতে হাত দিবেন।

ইংরাজের ভারতবর্ষ অধিকার সম্বন্ধে একটি যথার্থ ইতিহাস ছেলেদের জন্য লেখা আবশ্যক। British India

নামক একটি চটি বই পাইয়াছি তাহা অবলম্বন করিলে লেখা সহজ হইবে।

এখনি ডাক্তারের বাড়ি যাইতে হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি লিখিয়া বিদায় হইতেছি। শুনিলাম কুঞ্জঠাকুর একলা কাজ করিতে অক্ষমতা জানাইয়াছে— যথার্থ অবস্থা এবং কি করা কর্ত্তব্য আমাকে জানাইবে[ন]। পূর্ব্বে রান্নাঘরে শরৎ নামক যে চাকর কাজ করিত বোধহয় এখন তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে— যদি তাহাকে রাখিলে কাজের সুবিধা বোধ করেন তবে রবি সিংহকে পত্র লিখিয়া তাহাকে আনাইয়া লইবেন। ইতি

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ ডিসেম্বর ১৯০২

ওঁ [কলিকাতা]

বিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপক-দিগকে পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়। সর্ব্বাপেক্ষা

ভাল হয় যদি কুঞ্জবাবুকে নিয়মিত অধ্যাপনার কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। তিনি যদি আহারাদির তত্ত্বাবধানেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন তবে ছাত্রদের সহিত তাঁহার গুরুশিষ্যসম্বন্ধ থাকে না। ব্রাহ্মণেতর ছাত্রেরা কি অব্রাহ্মণ গুরুর পাদস্পর্শ করিতে পারে না?

আমি আগামী সোমবারে প্রাতের ট্রেনে বোলপুরে যাইব। আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ডিসেম্বর ১৯০২]

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয় সম্ভাষণ—

যেভাবে সর্ব্বপ্রকার ক্ষোভ প্রশান্ত করিয়া কার্য্যপ্রণালীকে পুনর্ব্বার নিষ্কণ্টক শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা ছিল অতিথি থাকাকালে তাহার অবসর পাওয়া অসম্ভব। প্রসন্নচিত্তে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন তাহা করিবেন এ সম্বন্ধে আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন আমি তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে পারি— বোধহয় সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ না করিয়া কাজ বিধিমত চালানো কঠিন নহে ইহা দেখানো সম্ভব। কিন্তু আপনারা যদি আমার শারীরিক

মানসিক সমস্ত অবস্থা চিন্তা করিয়া আমাকে কিছু পরিমাণে নিষ্কৃতি দিতে পারেন তবে আমি নিরুদ্বিগ্ন হই।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ জানুয়ারি ১৯০৩

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

আমি কয়েকদিন আপনাদের সংবাদ লইবার জন্য উৎসুক ছিলাম— কিন্তু সময় পাই নাই— কয়েকদিন নিয়ম রচনায় ব্যস্ত ছিলাম। সকল বিষয়েই পাকাপাকি নিয়ম না করিলে ক্রমশঃ শৈথিল্যের দিকে যাইবে— বিশেষত আমার অনুপস্থিতিকালে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। আমি শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথকে সকল বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি— তিনি যেরূপ বিধান করিয়া দিবেন তাহাই সকলে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিলে শৃঙ্খলা রক্ষা হইবে। এখন হইতে প্রত্যেকের প্রত্যেক কাজ বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এবার শান্তিনিকেতনে আসিবার সময় আপনি এবং জগদানন্দ আপনাদের বিছানা ও ভোজনপাত্র সঙ্গে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিবেন।

নরেন্দ্রনাথ কাল টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া গেছেন। বোধ করি কাজ পাইয়াছেন। তাঁহার স্থান শূন্যই রাখিলাম।

সুবোধ এখনো আসিয়া পৌঁছেন নাই— কাল সকালে আসিতেও পারেন।

হিসাব করিয়া দেখিলাম, ব্যাঙ্কে এখন আমার এক বৎসরেরও সঙ্গতি নাই— বৎসরশেষে বোধ হয় অনেক টাকা অনটন পড়িবে— অতএব এবারকার মত আপনার ঘর যদি না করি মাপ করিবেন— শুনিয়াছি আপনার ভাই এখনো দেশ ছাড়িবার কোনও ব্যবস্থা করেন নাই, অতএব এখন আপনার তেমন বেশি তাগিদ নাই। পূবদিকে যে ভিত পত্তন করা হইয়াছে তাহার উপরে ল্যাবরেটরি ঘর তৈরি করিব, যতদিন না যন্ত্রাদি সংগ্রহ হয় ততদিন কুঞ্জবাবু সপরিজনে সেখানে আশ্রয় লইবেন তাহার পরে তিনি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবেন— কাজ লইবার সময়েই তিনি বাসস্থানের কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, এখন তাঁহাকে অসুবিধায় ফেলা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। আমি নিজের লেখাপড়ার জন্য একটি নিভৃত ঘর তৈরি করার সংকল্প করিয়াছিলাম তাহাও আপাতত স্থগিত রাখিয়াছি, যদি অর্থের সচ্ছলতা ঘটে তবে দেখা যাইবে। নরেন যদি না আসেন, তবে আপনি ও জগদানন্দ মাঝের ঘরে স্থান লইবেন, আমাকে আপনার ঘরটি ছাড়িয়া দিতে হইবে— নতুবা আমার লেখা একেবারে বন্ধ। সে ঘরে দিনের বেলায় আমি কাজ করিব— রাত্রে যাঁহার খুসি শয়ন করিতে পারিবেন।

আপনারা কৃষ্ণনগরে স্বাস্থ্যকর স্থান পাইয়াছেন শুনিয়া খুসি হইলাম। জগদানন্দের যত্নে নিশ্চয়ই সেখানে আপনাদের

কোন অভাব নাই— বোধহয় আহারাদি সম্বন্ধে নিতান্ত তপস্বীর ন্যায় আপনাদিগকে কাল যাপন করিতে হইতেছে না। ফিরিবার সময় কিছু নবদ্বীপের খইয়ের মোওয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন— শান্তিনিকেতনে আমাদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। কৃষ্ণনগরের বাজারে এখানকার বিদ্যালয়ে ব্যবহারযোগ্য সোনামুগ প্রভৃতি কোন আহার্য্যদ্রব্য যদি শস্তা পাওয়া যায় মনে করেন (বিপিনকে বলিলেই সে সন্ধান লইবে) তবে এখানকার জন্য, যে পরিমাণ আপনাদের লাগেজের সঙ্গে সহজে আসিতে পারে লইয়া আসিবেন মূল্য এখানে হিসাব করিয়া লইলেই হইবে। অমি শুক্রবার প্রাতের মেলে কলিকাতায় যাইব— আমার ভৃত্যটিকে যথাসময়ে মুক্তিদান করিবেন। ইতি ২৯শে পৌষ ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ জানুয়ারি ১৯০৩

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ—

গত সোমবারে রথী ইনস্পেক্টার আপিসে গিয়া তাহার দরখাস্ত সহি করিয়া আসিয়াছে। বুধবারে আপনার পত্র পাইলাম ইতিমধ্যে কেবল দুই তিন দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে উৎসবের আমোদ হইতে বঞ্চিত করিলাম না। এখানে

তাহারা সময়ের অপব্যয় করিতেছে না— যত্ন করিয়া সংস্কৃত পড়িতেছে— বিদ্যার্ণব প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা তাহাদিগকে সংস্কৃত পাঠে নিবিষ্ট রাখিয়াছেন। তাহারা ১২ই মাঘে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে বোলপুরে ফিরিবে এবং তাহার পর হইতে কোন কারণেই তাহাদের পাঠের ব্যাঘাত হইবে না। লরেন্সসাহেব আগামী মার্চ্চ মাসে বোলপুরে যাইবে। আমি মাঘের শেষ সপ্তাহে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িব— ফিরিতে দুই তিন মাস লাগিবে। ইতিমধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য আমি নিয়ম দৃঢ়বদ্ধ করিয়া সত্যেন্দ্রের প্রতি অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি— যাহাতে নিয়ম কোনমতেই শিথিল হইয়া [না] পড়ে আমি বার বার তাহাকে সেই উপদেশ দিয়া দিয়াছি। কঠিন নিয়মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আপনি আমাকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা আমি সঙ্গত বোধ করি— এখন হইতে, নিয়ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে আপনারা সকলেই অনুগ্রহ করিয়া তৎপ্রতি সতর্ক থাকিবেন।

সোমবার ১১ই মাঘ উপলক্ষ্যে ছুটি থাকিবে। যদি ইচ্ছা করেন তবে শনিবার অপরাহ্ণে ছুটি লইয়া সোমবার রাত্রে বিদ্যালয়ে আসিতে পারেন। সত্যেন্দ্রকে এই সম্বন্ধে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। ইতি ৮ই মাঘ ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

[২৪ জানুয়ারি ১৯০৩]

ওঁ [কলিকাতা]

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার আবেদনখানি আমি সত্যর নিকট পাঠাইয়া দিলাম তিনি ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমাকে দীর্ঘকালের *জন্য অনুপস্থিত থাকিতে হইবে এই জন্যই বিশেষরূপে একজনের উপরেই সমস্ত কর্ত্তৃত্বভার স্থাপন করিয়া যাইতে হইল*— আপনি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছেন এ বন্দোবস্তে তাহা ঘটিবে না বলিয়া আশা করি। ক্লাসে পড়াইবার সময় অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে যথোচিত সংযত করিয়া রাখিবেন তাহাতে কোন বাধা নাই, ক্লাসের বাহিরে তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব একজনের উপরে থাকাই সঙ্গত— নতুবা কার্য্যপ্রণালীর ঐক্যরক্ষা হয় না। ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও সংস্কার স্বভাবতই বিভিন্ন— সেইজন্য বৃহৎ কার্য্যে নিয়মের সাহায্যেই ঐক্য স্থাপিত হয়। সকলেই নিয়মের অধীনে থাকিলে অধ্যাপকদের মধ্যে বাদ-বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কর্ত্তব্যবিধির সহিত পরস্পর সৌহার্দ্যের কোন সংঘাত হওয়া উচিত নহে।

আমি ১২ই মাঘ মেলে যাইব। আপনাদের গল্পগুলি শুনা যাইবে। আমি পণ্ডিতমহাশয় ও সতীশকে গুটিকয়েক গল্পের প্লট দিয়া গল্প লিখাইয়াছি।

রেণুকা কলিকাতায় আসিয়াছে। ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা লইয়া ব্যস্ত আছি।

মীরার পড়াশুনা বোধহয় পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। হোরি চলিয়া আসায় আপনাদের অনেকটা অবকাশ ঘটিবে। আমার সঙ্গে কয়েকটি ছাত্র যাইবে। তাহার মধ্যে A. M. Bose-এর ছেলে একটি। [১০ মাঘ ১৩০৯]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয় নমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রায় আরম্ভ হইতেই আপনি এখানকার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই এক বৎসরে আপনার সহিত আমার হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গেছে আশা করি তাহা চিরদিন রক্ষিত হইবে।

এখানে আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকিল না সুতরাং আপনার বিদায় গ্রহণে আমি প্রতিবন্ধক হইতে পারি না— আপনি অব্যাহত উন্নতিলাভ করিতে থাকুন্ এই আমার অন্তরের কামনা জানিবেন।

এখানকার এণ্ট্রেন্স ক্লাসের দুটি ছাত্রকে আপনি যেরূপ যত্ন ও দক্ষতা সহকারে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তাহাতে

আপনার নিকট প্রভূত কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। শ্রীমান্ রথীন্দ্র ও সন্তোষ এ বৎসর এণ্ট্রেন্স দিতে পারিবে এরূপ আশার কোন কারণ ছিল না— আপনি রথীন্দ্রকে একবৎসরে ও সন্তোষকে এই কয়েকমাসে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার যেরূপ যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে আশাতীত— ইহাতে অধ্যাপনা সম্বন্ধে আপনার নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের প্রতি আমার একান্ত আস্থা জন্মিয়াছে। ইহার পরে আপনি যে বিদ্যালয়েই যোগ দিন না কেন আপনাকে পাইয়া যে সে বিদ্যালয় লাভবান্ হইবে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। এই এক বৎসর যে আপনাকে অধ্যাপকরূপে পাইয়াছিল রথীন্দ্রের পক্ষে ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। যদি কখনো আমার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ঘটে তবে পুনরায় আপনাকে আমার সহায়রূপে পাইব এ আশা আমি মন হইতে দূর করি নাই।

চারা অবস্থায় আপনি যে বৃক্ষে জল সেচন করিয়াছেন দূরে গিয়া আপনি তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। এ বিদ্যালয়ে আপনার সেই গৃহকোণটি আপনি মাঝে মাঝে আসিয়া অধিকার করিবেন— এবং অন্য কর্ম্মের মধ্যেও ইহাকে স্মরণ করিয়া ইহার মঙ্গল কামনা করিবেন।

এখানে যাহাতে আপনারা আনন্দে থাকেন সে চিন্তা অহরহই আমার হৃদয়ে ছিল— তথাপি যদি না জানিয়া বা ভুল বুঝিয়া কখনো আপনার ক্ষোভের কারণ হইয়া থাকি তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন— এখানে যাহা কিছু আনন্দের

ও আশ্বাসের ছিল এখানে এই এক বৎসরে যাহা কিছু লাভ-জনক বোধ করিয়াছেন তাহাই স্মরণে রাখিবেন ও আমাকে হিতৈষী বন্ধুভাবেই চিন্তা করিবেন। ইতি ১৩ই ফাল্গুন ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮ মার্চ ১৯০৩

ওঁ

হাজারিবাগ

সবিনয় নমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

আপনার লেখাটি একেবারে কালবৈশাখী ঝড়ের মত—প্রচণ্ড ও আকস্মিক। কিন্তু শুধু এইরূপ দম্‌কা হইলে চলিবে না—সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তান্তও চাই। শিক্ষামহলের কর্ত্তারা এতদিন ধরিয়া কি প্রণালীতে শিশুদের রক্ত শোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহা বিস্তারিত করিয়া আলোচনা করা দরকার—ছাত্রদের মাথাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের জঠরের মধ্য দিয়া কি উপায়ে গজভুক্ত কপিত্থবৎ বাহির হইয়া আসে তাহা আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখান উচিত—নহিলে শুদ্ধমাত্র ঝড়কে লোকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঠেকাইবে—আপনার এ লেখা সহজে কেহ গ্রহণ করিবে না।

এখানে আসিয়া অবধি আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ৮।৯ দিন আমি জ্বরে পড়িয়াছিলাম। উঠিয়াছি কিন্তু কাশি ও দুর্ব্বলতা যায় নাই। তার পরে শমী পড়িয়াছিল,

কাল হইতে তাহার জ্বর নাই— কাশি আছে। আজ মীরা পড়িয়াছে। নগেন্দ্রের স্ত্রী জ্বরে পড়িয়াছিল। পিসিমার শরীর অসুস্থ। চাকরদের অনেকেই শয্যাগত। রেণুকার প্রত্যহ ১০২° জ্বর আসিতেছে। কোনদিকেই আশাজনক কিছুই দেখি না। এখানকার একজন বাঙালী বলিলেন এ জায়গাটা ম্যালেরিয়ার পক্ষে ভাল কিন্তু পেটের পক্ষে বিশেষ ভাল নহে— এখানকার জলে লোহা আছে সুতরাং অম্ল অজীর্ণ লিভারের উপদ্রব যাহাদের আছে তাহাদের পক্ষে এ স্থান পরিত্যাজ্য। সেই বোলপুরেরই পুনরাবৃত্তি আর কি। যাই হোক্ আমাদের সকলেরই এখানে শরীর খারাপ হইয়াছে। পথটি এমন যে ইচ্ছা বা আবশ্যক হইবামাত্রই যে দৌড় দেওয়া যায় এমন জোটি নাই। মনে মনে ভাবিতেছি প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া লইলে তার পরে হয়ত উপকার হইতেও পারে। আমার মনটা পালাই-পালাই করিতেছে।

আপনারা যে দল বাঁধিয়াছেন সে খুবই ভাল কিন্তু ব্রতভঙ্গ হইতে দিবেন না। স্ত্রীলোকের প্রতি উপদ্রব সচরাচর আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইবে বলিয়া মনে করি না— দৈবক্রমে কদাচিৎ হয়ত আপনাদের কোন একজনের চোখে পড়িতে পারে। কিন্তু adventure খুঁজিয়া Quixotic কাণ্ড করিয়া তুলিবেন না— যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইতে পারেন এমনভাবে কাজ করিবেন।

আজকাল ত্রিপুরায় কোন সুবিধা হওয়া শক্ত। সেখানে কোন কাজ খালির খবর কিছু পাইয়াছেন কি? যদি পাইয়া

থাকেন তবে আমাকে জানাইবেন আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।

আশা করি আপনি ভাল আছেন। ইতি ১৪ই চৈত্র ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

বড়বাজার

৩১৭ এপ্রিল ১৯০৩

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার

আমি ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। রেণুকাকে আলমোড়ায় লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতে কলিকাতায় আসিয়াছি। আবার শীঘ্র যাইতে হইবে, আমার শরীর ভালো নহে। এই সকল কারণে, চিঠির জবাব দিতে পারি নাই। কতদিনে সুস্থির হইয়া বসিব কে জানে। আপনি কুষ্টিয়া গেছেন শুনিয়া খুসি হইলাম— জায়গাটি ভাল— মাছ দুগ্ধের অভাব নাই— আমাদের সঙ্গে কুষ্টিয়ার নানা সম্বন্ধ। আমাদের ম্যানেজারের সহিত আলাপ করিবেন তিনি আবশ্যকমত আপনাকে সাহায্য করিতে পারিবেন। [৪ বৈশাখ ১৩১০]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

২৭ এপ্রিল ১৯০৩

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ,

এখনো সুস্থির হইতে পারি নাই। রেণুকা হাজারিবাগেই আছে। আলমোড়ায় তাহাকে এত পথ ভাঙিয়া স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইবে না। আমি পরশ্ব হাজারিবাগে যাত্রা করিব।

রথী মজঃফরপুর হইতে বোলপুরে আসিয়াছে, এখানে তাহার পড়াশুনার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গেছে। ডিগ্রির প্রতি লোভ পরিত্যাগ করিয়াছি— রথীর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেইদিকেই দৃষ্টি রাখা যাইতেছে।

এখানে গরম ভয়ানক। ইতিমধ্যে একদিন ১০৫॥° ডিগ্রি তাপ উঠিয়াছিল। আজ বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়া গেল। কয়েকটি ছেলে রহিয়া গেছে—সতীশ তাহাদের দেখাশুনার ভার লইয়াছেন। অধ্যাপকরা বাড়ি গেছেন। সুবোধ বোধহয় শ্বশুরের চেষ্টায় দিল্লিতেই পোষ্ট অফিসে একটি কাজের জোগাড় করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার আর আশা করি না। আপনাদের Trinityর মধ্যে কেবলমাত্র জগদানন্দ অবশিষ্ট রহিলেন— নরেন আশ্রমে পুনঃপ্রবেশের প্রত্যাশায় মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছেন। ইতি ১৪ই বৈশাখ [১৩১০]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ আবশ্যক হইলে আমাদের নায়েব বামাচরণ আপনাকে নানাবিষয়ে সুবিধা করিয়া দিতে পারেন।

শ্রী

১৬

১৫ মে ১৯০৩

ওঁ Thomson House
Almora

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

রেণুকাকে লইয়া আলমোড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পথের কষ্ট যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। পথে এত বিভ্রাট আছে তাহা পূর্ব্বে কল্পনা করিলে যাত্রা করিতে সাহসই করিতাম না। কিন্তু তবু আসিয়া ভালই করিয়াছি। এত ক্লেশেও রেণুকার বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই এবং আশা করিতেছি কিছুদিন বিশ্রাম করিতে পারিলেই সে এখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর পূরা উপকার লাভ করিতে আরম্ভ করিবে। স্থানটি রমণীয় সন্দেহ নাই—বাড়িও বেশ ভাল পাওয়া গেছে—বাতাসটি বেশ সুখপ্রদ বলিয়া মনে হয়—নীচেকার অসহ্য গরম হইতে এখানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়াছি। শীত এখনো তেমন কড়ারকম বোধ হইতেছে না, গরম কাপড় পরিয়া থাকিতে হয় বটে,. কিন্তু আমাদের দেশের শীতের মত হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরাইয়া দেয় না। কাল পরশু বৃষ্টি

হইয়া বাতাস বেশ পরিষ্কার হইয়া গেছে— মাঝে মাঝে কুহেলিকার আবরণ সরিয়া গিয়া তুষারশিখরশ্রেণীর আভাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

রথীর সম্বন্ধে এখনো সম্পূর্ণ কিছু স্থির করি নাই। তবে, তাহাকে যখন আমেরিকা বা য়ুরোপে পাঠাইতেই হইবে তখন এফ্, এ, পরীক্ষার পড়া পড়াইয়া এই সময়টা নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। এই দুই বৎসর তাহাকে যথারীতি শিখাইলে বিদ্যাচর্চ্চার পথে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায়। সম্মুখে পরীক্ষার উত্তেজনা নাই বলিয়া যে তাহাকে শিথিল ভাবে পড়ান হইবে তাহা মনে করিবেন না। যতদূর জানি সে মনোযোগ দিয়া পড়া করিতেছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার লেখা ত আমি আর পাই নাই। হাজারিবাগে থাকিতে কেবল একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাইয়াছিলাম— সে সম্বন্ধে আপনাকে লিখিয়াওছি। আপনি বিস্তারিতভাবে লিখিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু সে লেখা ত আজও আমার হস্তগত হয় নাই।

আপনার সেই রামময়ের স্ত্রীর গল্প সম্বন্ধে শৈলেশকে একটা তাগিদ দিয়া পত্র লিখিবেন— শৈলেশ সেটা সমালোচনীতে বাহির করিবেন বলিয়াছিলেন।

মনে হইতেছে আমি বোলপুর হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কুঞ্জবাবুর কাছ হইতে শুনিয়া আসিয়াছি যে তিনি আপনার প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহার ভুল হইয়া থাকে আমাকে জানাইবেন।

কুষ্টিয়ায় আশা করি আপনি ভালই আছেন। সেখানে আপনার কাজ কি রূপ চলিতেছে? ইতি ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

২৪ মে ১৯০৩

ওঁ Thomson House

আলমোড়া

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

রেণুকার সম্পূর্ণ আরোগ্য অপেক্ষা করিয়া আমাকে বোধহয় এখানে কিছু দীর্ঘকালই থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে রথীর পড়ার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। সুবোধ ত চলিয়া গেছেন—আপাতত শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক আছেন। আরও তিনজনের আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন এম্, এ, (বর্ত্তমানে অন্যত্র অধিক বেতনে হেড্‌মাষ্টারি করিতেছেন) ব্রহ্মবিদ্যালয়ে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কার্য্য লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইঁহারা অস্থায়ী হইবেন বলিয়া আশঙ্কা করি না। আর একজন বি, এ, ইনিও কোনো স্কুলে প্রধান গণিতশিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। আপাতত এই কয়জন হইলে রথীকে শেখানো ও বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ চলিয়া যাইবে। রথীর ছয়মাসের পাঠ্য আমরা স্থির করিয়া

পাঠাইয়াছি। ছয় মাস হইয়া গেলে তাহার রীতিমত পরীক্ষা হইবে। মোহিতবাবু সাহিত্য ইতিহাসে পরীক্ষকতা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

মোহিতবাবু আলমোড়ায় আসিয়া আমার অতিথিরূপে আছেন। তিনি এখানে দিন পনেরো থাকিবেন।

কুষ্টিয়ার কাজে কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে আপনার বনিবার সম্ভাবনা নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। জায়গাটি মন্দ নহে। সেখানে উকিল চন্দ্রময়বাবুর সঙ্গে কি আলাপ হইয়াছে? লোকটি অত্যন্ত সৎপ্রকৃতি, শান্ত— তাঁহার প্রতি সেখানকার সকলেরই শ্রদ্ধা আছে। আপনি বোধহয় তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিলে সুবিধা পাইতে পারিবেন।

রথী প্রথম শ্রেণী এবং সন্তোষ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস হইয়াছে বোধহয় খবর পাইয়াছেন।

যে একশত টাকা আপনার প্রাপ্য আছে সে আমি নিজেই দিব— সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সম্প্রতি আমি নিতান্তই জড়িত হইয়া পড়িয়াছি— কবে নিষ্কৃতি পাইয়া সচ্ছল অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব জানি না। আমি একটু মাথা তুলিতে পারিলেই আপনাকে স্মরণ করিব।

নরেন তাঁহার বৈদ্যবাটির কাজ ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন। বোলপুরে পুনরায় কাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক আছেন— কিন্তু যাঁহারা সেখানকার কাজেই স্থায়ীভাবে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহাদিগকে কিছুদিনের মত রাখিয়া বিদ্যালয়ের ক্ষতি করিতে পারি না। সুবোধ

আমার এই অনুপস্থিতিকালে হঠাৎ চলিয়া গিয়া বিদ্যালয়ের বড়ই অনিষ্ট করিয়াছেন। নূতন শিক্ষক যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ের রীতিপদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত করাইয়া দিবার প্রায় কেহই নাই।

আশা করি আপনার পরিজনবর্গ সকলেই ভাল আছেন। আপনার সেই অজীর্ণের ভাব এখন কমিয়াছে? ইতি ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

[২ জুন ১৯০৩]

ওঁ Thomson House
Almora

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

আপনি আমাকে অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছেন। কুঞ্জবাবুর প্রতি আপনার চিত্ত যেরূপ একান্ত বিমুখ হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সংক্রান্ত কোন আলোচনা আপনার কাছে করা আমি অকর্ত্তব্য জ্ঞান করি। তিনি আপনার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন একথা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়াও উচিত নহে, করেন নাই বলিয়াও আপনাকে অকারণ পীড়ন করা অনাবশ্যক। এইজন্য কুঞ্জবাবু সম্বন্ধে আমি চুপ করিয়া গিয়াছিলাম।

রথীর প্রতি আপনার যে স্নেহের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে আশা

করি তাহা ক্ষণিক নহে। অবকাশমত রথীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সংবাদ লইবেন তাহাকে পরামর্শ দিবেন ইহা আমি আনন্দের বিষয় জ্ঞান করি। কুঞ্জবাবুর উপস্থিতিতে আপনার এ সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত হওয়া উচিত হয় না। আপনি অনায়াসেই শান্তিনিকেতনে অতিথি থাকিয়া যতদিন ইচ্ছা কাটাইয়া আসিতে পারেন।

অবশ্য এটুকু আপনি বোঝেন, কুঞ্জবাবু বিদ্যালয়ের কাজ করিতেছেন— বিদ্যালয়ে তাঁহার সহিত আপনার কোন সংঘর্ষ কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আপনার দ্বারা তাহা হইবেই বা কেন ?

বিদ্যালয়ের অধ্যাপনবিধি নির্দ্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের ভার মোহিতবাবুর উপর দিয়াছি। জগদীশ, মোহিতবাবু এবং দুর্গাদাস গুপ্ত ডাক্তার আপাতত এই তিন জনে কমিটি বাঁধিয়া বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবেন এইরূপ স্থির করা গেল। মোহিতবাবু এখান হইতে কাল রওনা হইয়া প্রথমে বোলপুরে নামিবেন— সেখানে সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় যাইবেন। মাসে একবার করিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া যাইবেন। এইভাবে চলিলে বিদ্যালয়ের উন্নতি আশা করি।

আজ হেমবাবু (হেমচন্দ্র মল্লিক) এখানে আসিবেন— কাল মোহিতবাবু যাইবেন— ইঁহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত আছি। ইতি মঙ্গলবার [১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

একটি বৃহৎ কাজের ভার লইলেই নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হইবার অবকাশ পাওয়া যায়। আমিও আমার স্বভাবের অসম্পূর্ণতা নানারূপেই অনুভব করি। তৎসত্ত্বেও আমার উপরে যে ভার পড়িয়াছে তাহা আমাকে বহন করিতেই হইবে। ভার লাঘব করিবার জন্য আপনারা সকলেই আমার যথার্থ সহায় হইবেন এই আশা আমি সর্ব্বদা একান্তমনে অন্তরে পোষণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আপনি লিখিয়াছেন আমারই অন্যায় ও দুর্ব্বলতা আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগের কারণ। কিন্তু আমার চেয়ে আমার কাজকে যদি আপনি বড় করিয়া দেখিতেন তবে কোন সঙ্কটেই আপনি আমাকে ত্যাগ না করিয়া সত্য এবং কল্যাণের জয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। আমি ত আমার নিজের বা আর কাহারো কোনো ত্রুটি দেখিয়া আমার কর্ম্ম পরিত্যাগ করি নাই। কিন্তু আপনি নিজেকে ভুলিতে পারেন নাই। আপনি ব্রহ্মবিদ্যালয়কে আপনার করিয়া লন নাই। এ বেদনা আমার আজও মনে আছে। ইতিমধ্যে যে কোন ঘটনাই হউক্— আপনি, সুবোধ এবং জগদানন্দ আমার অন্তর অধিকার করিয়া আছেন— আমরা আত্মীয়ভাবেই ছিলাম— সে ভাব ভোলা কঠিন। সেই জন্যই বিদ্যালয়ের

প্রতি আপনাদের অনাসক্তি ও বিমুখতা আমার পক্ষে চির-কালই ক্লেশকর হইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া এই অন্যায় কথা আপনি মনেও স্থান দিবেন না যে বিদ্যালয়ের পক্ষে কোন আশঙ্কা বা অবনতির কারণ ঘটিয়াছে। প্রতিদিনই আমি এই বিস্ময় অনুভব করিতেছি যে, সমস্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় নবতর প্রাণ ও প্রবলতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ঠিক এই সময়ে বিদ্যালয় তাহার অনেক বালাই কাটাইয়া একটি মহিমাময় নবযৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছে। সে সকল ভিতরের কথা আপনি জানিতে পারিবেন না। বস্তুত বিদ্যালয়ের ঠিক ভিতরের মর্ম্মটি আপনি কোনদিন একান্তভাবে আপনার অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। আপনি বাহির হইতে সংশয়ের চক্ষে পরের মত করিয়া দেখিয়াছেন। সেইজন্যই আজ আপনি ইহার অভ্যুদয়জ্যোতি দেখিতে পাইতেছেন না কিন্তু আপনারা নিঃসংশয় হইবেন এমন দিনও আসিবে।

কিন্তু বিদ্যালয়ের কথা ছাড়িয়া দিন— ইহার ভার যদি ঈশ্বর আমার উপর দিয়া থাকেন তবে সমস্ত বিঘ্ন বিপদের মধ্যেও তিনি ইহাকে সফলতা দিবেন— এ ভার যদি অপহরণও করেন তবু আমার কিছুদিনের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু আপনাদের সহিত আমার যে বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে তাহা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। বিদ্যালয়ের সূত্রে আপনাদের সহিত যোগ না থাকিলেও অকৃত্রিম সহজ সৌহার্দ্দ্যের সহিত আপনাদিগকে বরাবর নিকটে পাইব এ

আশা পরিত্যাগ করিব না।

কয়েকদিন হইল রেণুকার মৃত্যু হইয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি তাহাকে লইয়া একান্ত উদ্বেগে ছিলাম সেইজন্যই পত্র লিখিতে পারি নাই— মনে করিয়াছিলাম দেখা হইবে তাহাতেও নিরাশ হইয়াছি। ইতি ২রা আশ্বিন ১৩১১ [১৩১০]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

১৪ ডিসেম্বর ১৯০৩

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

বিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

আমি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম ভাবিয়াছিলাম ডাকঘরের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখিব না— কিন্তু ঠিকটি ঘটিয়া উঠিল না— পোষ্ট্ অফিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। তাই ইতিমধ্যে আপনার চিঠি পাইলাম।

সাতই পৌষের উৎসবে আপনি নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনে যাইবেন নতুবা আপনাকে ক্ষমা করিব না। অনেকদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

আপনার প্রবন্ধে আপনি বড় বেশি ঝগড়া করিয়াছেন— দেখা হইলে এ সম্বন্ধে আপনার সহিত কথাবার্ত্তা হইবে।

এবার কিছু দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে কাটাইবেন— আলোচ্য বিষয় অনেক আছে।

এখনি বোট ছাড়িয়া দূর চরে যাইতেছি— তাই তাড়াতাড়ি এই চিঠি লিখিয়া ডাকে দিলাম। ৭ই পৌষে নিরাশ করিব না। আমি সম্ভবত আগামী রবিবার মেলে বোলপুরে যাইব। ইতি ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

১৪ জানুয়ারি ১৯০৪

ওঁ [শিলাইদহ]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

আপনার পত্র শান্তিনিকেতন হইতে ঘুরিয়া আজ এইমাত্র শিলাইদহ আসিয়া পৌঁছিল। তখন আপনার দুটি ছাত্র রথী ও সন্তোষ এবং অধ্যাপক সুবোধ পদ্মার জলে নামিয়া সাঁতার কাটিতেছিল এবং আমি তীর হইতে তাহাদিগকে সুসংবাদ জানাইলাম। ইহাতে স্নানকারীদের আনন্দ আন্দোলনে পদ্মার তরঙ্গচাঞ্চল্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সকলেই ভোজের প্রত্যাশা করিতেছে। যদি এখানে উপস্থিত হইয়া আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন করেন তবে পদ্মার টাট্‌কা ইলিষ অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাইবেন। অতএব অবিলম্বে এখানে আসিবেন।

অধ্যাপক সমিতিতে আপনার স্থায়ী অধিকার আমরা সাদরে রক্ষা করিব। শুদ্ধ তাহাই নহে— আমাদের বিদ্যালয়ের মন্ত্রণা-সভাতেও আপনার আসন আমরা পাতিয়া রাখিব এবং সে আসন যেন শূন্য না থাকে আমাদের এই দাবী রক্ষা করিবেন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমকে আপনি নিজের জিনিষ বলিয়া মনে রাখিবেন এই আমার অনুরোধ। ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত আমি এখানে আছি। রথীরা ১৭ই ১৮ই পর্য্যন্ত থাকিবে। যদি অল্পস্বল্প পড়াইবার সুবিধা করিতে পারি তাহা হইলে মাঘ মাসটা তাহারা এখানেই কাটাইয়া যাইবে। এই সময়টি এখানে বড়ই রমণীয়। জগদানন্দও আসিবেন এমন কথা আছে— তাহা হইলে আপনাদের সেই বোলপুর মাঠের অধ্যাপক-Trinity একবার এই পদ্মার উর্ম্মিলীলার মধ্যে মিলিত হইতে পারিবে। মনে রাখিবেন এখানে খেচর ভূচর জলচর ও উভচর কোনো শ্রেণীর খাদ্যই নিষিদ্ধ ও দুর্লভ নহে, সুবোধ প্রত্যহ তাহার প্রমাণ পাইতেছেন। আপনি যেদিন ছাড়িবেন তাহার আগের দিন যদি আমরা খবর পাই তবে চরে আসিবার জন্য কুষ্টিয়া হইতে আপনার নৌকার ব্যবস্থা করিয়া দিব। ইতি ৩০শে পৌষ ১৩১০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

১ মার্চ ১৯০৪

ওঁ শিলাইদহ

কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার—

দীনেশবাবুর প্রবন্ধ অত্যন্ত অযোগ্য হইয়াছে। ছাপার পূর্ব্বে দেখি নাই, ছাপার পরে লজ্জিত হইয়া আছি। ওটা যে বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল তাহা একেবারে ভুলিবার চেষ্টায় আছি— দোহাই আপনার এ প্রবন্ধ লইয়া আপনি আন্দোলন জাগাইবেন না। কোনো তর্ক না তুলিয়া সাধারণভাবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিবেন। এই লেখাটা বাহির করার জন্য আমি শৈলেশকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছি।

আপনার সাংসারিক দুর্ঘটনার সংবাদে ব্যথিত হইলাম।

আপনি কোথায় কাজ আরম্ভ করিতেছেন কিরূপ বুঝিতেছেন সে সমস্ত সংবাদ কিছুই লেখেন নাই।

এখানে বিদ্যালয় তুলিয়া আনিয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া আছি। মোহিতবাবু কাজে যোগ দিয়াছেন। ১৫ই জ্যৈষ্ঠে আবার বোলপুরে যাইব। ১৫ই বৈশাখে বিদ্যালয়ের ছুটি— ছুটির একমাসও আমি এইখানে কাটাইব মনে করিতেছি। ইতি ১৮ই ফাল্গুন ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

২২ মার্চ ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদহ।

কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার—

আমি এখানকার নায়েবের কাছে আপনার কথা বলিয়া রাখিয়াছি। নায়েব আপনার ওকালতীর উপক্রমণিকায় যথোচিত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যখন অবকাশ পান এখানে আসিবেন এবং শামলা মুকুট গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু ব্যায়ামশিক্ষক মহাশয়কে আমার মিনতি জানাইয়া বলিবেন কাহারো কাছে কোন প্রকার উমেদারি করা আমার বয়সে আর সাজে না। সামাজিক ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছি, আবার সেই পরিত্যক্ত ঝুলি কাঁধে করিয়া কাহারো দ্বারে গিয়া হাজির হইতে পারিব না।

আমাদের বিদ্যালয় হইতে পত্রিকা বাহির করিতে সতীশের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল— তাহার কতক কতক লেখাও ছিল। তখন সে আমাকে একপ্রকার রাজি করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু সুবোধের উপর নির্ভর করিয়া তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরং-অবস্থা যদি আমার হয় তবে "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্"।

তা ছাড়া আমার শরীর মন নিতান্ত পরিশ্রান্ত। যা কাজ ঘাড়ে লইয়াছি তাহার ভার অল্প নহে। তা ছাড়া অর্থসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রাখিলে মনের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয় না।

সুবোধ ইতিমধ্যে প্রখর পদ্মাস্রোতে স্নান করিতে গিয়া পা

মচ্‌কাইয়া পড়িয়াছিল— সেই অবধি নিজের পদসেবায় অহরহ নিযুক্ত আছে। সন্তোষও সপ্তাহ দুয়েক পা ভাঙিয়া চিকিৎসা-ধীনে আছে। মোহিতবাবুরও সেই অবস্থা। অধ্যাপকদিগকে স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছি।

আমরা এখানে প্রায় আষাঢ়ের আরম্ভ পর্য্যন্ত থাকিব। ইতিমধ্যে আপনার সাক্ষাৎকার আশা করা যাইতে পারিবে। ইতি ৯ই চৈত্র ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

১১ এপ্রিল ১৯০৪

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

আমার শরীর বড় ভাল নয়। রোজই অল্প অল্প জ্বর আসিয়া ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তারের সহিত পরামর্শের জন্য একবার কাল কলিকাতায় যাইব।

আপনার অল্প বয়স। ভাগ্যকে লইয়া আর অধিক দিন খেলা করিবেন না। মনস্থির করিয়া ফেলুন্। না হয় কোমর বাঁধিয়া হেডমাষ্টারিতেই লাগিয়া যান্ না কেন। যতই দ্বিধা করিবেন শরীর মন ততই বিকল হইতে থাকিবে। কিন্তু

পরামর্শ জিনিষটা অত্যন্ত সহজ ও শস্তা, তাহাতে প্রায় কোনো ফল হয় না— তবু না দিয়া থাকিতে পারিলাম না, কিছু মনে করিবেন না। ইতি ২৯শে চৈত্র ১৩১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

বড়বাজার

৩১৯ জুলাই ১৯০৪

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

কাল হইতে রথীর জ্বর নাই কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, আজ প্রাতে পিত্তবমন হইয়াছে। মজঃফরপুরে শরৎ বলিতে-ছিলেন সেখানে দুই চারিটি বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী উকিলের স্থান আছে— আপনি সেখানে গেলে বোধহয় একটু চেষ্টা করিলে উন্নতি করিতে পারিবেন। শরৎ নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু মনস্থির করিয়া কাজে লাগিবেন। মজঃফরপুরের আবহাওয়া খারাপ নয় তবে অজীর্ণের পক্ষে কিরূপ দাঁড়াইবে বলা যায় না। মঙ্গলবার [৪ শ্রাবণ ১৩১১]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ অক্টোবর ১৯০৩

ওঁ　　　　　　　　　　　　　　গিরিডি

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ—

আমার বিজয়ার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

আমি ইতিমধ্যে বুধগয়ায় ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি কিছু-দিনের জন্য গিরিডিতে আশ্রয় লইয়াছি। এখানে আছি ভাল। এখানকার ঐ শীর্ণধারা উস্রি নদীর দ্বারা আলিঙ্গিত প্রান্তরের উপরে স্নিগ্ধ শুভ্র শরৎকালটি বড় মধুরভাবে আবির্ভূত হইয়াছে।

কিন্তু আপনি সার্ভে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন কি না বলুন। দ্বিধা ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে জীবনটাকে ব্যর্থ করিবেন না। এইবার একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন।

ছুটির পর হইতে বোলপুর বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্ত্তন করা যাইতেছে। বড় ছেলেদের একেবারে বিদায় করা গেল। নগেন্দ্রবাবু গেলেন— মোহিতবাবুও থাকিবেন না। কেবল-মাত্র কুড়িটি অল্প বয়সের ছাত্র স্কুলে রাখিব তাহার অধিক আর লইব না— এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়া রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা যাইবে। বিদ্যালয়ের আরম্ভকালে আপনারা ইহার মধ্যে যে একটি স্বচ্ছতা ও শান্তি দেখিয়াছিলেন পুনরায় তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিব। আপনাদের পুরাতনের মধ্যে এখন কেবল জগদানন্দ বাকি। যাহাই হউক, পুরাতন

সম্বন্ধ বিস্মৃত না হইয়া এই বিদ্যালয়ের মধ্যে আপনার হৃদয়কে প্রেরণ করিবেন। ইতি ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩১১

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

২৫ অক্টোবর ১৯০৭

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি আপনার কাছে সম্প্রতি কিছু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে— কিন্তু এ কথা মনে রাখিবেন তাঁহার তাণ্ডবলীলার উপদ্রব আপনার চেয়ে অনেক বেশি সহিয়াছে এমন লোক চারিদিকেই আছে। ইহাতে কোনো সান্ত্বনা পাইবেন কি না জানি না কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিবেন এত ঝাঁকানিতেও এ সংসারের সন্ধিস্থলগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় নাই। আমার সুখ দুঃখে কি আসে— জগন্নাথের রথ চলিতেছে এবং ইচ্ছা করি বা না করি আমাকে তাহা টানিতেই হইবে। মুখ ভার করিয়া মনে বিদ্রোহ রাখিয়া টানাই পরাজয়— প্রফুল্লমুখে চলিতে পারিলেই আমার জিৎ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং
প্রাপ্তম্ প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনা পরাজিতা।

সুখ বা হোক্ দুখ বা হোক্
প্রিয় বা অপ্রিয়
অপরাজিত হৃদয়ে সব
বরণ করি নিয়ো।

বরণ ত করিতেই হইবে, পেয়াদায় করাইবে, তাহার উপরে হৃদয়কে কেন পরাস্ত হইতে দেওয়া? তাহাতে কি শিকি পয়সার লাভ আছে? বরঞ্চ, যাহা কিছু হইতেছে তাহাকে সহজে স্বীকার করিয়া লইলে বিশ্বশক্তির একটা আনুকূল্য হৃদয়ের মধ্যে লাভ করা যায়। আমি এই বুঝিয়া বসিয়া আছি— বেদনার কারণ ঘটিলে যে বেদনা পাই না তাহা নহে কিন্তু আমার সেই বেদনার মেঘে জগতের সমস্ত আলোককে আমি আচ্ছন্ন করিতে দিই না। মাথাটাকে যদি মেঘের উপরে রাখিতে পারি তাহা হইলে ধ্রুবজ্যোতি কখনো ম্লান হয় না— যদি নিজের মাথা ধূলায় অবনত করি তাহা হইলেই ভ্রম হয় যে জ্যোতি বুঝি অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ইতি ৯ই কার্ত্তিক ১৩১১

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

বড়বাজার

*১১ নভেম্বর ১৯০৪

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

কই না। মোহিতবাবু ত বোলপুরে যাচ্চেন না। দীনেশবাবুকে নিচ্চি। আপনি ত ফাঁদে পা দিলেন না। ছুটির পরে একবার বোলপুরে যাবেন কি? সোমবারে খুলবে। আমি কালই যাচ্চি। রথীরা আপাতত গিরিডিতেই রইল। তার শরীর এখনো নির্দ্দোষ হয় নি। একবার দেখা দেবেন— পরামর্শ করবার বিষয় অনেক আছে। ইতি শুক্রবার [২৬ কার্ত্তিক ১৩১১]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

[মে ১৯০৫]

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার চিঠি পাইলাম কিন্তু আপনি ধরা দিতেছেন না কেন? যে সব কথা পাড়িয়াছেন ডাকযোগে কি ইহার ভালরূপ আলোচনা হওয়া সম্ভব? একবার মোকাবিলার প্রয়োজন। কাল বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতায় যাইতেছি দিন দুই তিনের

মধ্যেই ফিরিবার কথা— তাহার পরে একবার এখানে আসিয়া জমিবেন। আজকাল আমাদের সভা বেশ জমজমাট্— প্রতিদিনই সায়াহ্নে আমরা অধ্যাপকেরা মিলিয়া নানা বিষয়ের আলোচন[া] করিতেছি— আপনি থাকিলে খুসি হইতেন। জানেন বোধহয় সুবোধচন্দ্র আবার এখানে ভাসিয়া আসিয়াছেন। আপনাকেও বোধহয় একদিন ধরা দিতে হইবে। ইতি রবিবার

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

২ জুন ১৯০৫

ওঁ বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

একবার ক্ষণকালের মত এদিকটা ঘুরিয়া যান না। আজকাল আমাদের এখানে আলোচনা বেশ জমাট রকম হইয়া থাকে। আমি অধ্যাপকদের লইয়া প্রায় মাসখানেক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কিছু না কিছু বলাকহা করিয়াছি— তাহার পরে বড়দাদাও কিছুদিন সন্ধ্যার আসর জমাইয়াছিলেন— আজকাল আবার আমার হাতে পড়িবার উপক্রম করিয়াছে।

আপনি আবার কাগজের ফাঁদে ধরা দিতেছেন? সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিবেন ত? বড় ঝঞ্ঝাট। বিশেষত সাপ্তাহিক কাগজ। আমার স্কন্ধে "ভাণ্ডার" বলিয়া এক কাগজ পড়িয়াছে দেখিয়াছেন ত? আমি যত মনে করি কাজের আবর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া পড়িব ততই কাজ আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরে।

কেন যে কি মনে করিয়া ভাণ্ডার সম্পাদন করিতে রাজি হইয়াছিলাম তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাকেই বলে গ্রহ।

হইল = হইয়াছে। করিল — করিয়াছে। ইত্যাদি। গিল— গিয়াছে হইতে পারিত। যখন কথাটা "গেল" তখন "গিয়াছে" হইতেই হইবে এমন কথা নাই। এক সময় কথাটা ছিল "গইল" কিন্তু এখন আর তাহা নাই। এরূপ পরিবর্ত্তনকে আমল না দিলে কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান ক্রমে অত্যধিক হইয়া উঠিবে। এক সময় লিখিত বাংলায় "আমারদিগের" কথা ব্যবহৃত হইত এখন তাহার স্থানে "আমাদের" হইয়াছে। পূর্ব্বে লেখা হইত "করহ" এখন লেখা হয় "কর"— পূর্ব্বে লেখা হইত "করিহ" এখন লেখা হয় "করিয়ো"। এ বড় অধিক দিনের কথা নয়। ভাবিয়া দেখুন "নয়" কথাটা পূর্বে "নহে" ছাড়া অন্য কোনো আকারে ব্যবহৃত হইত না — এখন ছাপার অক্ষরে "নয়" সহ্য করিতেছেন কিরূপে? ক্রমে ক্রমে একে একে ভাষাটাকে আধুনিক ব্যবহারের উপযোগী করিয়া আনিতে হইবে। Chaucer-এর ইংরেজি চিরদিন টেঁকে নাই। রামমোহন রায়ের ভাষাটা একবার পড়িয়া দেখিবেন।

কিন্তু এ সব তর্ক মোকাবিলায় না হইলে ভাল করিয়া হয় না। শনিবারে আসিয়া পড়ুন না। ইতি ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্যগ্রন্থাবলী নিশ্চয় একসেট পাইবেন।

বড়বাজার

*২৬ আগষ্ট ১৯০৫

ওঁ

প্রীতিনমস্কার নিবেদন—

শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল এখন একটু ভাল। তাই এই অবকাশে কাল টৌনহলে এক প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়েছিল। আজ ক্লান্ত হয়ে আছি। আপনি কি সময়ে অসময়ে কলকাতাতেও আসা ছেড়ে দিয়েছেন? করচেন কি? ছেলেরা বর্ত্তমানে গিরিডিতে, ভবিষ্যতে কাশীতে যাবার প্রস্তাব আছে। আপনি কি ছুটিতে ও অঞ্চলে যেতে পারবেন? [১০ ভাদ্র ১৩১২]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

বড়বাজার

*৩০ আগষ্ট ১৯০৫

ওঁ

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

বাজে গুজবে কর্ণপাত করিবেন না। সুযোগ ঘটিলে আপনাকে বিস্মৃত হইব না নিশ্চয় জানিবেন। ইতি বুধবার [১৪ ভাদ্র ১৩১২]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

৮ অক্টোবর ১৯০৫

ওঁ

গিরিডি

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। আমি যে কিরূপ আবর্ত্তের পাকে পড়িয়াছিলাম তাহা কল্পনা করিতে পারিবেন না। সে সময় আপনার চিঠিপত্র যদি পাইয়া থাকি তবে কর্ম্মের পাকে তাহা সাফ তলাইয়া গেছে। কেবল আপনার কাছে নয় ঐ সময়টাতে আমি অনেকের কাছে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছি। গিরিডিতে সম্প্রতি বিশ্রামের আশায় আসিয়াছি— ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে আজ দূত আসিয়াছে আজই আমাকে সেখানে যাইতে হইবে। কতদিন হইবে কে জানে। রথীও কাল যাইবে। যদি দুই তিনদিনের মধ্যে কলিকাতায় যান তবে দেখা হইতে পারিবে।

আপনাকে একখণ্ড "আত্মশক্তি" এবং "বাউল" নামধারী দুটি আমার স্বরচিত গ্রন্থ উপহার পাঠাইতে শৈলেশচন্দ্রকে লিখিয়া দিয়াছিলাম সে দুইখানি হস্তগত হয় নাই বলিয়া আপনার পত্রের ভাবে অনুমান করিতেছি। সে জন্য মজুমদার কোম্পানিকে অথবা পোষ্ট্ আফিসকে দায়ী করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক যদি না পাইয়া থাকেন তবে পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন— হয় ত কালক্রমে সফল হইবেন— বার বার আঘাতে শৈলেশও বিচলিত হইতে পারেন।

আপনার ঘরের খবর কি? সন্তানসন্ততি এবং তাঁহাদের জননী ভাল আছেন ত? এই সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব —একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন এমন ভরসা হয় না।

একবার গিরিডিতে দেখা দিয়া গেলেন না কেন? এখনো সময় আছে— এখনো তৎপর হউন। জায়গাটা পাকযন্ত্রের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ইতি ২২শে আশ্বিন ১৩১২

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

[১১ ডিসেম্বর ১৯০৫?]

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

কিছুদিনের জন্য সভাসমিতি হইতে পলায়ন করিয়া বোলপুরে আশ্রয় লইয়াছি। বেশি দিন এমন আরামে কাটিবে না। আবার কখন্ জনতা হইতে ডাক পড়িবে, নির্জ্জনতা হইতে বিদায় লইতে হইবে।

আপনি যে হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া নওগাঁওয়ে মাষ্টারি লইয়া পলায়নোদ্যত হইয়াছিলেন শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। আপনার মনে যদি এই ছিল তবে আমাকে পূর্ব্বে জানাইলেন না কেন? যাহা হউক্ এখন হইতে আপনার জন্য সুযোগ চিন্তা করিতে থাকিব। কিন্তু জমিদারীর অধ্যক্ষতাভার লইবার চেষ্টা আপনি কোনোমতেই করিবেন না। যদি এ ফাঁদে পা দেন তবে

অনুতাপের পালা অবিলম্বেই সুরু হইবে। তা ছাড়া ত্রিপুরায় যে কাজের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে সে কাজ তেমন নির্ভরযোগ্য নহে।

আপনি সুযোগমত একবার বোলপুরে আসিতে পারিলে অনেক বিষয়ে মোকাবিলায় আলোচনা হইতে পারিত। এই সপ্তাহের মধ্যে যদি আসেন ত আমার সহিত দেখা হইতে পারে।

এখানে জাপান হইতে এক জুজুৎসু-শিক্ষক আসিয়াছেন—তাঁহার কাণ্ডকারখানা দেখিবার যোগ্য। ইতি সোমবার।
[২৫ অগ্রহায়ণ ১৩১২ ?]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮ জানুয়ারি ১৯০৬

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সবিনয় নমস্কার

সুবোধের বৃহস্পতিবারের পত্র আজ পাইলাম। এতদিনে সে নিশ্চয়ই দিল্লী চলিয়া গেছে। আপনি ইতিমধ্যে দয়া করিয়া মীরাকে পড়াইবার ভার লইবেন। কেবল একঘণ্টা ইংরেজি পড়াইলেই চলিবে।

রথীরা মার্চ্চমাসে অ্যামেরিকায় রওনা হইবে। অতএব আপনি শীঘ্রই নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন। শরতের চিঠিখানা

পড়িয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে যদি চ বেশি ভরসা দেয় নাই তথাপি আপনি গিয়া পড়িলে আপনাকে পরামর্শ আদির দ্বারা যথোচিত সাহায্য করিবে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। একবার দুর্গা বলিয়া ঐ অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িবেন কি? বারম্বার হাল ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া বেড়ানো আপনার পক্ষে কোনোমতেই শ্রেয় নহে। হুগলির মায়াও আপনাকে ছাড়িতে হইবে— অথচ এমন জায়গায় আপনাকে যাইতে হইবে যেখানে আপনার সহায় কেহ আছে। কাজ আরম্ভের দুর্গতি সহ্য করিতেই হইবে,— পশ্চিমে একটু সুবিধা এই যে খরচ কম— অল্প কিছু পাইলেই আপনার দিন চলিয়া যাইবে। তা ছাড়া ভাল আম এবং লীচু যখন খাইবেন তখন নিশ্চয়ই মনে করিবেন এ দেশে আসা আমার বিফল হইল না।

বিদ্যালয় অঞ্চলের খবর কি? কিছুদিন ত আপনি এণ্ট্রেন্স ক্লাসে ইংরেজি পড়াইয়াছিলেন। নিতান্তই কি নৈরাশ্যজনক? রথীদের অধ্যাপনা স্বাস্থ্য এবং সাহিত্যচর্চ্চাদি কিরূপ চলিতেছে জানাইবেন। বোটে আসিয়া বিশেষ আরাম বোধ করিতেছি। কলিকাতায় আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা গ্রাস করিবার জন্য হাঁ করিয়াছিল— শরীরের গ্রন্থিতে দুই একটা থাবাও লাগাইয়াছিল —এখানে আগমনমাত্রেই সমস্ত বেদনা দূর হইয়াছে।

আকাশে মেঘ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আপনাদের ওখানে দৈবের অবস্থা কিরূপ? ইতি রবিবার [১৫ মাঘ ১৩১২]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ফেব্রুয়ারি ১৯০৬]

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

আপনি তবে নিঃসম্বল মজঃফরপুরে ভাসিয়া পড়িতে অনিচ্ছুক। তা যদি হয় তবে আপনাকে অধ্যাপনকার্য্যেই আমি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। আমি এখানকার কাজ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া আপনার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিব। রথীরা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি ভাসিয়া পড়িবে— সে ত আর বেশি দিন নয়। আপনিও এণ্ট্রেন্স ক্লাস তাড়াইয়া জীবন কাটাইতে নারাজ— এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আপনার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশা করি ভাগ্য একেবারে প্রতিকূল হইবে না।

আমার পূর্ব্বপত্রে আপনাকে ওকালতির অভিমুখে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি— এখন দেখিতেছি আপনার ব্রহ্মণ্যদেব আপনাকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইতে কোনোমতেই ভ্রষ্ট হইতে দিবেন না। অতএব অদৃষ্টের সঙ্গে বৃথা বিরোধের চেষ্টা না করাই ভাল। ইতি তারিখ জানি না।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ এপ্রিল ১৯০৬

ওঁ আগরতলা

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

ঘুরিয়া মরিতেছি। সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়া গেছে। বরিশালে যাইতে হইবে। তাহার পর চাটগাঁয়ে যাইবার কথা কিন্তু আমার মন বিদ্রোহী হইতেছে। বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছে। শনি আমাকে ঘুরাইতেছে— রবি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না। এতদিনে রথীদের রেঙ্গুন ছাড়িবার কথা। তাহাদের সংবাদ আমার হস্তগত যে কবে হইবে তাহার ঠিকানা নাই।

রথীদের সহিত আপনার যে সম্বন্ধ তাহা তাহারা কোনোদিন বিস্মৃত হইবে বলিয়া আমি আশঙ্কা মাত্র করি না। আপনি তাহাদের আত্মীয়শ্রেণীতেই গণ্য হইয়াছেন— সেই সম্পর্ক অনুভব করিয়া আমিও কোনোদিন আপনাকে দূরে রাখি নাই।

নিজের কাজের সম্বন্ধে কিরূপ স্থির করিলেন জানিতে উৎসুক আছি। এইবার একটু দৃঢ়সংকল্প হইয়া ভবিষ্যৎটাকে আক্রমণ করুন কেবলই হতাশচিত্তের অবসাদে জীবনটাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবেন না।

এই ষ্টেটের কোনো একটা কাজের জন্য যদি আকাঙ্ক্ষা রাখেন তবে রমণীকে একখানা পত্র লিখিবেন। তিনি ত আপনাকে জানেন। রমণীকে আমি নিজে অনুরোধ করিতে

পারি না— কারণ আমার অনুরোধ অসঙ্গত হইলেও তাঁহার পক্ষে এড়ানো কঠিন। এখানে একটি জজের পদ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা আছে— আপনি আত্মপরিচয় দিয়া আবেদন করিয়া দেখিবেন।

আমি আগামী বৃহস্পতিবারে বরিশালে যাইব— তাহার পরে শনি আমাকে যদি নিষ্কৃতি দেয় তাহলে বোলপুরে ফিরিবার চেষ্টা করা যাইবে।

আশা করি আপনার সমস্ত সংবাদ ভাল। ইতি ২৫শে চৈত্র ১৩১২

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯ মে ১৯০৬

ওঁ জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার

দোহাই আপনার। আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন পত্ররচনায় আমার শৈথিল্য অসামান্য— সেজন্য প্রথমে রাগ করিয়া অবশেষে তাঁহারা ক্ষমা করিতে শিখিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কালক্রমে আপনিও ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিবেন।

আমার মেজাজ সম্বন্ধে আপনি এমন ভুল বোঝেন কেন?

আমি সাধারণ ভদ্রলোকদের অপেক্ষা যে অধিক কোপন-স্বভাব সে কথা বিশ্বাস করিবেন না। আপনার পূর্ব্ব পত্রে বিচলিত হইবার মত কোনো কথা দেখি নাই। অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত আছি তাহার উপরে আবার রাগ করিয়া অপরাধ বাড়াইব আমার এমন প্রকৃতি নয়। ইতিমধ্যে শিলাইদহ প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরিতে হইয়াছে—তাহার উপরে বৈষয়িক এবং বেগার নানা কাজে আমাকে হাঁফ ছাড়িবার সময় দিতেছে না এমন অবস্থায় উত্তর যদি না পান তবে আমার মেজাজের উপর সন্দেহ করিবেন না। একবার যদি আমার পরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন তবে এরূপ দুটা চারটে ত্রুটিতে আপনাকে টলাইতে পারিবে না।

জাপানে রথীরা পৌঁছিয়াছে— কিন্তু চিঠি আসিবার সময় হয় নাই। দুইচার দিনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে আশা করিতেছি। ইতি ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

৩ অক্টোবর ১৯০৬

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার

জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিয়া আপনি বড়দাদাকে বিপদে ফেলিয়াছিলেন—তিনি উত্তরে প্রকাণ্ড এক লেখা ফাঁদিয়া শ্রান্ত

হইয়া পড়িতেছিলেন। আজকাল বড়দাদার লিখিতে বিশেষ কষ্ট বোধ হয়—বিশেষত তিনি একটা দার্শনিক প্রবন্ধের চিন্তায় নিবিষ্ট আছেন— অন্য কোনো প্রসঙ্গে তাহার বিঘ্ন ঘটিলে তিনি পীড়িত হইতে থাকেন এবং তাহাতে বস্তুত ক্ষতির সম্ভাবনা আছে— এই জন্য তিনি আমার উপরে প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। আমি একটা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব কিন্তু আমার অবস্থাও বিশেষ আশাজনক নহে। কিন্তু আমার বোধ হয় জাতিভেদ সম্বন্ধে মীমাংসা সদ্য আপনার পক্ষে জরুরী নহে এইজন্য বড়দাদাকে আমি আপাতত নিষ্কৃতি দিবার জন্য এ ভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছি— কিন্তু খুব বেশি তাগিদ দিবেন না।

চট্টগ্রাম এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে মনস্থির করিতে হইবে— কিন্তু স্বয়ম্বরসভায় গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিবেন না— সময় উত্তীর্ণ হইয়া লগ্ন বহিয়া যাইবার পূর্ব্বে যাহার হউক্ একজনের গলায় মালা দিবেন। কিছু না হয় ত মজঃফরপুর আছে— কিন্তু মালদহ নৈব নৈবচ। অজিতকে ব্রহ্মদেশের খবর সংগ্রহে তাড়া লাগাইব।

মহাভারত অর্দ্ধমূল্যে পাওয়া অসম্ভব নহে। আপনি শৈলেশকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া পত্র লিখিবেন— অমনি "খেয়া"র জন্য তাগিদ দিবেন। শৈলেশ স্বভাবতই নিশ্চেষ্ট— আপনিও যদি নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করেন তবে বিধাতা আপনার সহায় হইবেন না।

আমার বিদ্যালয়ের পরমায়ু ঈশ্বরের হাতে। তিনি যদি

উপযুক্ত লোক জোগাইয়া দেন তবেই ইহার উন্নতি হইবে নতুবা ইহা স্কুলের পদবী হইতে খুব বেশি উপরে উঠিতে পারিবে না। আপনারা আমার যতটা ক্ষমতা কল্পনা করেন ততটা আমার নাই। আমার যে পরিমাণ সাধ সে পরিমাণ সাধ্য নহে। বিজয়ার সাদর নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ১৭ই আশ্বিন ১৩১৩

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

১৩ নভেম্বর ১৯০৬

ওঁ বোলপুর

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আজ আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। যদি এমন হয় যে সম্প্রতি আপনি বেকারপ্রায় অবস্থাতেই আছেন তবে পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত এখানকার এণ্ট্রেন্স্ ক্লাসের কর্ণধার পদ আপনি অধিকার করিতে পারিবেন কি? তাহা হইলে আমি বড়ই নিশ্চিন্ত হই। কাজটা সুখকর নয় জানি—কিন্তু এই কাজে আপনার হাড় পাকিয়া গেছে আপনার পক্ষে কয়েক মাসের জন্য এ বোঝা দুঃসাধ্য হইবে না। যদি কোনো মতে মন স্থির করেন তবে দেরি করিবেন না—এখনি অবিলম্বে পুরাদমে কাজ সুরু করিয়া দেওয়া অত্যন্ত দরকার হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতেই কি আপনার আশ্রয় পাওয়া

যাইবে ? এখানে রথী সন্তোষ নাই কিন্তু জগদানন্দ আপনাদের ভাঙাহাটের একমাত্র মালিক হইয়া সপরিজনে জমিয়া বসিয়া আছেন। এখন এখানকার স্বাস্থ্যও খারাপ নহে। লাইব্রেরিতে বইও বিস্তর জমিয়াছে। অতএব নির্বিচারে তথাস্তু বলিয়া একেবারে গাড়িতে চড়িয়া বসুন। ছাত্রকয়টির মধ্যে দুজনকে, মনের মতন পাইবেন— বাকি তিনটিকে কোনোমতে লগি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে নেহাৎ যদি

যত্নে কৃতে ন সিধ্যতি
কোঽত্র দোষঃ—

আমি রোগশয্যা হইতে খাড়া হইয়া উঠিয়াছি— এখন আর কোনো উপসর্গ নাই। কেবল মাঝে মাঝে মনটা এই হেমন্ত-কালের মরাল-কল-কূজিত পদ্মার সিকতিনী বেলাভূমির জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছে। যদি আপনাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তবে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে একবার পদ্মার আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। মীরা, বেলার কাছে মজঃফরপুরে গেছে —আমার ঘরে এখন কেবল শমী অবশিষ্ট। তাহার প্রতিও আপনি যদি কিছুদিন মনোযোগ করেন তবে আমি একবার ছুটির সুখ ভোগ করিয়া আসি। স্বার্থের কথা সমস্তই খোলসা করিয়া বলিলাম আপনার কোনো স্বার্থে যদি না বাধে তবে একবার অনুকূল চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ইতি
২৭শে কার্ত্তিক ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১

১৭ এপ্রিল ১৯০৭

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

আপনার নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনি যে পর্য্যন্ত নানা দ্বিধায় কর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া না বসিতেছিলেন সে পর্য্যন্ত আপনার জন্য বিশেষ উদ্বেগ অনুভব করিতেছিলাম। এখন যে এক জায়গায় স্থিতিলাভ করিয়া বসিয়াছেন ইহাতে বড়ই তৃপ্তি বোধ করিতেছি। এখন হইতে আপনার সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তি এক জায়গায় সংহত হইয়া নিশ্চয়ই ক্রমশ বিকাশ লাভ করিতে থাকিবে। যে কোনো অবস্থার মধ্যেই পড়ুন না কেন আপনি নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে পারিলেই সমস্ত বিশ্বকে অনুকূল দেখিতে পাইবেন।

আমি বিদ্যালয়ের কাজে ক্রমশই বেশি করিয়া জড়িত হইতেছি। অনেক ছাত্র বাড়িয়াছে— দায়ও বাড়িতেছে। তাড়াতাড়ি অনেকগুলি ঘরদুয়ার ফাঁদিতে হইতেছে। ল্যাবরেটরি ঘরের উপরে একটি দোতলা হইয়াছে— তাহাতেও কুলাইতেছে না। এখনো নানা কাজের জন্য আরো অনেকগুলি ঘর নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অর্থব্যয়ের আশঙ্কা করিবার অবকাশও পাওয়া গেল না— চারিদিকেই মিস্ত্রি লাগাইয়া দেওয়া গেছে। আর কিছুদিন পরে এখানে আসিলে চিনিতেই পারিবেন না। ইতিমধ্যে আমার ছাত্রদের নীড়ে পানবসন্ত আসিয়া ঢুকিয়াছে— দেখিতে দেখিতে পাঁচটি ছুটি পড়িয়াছে—

আরো অনেকগুলি পড়িবে বলিয়া 'মরিয়া' হইয়া বসিয়া আছি। আমার বৃহৎ সংসারটির এই সমস্ত সমস্যা। এখনি অদূরে একটি ছেলে colic বেদনা লইয়া কাঁদিতেছে— আপনাকে মনস্থির করিয়া পত্র লেখা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে— ওদিকে ডাকের সময় হইয়া আসিয়াছে।

যাহা হউক্ আপনি একটু স্থির হইয়া বসিয়া বিবিধ মক্কেলের বহুবিধ থলি ঝুলি ও লোহার সিন্ধুকের মধ্যে আপনার শিকড় বিস্তার করিয়া দিন তারপরে একদিন আপনার ওখানে আমাদের নিমন্ত্রণ রহিল। ইতি ৪ঠা বৈশাখ ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ ইতিহাস রচনার খবর পাইয়া উৎসুক হইয়া রহিলাম।

৪২

২২ মে ১৯০৭

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয় নমস্কারসম্ভাষণ—

বুকপোষ্টে গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড পাঠাই। শ্রদ্ধার সহিত যদি পড়িয়া দেখেন তবেই আমার মূল্য লাভ হইবে— তার বেশি আর কিছু দিবেন না। সমস্ত খণ্ড শেষ হইতে এক বৎসরেরও উপর লাগিবে অতএব দিব্য অবকাশমত রহিয়া বসিয়া পড়িতে পারিবেন।

আমরা কি, দেশের যথার্থ অবস্থা কি তাহার সত্য পরিচয় পাওয়া দরকার ; সেই পরিচয় পাওয়া গেছে— অতএব এই পরিচয়ের ভিত্তির উপরেই প্রতিকারের পত্তন করিতে হইবে— মিথ্যাস্বপ্নের উপর করিলে কোনো ফল নাই।

আগামী ২৩শে জ্যৈষ্ঠ মীরার বিবাহ স্থির। স্থান শান্তিনিকেতন। পাত্র শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ইতি ৮ই জ্যৈঃ ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯ মে ১৯০৭

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কারসম্ভাষণ—

গদ্য গ্রন্থাবলী একটি একটি খণ্ডে সুদীর্ঘকালে শেষ হইবে— অতএব যদি ইহার মূল্য উপলক্ষ্য করিয়া বোলপুর বিদ্যালয়কে কিছু দিতে ইচ্ছা করেন তবে যখন খুসি যেমন খুসি দিতে পারেন। তবে কথা এই, বিদ্যালয় হইতে আপনারও ত গুরুদক্ষিণা প্রাপ্য হইয়াছে— বিদ্যালয়ের অতি দুর্ব্বল শিশু অবস্থায় আপনি তাহাকে পালন করিয়াছেন এখন অপেক্ষাকৃত সমর্থ অবস্থায় সে যদি আপনাকে কিঞ্চিৎ উপহার দিতে উদ্যত হয় তবে তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

দেশের কথা লিখিতে গেলে পুঁথি বড় হইয়া উঠিবে। যদি

কোনো প্রবন্ধআকারে কোনো কাগজে লিখি তবে দেখিতে পাইবেন— যদি নাও লিখি তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

নগেন্দ্রকে বিবাহের পরে আমেরিকায় রথীদের কাছে কৃষিবিদ্যা শিখিতেই পাঠাইব। ফিরিয়া আসিলে রথীদের সঙ্গে একসঙ্গে এক কাজে যোগ দিতে পারিবে।

বিবাহের দিন আসন্ন হইয়া আসাতে আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া আছি। আজ সন্ধ্যার গাড়িতে মজঃফরপুর হইতে শরৎ আসিবেন। বেলা পূর্ব্বেই আসিয়াছে।

বোধহয় খবর পাইয়াছেন জগদানন্দের বড় মেয়েটির বিবাহ সম্ভবত আষাঢ় মাসে সম্পন্ন হইবে। বিবাহ বোলপুরে হওয়াও অসম্ভব নহে— বরপক্ষ সেইরূপ প্রস্তাব করিয়াছে— কারণ পাত্রটি ভাগলপুরে কাজ করে— বোলপুরে আসা তাহার পক্ষে সুবিধাকর। ওদিকে কলিকাতায় ২৩শে তারিখেই শ্রীশবাবুর দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হইবে। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন প্রজাপতি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন— তিনি এক fool হইতে অন্য foolকে আশ্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন। ইতি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪

১ সেপ্টেম্বর ১৯০৭

ওঁ বোলপুর

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

আপনাকে আজ প্রায় ২০।২৫ দিন হইল একখণ্ড "প্রাচীন সাহিত্য" (গদ্য গ্রন্থাবলীর ২য় খণ্ড) পাঠাইয়াছি। এখানিও আমি স্বহস্তে মোড়াই করিয়া টিকিট লাগাইয়া ঠিকানা লিখিয়া রওনা করিয়া দিয়াছি। মনে করিতেছিলাম একটা প্রাপ্তি-সংবাদ পাওয়া যাইবে। সংবাদ পাইতে যতই দেরী হইতে লাগিল মনে ভাবিলাম আমার সংবাদ পাইয়া কাজ নাই কিন্তু আপনার অবসরের অভাব উত্তরোত্তর এই মত বাড়িয়াই চলুক— মক্কেলের নিবিড় ব্যূহে এমন একটুও ফাঁক যেন না থাকে যে ছিদ্রটুকু দিয়া একটা ক্ষুদ্র পোষ্টকার্ডও কোনোমতে গলিয়া আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছে।

ইতিমধ্যে কাল আপনার চিঠি আসিয়া হাজির। তাহাতে আমার চোখের বালি ও কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা আছে কিন্তু "প্রাচীন সাহিত্য" সম্বন্ধে উল্লেখমাত্র নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতেছে আমারই বইখানি আপনার হস্তগত হয় নাই— এবং সেও যে মক্কেল সম্প্রদায়ের ঘন পরিবেষ্টনবশত তাহা নহে, পোষ্ট আপিসের বিড়ম্বনাই তাহার কারণ।

কিন্তু ইহার প্রতিকার কি? আপনাদের পোষ্ট বিভাগে নিশ্চয়ই কোনো রসগ্রাহী ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব আছে। তাঁহার

রুচি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান তদনুরূপ নহে।

বররুচি লিখিয়াছিলেন—

অরসিকেষু কবিত্ব নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

কিন্তু সুরসিকের দৌরাত্ম্যের কথা যদি জানিতেন তবে ঐ সঙ্গে তাঁহাকে এ কথাও লিখিতে হইত—

সুরসিকেন কবিত্ব প্রচারণং
শিরসি &c &c &c

যাই হউক পোষ্ট অপিসের পাপে আপনাকে দণ্ডনীয় করিব না— আর দুই চারিদিনের মধ্যেই আরো একখণ্ড বাহির হইবে, এবং ইতঃপূর্ব্বে "লোকসাহিত্য" নামে তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে এই তিনখানি একত্রে রেজিষ্ট্রি ডাকে আপনাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।

মীরার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল তাহাকে লইয়া কিছুকাল উদ্বেগে কাটিয়াছে— এখন সে কতকটা ভাল আছে। আপনার সন্তানগণ ও গৃহিণী ভাল আছেন ত?

বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ৮০ জন ছাত্র হইয়াছে— পূজার পরে একশত জনের বেশি হইবে বলিয়া আশঙ্কা আছে। ইতি রবিবার ১৫ই ভাদ্র ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭

শিলাইদহ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

মনুষ্য না পক্ষী! শিলাইদহ থেকে আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করবেন।

মীরাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলুম। সেখানে তার শরীর একটু ভালই আছে, ইতিমধ্যে এই দিক থেকে ডেপুটি বাহাদুরের ভ্রূকুটির অন্তরালে একটুখানি বৈষয়িক মেঘগর্জ্জন শোনা গেল। তাই চলে আসতে হল। ডেপুটির ক্ষোভ শান্ত করে দিয়েই চলে যাব স্থির করেছিলুম ইতিমধ্যে পদ্মা আমার মনোহরণ করে বস্‌ল এখন পড়ে পড়ে জলকল্লোল শুনচি। কর্ম্মের উপলক্ষে আগমন বটে কিন্তু অত্যন্ত অকর্ম্মণ্যভাবে দিনক্ষেপ করচি। কেবল মনের খুব নিভৃত দেশে একটি কাঁটা থেকে থেকে বিঁধচে— মনে পড়চে ডেপুটিবাবু নিমন্ত্রণ করে গেছেন যেন যাবার দিনে তাঁর ওখানে অন্তত একটা বেলা কাটিয়ে যাই। লোকটি নিরতিশয় ডেপুটি— নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে মুহূর্ত্তকাল আত্মবিস্মৃত নন— তাঁর ইঙ্গিতের পশ্চাতে ব্রিটিশরাজের সমস্ত প্রতাপ অপেক্ষা করে আছে এই গৌরবটুকু তিনি কিছুতেই হজম করতে পারচেন না। যাই হোক্ আজ-কালকার দিনে সান্ত্বনার বিষয় এই যে নিমন্ত্রণটা মধুর ভাবেই হয়েচে এবং এক বেলার চেয়ে বেশি দিনের আতিথ্য আমাকে নিতে হবে না।

আপনার প্রস্তাবটি অত্যন্ত উত্তম। কিন্তু ভাল ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়াটা কি শ্রেয়? সংসারে পুরস্কার হতে বঞ্চিত হওয়াতেই যথার্থ ভালর পরীক্ষা ও পরিচয়। আমি ভাল এ কথা কেউ যেন প্রাইজ দেখিয়ে প্রচার করবার অবকাশ না পায়। ছেলেরা বিশেষত বুড়োরা ওটা যতই ভুলে থাকে ততই ভাল। অতএব এ কথাটা বিবেচনা করে দেখ্‌বেন। বাল্যকালে একটা ভুল শিক্ষা হয়েছিল

লেখাপড়া করে যেই
গাড়িঘোড়া চড়ে সেই—

কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর ভুল শেখানো হবে যদি বলা যায়—

ভাললোক হবে যেই
পুরস্কার পাবে সেই।

এবারে কলকাতা থেকে বেরবার সময় আমার কোনো অনুচরকে বলে এসেছিলুম আপনাকে "লোকসাহিত্য" ও "সাহিত্য" গ্রন্থ দুটি পাঠিয়ে দিতে। যেহেতু শৈলেশের উপর এ ভার দিই নি আপনি এত দিনে নিঃসন্দেহ পেয়েচেন। আশা করি ধনেমস্কেলে লক্ষ্মীলাভ করচেন। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬

১৮ অক্টোবর ১৯০৭

ওঁ বোলপুর

প্রিয়বরেষু

বিজয়ার সাদর নমস্কার গ্রহণ করবেন। আপনি কোনো একটি মঙ্গলকর্ম্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবার ইচ্ছা করেন। আমার বোধ হয় আপনি যেখানে আছেন সেখানকার বাঙালীর মনে যদি দেশহিতের জন্য উদার উৎসাহ জাগাবার চেষ্টা করেন তাহলেই নিজেকে সার্থক মনে করবেন। যে কয়জন বাঙালী আছেন সকলে সদ্ভাবে মিলে সুখে দুঃখে এক হয়ে পড়াশুনা আমোদপ্রমোদ এবং হিতকর্ম্মে ক্ষুদ্র সমাজটিকে সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল করে তুল্‌তে পারেন তাহলেই মস্ত কাজ করা হবে। আপনি বল্‌বেন— শক্ত— শক্ত নয় ত কি? বল্‌বেন, বাধা বিস্তর— বাধা ত আছেই। কিন্তু যদি নিজেরই ভিতরকার সমস্ত বাধা কাটিয়ে যথার্থভাবে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন ও কিছুতেই হাল ছেড়ে না দেন তাহলে নিশ্চয়ই ফল পাবেন। আমরা যেখানেই থাকি চারদিকেই আমাদের খুব আঁট বাঁধ্‌তে হবে— তা না হলে চিরদিন পড়ে মার খাব এতে আর সন্দেহ নেই। সেখানে ছেলেদের শেখান, মেয়েদের শেখান, বুড়োদের কর্ত্তব্যবন্ধনে টেনে আন্‌তে চেষ্টা করুন— সেখানকার হাওয়াটা পরিষ্কার করে ফেলে উচ্চভাবে পরিপূর্ণ করে তুলুন— কোনোমতেই দম্‌বেন না, কোনোমতেই পিছবেন না— কারো দ্বারা উপহসিত হয়ে বা বাধা পেয়ে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করবেন না—

নিজের দ্বিধাহীন শক্তিকে সম্পূর্ণ জাগিয়ে তুলে সকলের মাঝখানে মাথা উঠিয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবেন— এর চেয়ে আর কোনো কাজ নেই।

আমি বিদ্যালয়কে ছুটি দিয়ে কিছুদিনের জন্যে এখানে পরিপূর্ণ নির্জ্জনতা ভোগ করতে এসেছি। ছুটির পরে অনেক ছাত্র বৃদ্ধি হবে— ১০০ জন ছাড়িয়ে যাবে— তখনকার জন্যে আরো জন তিনেক সদুৎসাহী ইংরেজি বাংলায় অভিজ্ঞ ভাল শিক্ষক খোঁজ করচি। আপনি কি হুগ্‌লি ট্রেনিং অ্যাকাডেমির শিক্ষক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জানেন? তিনি কি রকম লোক? তাঁর শিক্ষাদীক্ষা কি রকম? বিদ্যালয়ে লোকের অভাবে আমাকে বড়ই পীড়া দিচ্চে। শুধু শিক্ষক হলে হবে না— মানুষ হওয়া চাই।

আশা করি সপরিজনে ভাল আছেন। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

৫ ডিসেম্বর ১৯০৭

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার

যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে

বেড়াইতে গেল— তাহার পরে আর ফিরিল না।

আমি আগামী কল্য শিলাইদহে পদ্মায় বাস করিতে যাইব। সেখানে মেয়েদের লইয়া কিছুদিন থাকিব তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়া বোলপুরে আমার কর্ম্মে যোগ দিতে হইবে। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদা

সবিনয়নমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছি। আরো দুঃখ যদি দেন ত তাহাও শিরোধার্য্য করিয়া লইব— আমি পরাভূত হইব না।

আপনি নিজের কোনো সংবাদ লেখেন নাই কেন? ওখানে আপনার কাজ কিরূপ চলিতেছে? পরিজনবর্গের অস্বাস্থ্য লইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন তাহা বোধ করি কাটিয়া গিয়াছে।

আমি পদ্মার তীরে নিভৃতে আশ্রয় লইয়াছিলাম— আমার ভাগ্যদেবতা সেই সন্ধান পাইয়া এখানেও তাঁহার এই শিকারটির প্রতি লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছেন। আমাকে পাবনার শান্তিপ্রিয়

লোক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি করিয়াছেন। প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি ত জানেন কোনোদিন কোনো আপত্তি করিয়া জয়ী হইতে পারি নাই। আমি চূড়ান্তভাবে "না" বলিতে আজও শিখি নাই। যাহা হউক সভাপতি হইয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। দেশে শান্তি যখন নাই তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? কলহ করিবে স্থির করিয়াই লোকে এখন হইতে অস্ত্রে শান দিতেছে। যদি অক্ষত দেহে ফিরিয়া আসি খবর পাইবেন।

বিজয়বাবুর সংবাদ কি? কিছু লিখিতেছেন?

গদ্যগ্রন্থাবলীর কোন্‌ পর্যন্ত পাইয়াছেন ভুলিয়াছি বলিয়া পাঠাইতে পারি নাই। মনে করাইয়া দিবেন। ইতি ২৪শে মাঘ ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৯

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বকনিবেদন—

ও সব কথা আর তুল্‌বেন না— যা প্রবাহিত হয়ে যাচ্চে তাকে যেতে দিন— জীবনে কত স্তুতিনিন্দা কত সম্মান অপমানের মধ্যে দিয়ে আজ প্রায় পঞ্চাশের পারে এসে ঠেকেছি

—সত্ত যেটাকে অত্যন্ত বড় এবং কঠিন ও দুঃসহ বলে মনে হয়েছে সে সমস্তই ছায়ার মত হয়ে গেছে— এম্‌নি করে একদিন সমস্ত বাদবিবাদের বাইরে ভেসে চলে যাব তার পরে যা সত্য তাই স্থির হয়ে থাক্‌বে— তাতে আমার ব্যক্তিগত কোনো লাভও থাকবে না কোনো লোকসানও থাক্‌বে না। দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাঁকে কিছু বলে নিয়েছি – তার পরে এইখানেই খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই চুকে যায়— অন্তত আমি ত এইখানেই চুকিয়ে দিলুম। এতে বৃথা অনেকটা সময় যায়— আমার ত আর সে সময়ের বাহুল্য নেই। আগুনের উপর কেবলি ইন্ধন চাপিয়ে আর কত দিন এই রকম বৃথা অগ্নিকাণ্ড করে মরব? দূর হোক্‌ গে, সমস্ত নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে প্রাণটাকে জুড়োতে পারলে বাঁচি। ঈশ্বর করুন তাঁর কথা ছাড়া আর কারো কথা যেন এ বয়সে আমাকে টানাটানি করে না মারে— সব পাপ শান্ত হোক্‌।

পৃথিবীতে আইন বলুন আদালত বলুন সবই ত আধাখেঁচড়া —সম্পূর্ণতা কোন্‌ ব্যবসায়েই বা আছে? এই সমস্ত জড়তা জটিলতা অস্ফুটতার মধ্যে দিয়েই মানুষ আপনার ইচ্ছাকে সফল করতে চেষ্টা করচে। যে দেশে সকল বিচারকই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেখানে আইন আদালতের প্রয়োজনই হয় না। চোর জুয়াচোরের যখন অভাব নেই তখন কুবিচারকেরও অভাব থাকতে পারে না— কারণ চোরও ত অবস্থাভেদে বিচারকের আসনে স্থান পায়। যে উপকরণে চোরকে গড়ে সেই উপকরণে বিচারককে গড়বে না এমন স্বতন্ত্র কারখানাঘর ত জগতে নেই।

জড়িয়ে মিশিয়ে ভালয় মন্দয় সমস্ত তৈরি হয়ে উঠ্‌চে অতএব বাস্তব ব্যাপারের কাছে খুব বেশি কিছু দাবী করবেন না— অথচ এই বাস্তবের সমস্ত অপূর্ণতার ভিতর থেকেই পরিপূর্ণের প্রত্যাশা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করবেন না— এই আশ্চর্য্য দ্বন্দ্বই হচ্চে মানুষের জীবন। সেইজন্যেই গীতা বলেন কাজ করে যান লড়াই করে যান তারপরে ফল যা হয় তা হবে। বস্তুত উপস্থিত ফলটা কিছুই নয়— কাজের দ্বারা কাজ থেকে মুক্তিলাভটাই হচ্চে চরম সিদ্ধি। এই ত আমার ফিলজফি— কিন্তু

"প্রেমদাস সুন্দর মূরখ হ্যায়
কহনা হ্যায়, নেহি করনা।"

ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ জুলাই ১৯০৮

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। মাঝে আমি দীর্ঘকাল নির্ব্বাসনে ছিলুম— অর্থাৎ মেয়েদের নিয়ে বোলপুরের বাহিরেই কাটাতে হয়েচে। আবার সম্প্রতি ফিরে এসেচি। কিন্তু এখন আমার কাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে।

আমাদের জমিদারীর মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগণাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেচি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে— পথ ঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, শালিসের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্ম্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারে গ্রাম্যসমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্চে— হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম্ম হিন্দু সমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েচে যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দুসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealize করে কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছাই হয় না।

যাই হোক একদিকে বোলপুর বিদ্যালয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে অভদ্র এবং অভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে ভদ্র করে উভয় শ্রেণীর বিচ্ছেদ দূর করবার চেষ্টা করচি।

এমন সময়ে আপনি আমাকে আহ্বান করেচেন। এ আহ্বানে আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল ভাবেই সাড়া দিচ্চে কিন্তু নিশ্চয়ই জানবেন আমার ক্ষমতা নেই যে আমি অন্য কাউকে

কোনো লক্ষ্যসাধনে নিযুক্ত করি। আমি স্বভাবতই leader শ্রেণীর নই। আমার মনে যে চিন্তা আসে সেইটেকে লিখ্‌তে পারি এবং যখন দেখি আমার পরামর্শ কেউ কাজে পরিণত করবার কোনো চেষ্টা করচে না তখন আমি নিজের একক চেষ্টায় সেই কাজ আরম্ভ না করে থাক্‌তে পারি নে। কিন্তু অন্য কাউকে তাঁর নিজের শক্তির উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করে দিতে গেলে আমি রাস্তা খুঁজে পাই নে। যাঁরা স্বভা[ে]বই leader তাঁরা মানুষকে উপকরণের মত ব্যবহার করতে পারেন, তাঁরা প্রত্যেককে তার স্বস্থানে স্থাপন করতে পারেন এইজন্য মানুষরা তাঁদের সাড়া পেলে আর স্থির থাক্‌তে পারে না— সার্থকতা অন্বেষণে তাঁর চারদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে জমাট হয়ে বসে। আমাকে সেই দলের লোক বলে ভ্রম করবেন না— আমি লেখক মাত্র— এবং যেটুকু সাধ্য আছে সেই পরিমাণে সাধকও বটে। আপনারা যখন প্রীতিগুণে কাছে আসেন তখন মনে উৎসাহের জোয়ার আসে, যখন দূরে যান তখন নিজেকে অসহায় বোধ হয়। ঈশ্বর যে কলম চালানোর ভার দিয়েচেন তার দ্বারা যদি লোকের হৃদয়ক্ষেত্রে ঢেলা ভেঙে কিছু চাষ দিয়ে যেতে পারি— কিছু বীজ বোনাও যদি সারা হয় তাহলেই আমার কাজ সাঙ্গ হবে— কিন্তু ফসল ঘরে তুলে মাড়াই করে গোলা পূর্ণ করবার মত সঙ্গতি আমার নেই— আমি কৃষাণ মাত্র। তা হোক আপনারা মাঝে মাঝে কাছে আস্‌বেন আমার কাছ থেকে কাজের ভার নেবার জন্যে নয় আমারই কাজকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে— চতুর্দ্দিকে আপনাদের হৃদয় অনুভব

ক'রে আমি "আমরা" হয়ে উঠতে পারি। আপনাদের বল আমাকে দিন ;— আমার বল আছে বলেই যে তার আকর্ষণে যোগ দেবেন তা নয় কিন্তু আপনাদের বল আছে বলেই আমাকে দান করবেন। আপনাদের সঙ্গে আমার যে মিলন হয়েছে তা ঈশ্বর একদিন নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সার্থক করে দেবেন। ইতি ৩০শে আষাঢ় ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

১৫ নভেম্বর ১৯০৮

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সবিনয়নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

হঠাৎ হৃদ্‌রোগে সন্তোষের বাপ মারা গেছেন হয়ত সংবাদ-পত্রে সে খবর পাইয়া থাকিবেন। তাঁহার পরিবার এবং সন্তোষের জন্য মন উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। তিনি ত ঋণ ছাড়া আর কিছু জমাইয়া যাইতে পারেন নাই— আর রাখিয়া গিয়াছেন চারটি অবিবাহিত কন্যা। সন্তোষ আপাততঃ আমেরিকাতেই যাহাতে উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে সেইরূপ পরামর্শ দিয়াই পত্র লিখিয়াছি। সেখানে চেষ্টা করিলে এখনি সে মাসিক ৩০০।৪০০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। আমার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্র কলেজের ছুটির তিন মাসের মধ্যে ১৫০০ টাকা জমাইয়া তাহার বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়াছে।

সত্যেন্দ্র রেণুকার মৃত্যুর পর এতদিন বোলপুরেই কাজ করিতেছিল— অল্প মাস পাঁচ ছয় হইল আমিই চেষ্টা করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। এইবার পূজার ছুটিতে আমাদের কোনো কোনো অধ্যাপক পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন— দিনুও গিয়াছিল। সেই সময়টাতে বিদ্যালয়ে শারদোৎসবের নিমন্ত্রণে সত্য আসিয়াছিল। পশ্চিমের যাত্রীদিগকে দেখিয়া হঠাৎ তাহার মন উতলা হইয়া উঠিল। কাহারো নিষেধ না মানিয়া কাজকর্ম্ম ফেলিয়া তাহাদের দলে ভিড়িয়া বাহির হইয়া গেল। লাহোর পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে ও দিনুকে জ্বরে ধরিল। সেখান হইতে দুইজনে অজিতকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিল। দিনু চিকিৎসায় রক্ষা পাইয়া গেল। সত্যেন্দ্র তিন চার দিন জ্বর ভুগিয়া নববধূকে অনাথা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিদায় লইয়াছে। মৃত্যুর লীলা অনেক দেখিলাম।

আপনার সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই! বোধহয় সম্বলপুরে গিয়া অবধি এদিকে আর আসেন নাই। যে বিদ্যালয়টিতে চারা অবস্থায় জলসেচন করিয়া গিয়াছেন ফল ধরিবার কাছাকাছি সময়ে এখন তাহাকে একবার দেখিয়া যাইবেন না? আপনাদের ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে কেবল এক জগদানন্দ অতীত ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন— আর সকলেই নূতন লোক — সমস্যাও নূতন নূতন উঠে — জালে কতবার কত গিঁঠ পড়িয়া যায়— আমাকেই একলা বসিয়া সেই গ্রন্থি মোচন করিতে হয়।

এখানকার লাইব্রেরি হইতে বই লইবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন— পাঠানো ও ফিরিয়া পাঠানোর উৎপাত ও তজ্জনিত ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়া আর কোনো আপত্তির কারণ দেখি না। কেননা দেখিতেছি অধ্যাপকগণ ছুটির সময় বাড়িতে বই লইয়া যাওয়াই নিয়ম করিয়া তুলিয়াছেন এমন অবস্থায় আপনার বেলায় লাইব্রেরির দ্বার রুদ্ধ করা চলিবে না। আপনার যে বই আবশ্যক হইবে অজিতকে লিখিবেন— অজিতই লাইব্রেরির অধ্যক্ষ।

রথী ও সন্তোষ আগামী জানুয়ারিতে গ্রাজুয়েট করিবে। রথী তাহার পরে সেখানে কোনো কৃষিক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজ করিয়া পাকা হইয়া আসিবে এইরূপ সংকল্প করিয়াছে, কিন্তু সন্তোষের পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহা বলিতে পারি না— হয়ত উদ্বেগগ্রস্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিবে। পোড়া দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমার ইচ্ছা করে না যে তাহারা আসে।

মাঝে মাঝে চিঠিতে আপনাদের সংবাদ দিবেন। আর যদি সুযোগমত দেখা দিতে পারেন ত কথাই নাই। গদ্য-গ্রন্থাবলী নিয়মমত পাইতেছেন ত? শেষ বই বাহির হইয়াছে "সমাজ"। তাহার পর হইতেই ছাপাখানার আর সাড়া পাওয়া যায় নাই। ইতি ৩০শে কার্ত্তিক ১৩১৫ বোলপুর

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

২১ নভেম্বর ১৯০৮

ওঁ

বোলপুর

সবিনয়নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনি এত অল্পে আঘাত পান— সেই আঘাতের বেদনা আবার আমাদেরও ফিরে এসে লাগে। এবারে বিজয়ার সময় কলকাতায় ছিলেম না— তখন সপরিজনে বোটে শিলাইদহে ছিলাম— সেখানে শরীর একেবারেই ভাল ছিল না— জ্বর প্রভৃতি নানা উপসর্গে অনেকদিন ভুগেছিলুম— তার সঙ্গে নানাবিধ দুশ্চিন্তা জড়িত হয়ে ছিল— সেইজন্যেই আপনার বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ আমার অন্তঃকরণে ফলিত হয়েও প্রতিফলিত হবার সুযোগ হয় নি। সে জন্যে আমি ত নিজেকেই করুণার পাত্র বলে মনে করি। যাই হোক আপনি এ বিশ্বাস দৃঢ় করে রাখ্‌বেন যে এখানে আপনার আসনটি যত্নেই রয়েছে এবং দ্বার রুদ্ধ হয় নি। আপনি অন্যায় সংশয়ের দ্বারা আমার প্রতি অবিচার করবেন না।

এখান থেকে নভেল প্রভৃতি যেরকম বই আপনি ইচ্ছা করেন অজিত আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারবে— তাতে আপনি সঙ্কোচ করবেন না।

বিদ্যালয়ের নূতন সেশন আরম্ভ হয়েছে। তাই নিয়ে আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমাকেও ক্লাশ নিতে হচ্চে তাতে ক্লাসের সুবিধা হচ্চে কি না বলা কঠিন কিন্তু

আমার সমস্ত অবসর মারা যাচ্চে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।
ইতি ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩

১১ ডিসেম্বর ১৯০৮

ওঁ বোলপুর

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার চিঠিতে সন্তোষের কথা পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। সন্তোষ যে বেশ সহজ স্বাভাবিকতা লাভ করিতে পারে নাই সে পূর্ব্বেই জানিতাম। সে নিজেকে ভুলিতে পারে না—এইজন্য তাহার কথা সাজানো কথার মত হইয়া উঠে। এটা একটা মানসিক অস্বাস্থ্যতা, অতএব এ লইয়া ক্রুদ্ধ হইবেন না—তাহার প্রতি করুণা রক্ষা করিবেন এবং স্নেহ করিবেন। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যখন বয়স হইবে এবং সে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে তখন তাহার এ রোগ কাটিয়া যাইবে। হাম, দাঁত ওঠা প্রভৃতি কতকগুলি অল্পবয়সের শারীরিক রোগ আছে তেমনি আপনাকে ভুলিতে না পারা এবং আপনার শক্তিকে ভুল বোঝা অল্প বয়সের মনোবিকার। এই বিকারকে অনেকেই উত্তীর্ণ হইয়া পুনশ্চ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা অনেকস্থলেই দেখা যায়। সন্তোষকেও এই যৌবনসুলভ বিকৃত আত্মচেতনার ব্যাধি কাটাইয়া সহজ মানুষ হইয়া উঠিতে

হইবে। সংসারের আঘাত অভিঘাতে আপনিই তাহা ঘটিবে। বিশেষত যাহারা এইরূপ অভিমানগ্রস্ত সংসারে তাহারা প্রশ্রয় পায় না— তাহারাও অন্যকে পীড়িত করে বলিয়া অধিক আঘাত লাভ করে। সন্তোষকে এই দুঃখের ভিতর দিয়া যাত্রা করিতে হইবে এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি দয়া রাখিবেন। সৌভাগ্যক্রমেই রথীকে এই আত্মাভিমান আক্রমণ করে নাই— সে তাহার কোনো পত্রে কখনো আভাস ইঙ্গিতেও নিজের গৌরব প্রকাশ করে নাই এ সম্বন্ধে রথী তাহার পিতাকে জিতিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয় ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ আছে। ইতি ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

১৩ এপ্রিল ১৯০৯

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

যোগেন্দ্রবাবুর কাছে যথাসম্ভব আপনার সমস্ত খবর নিয়েছি। আমার নিজের খবর ভালই। অভিযোগ করবার বিষয় বিশেষ কিছুই দেখছিনে— জমিদারীতে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে কিছু অর্থাভাব ঘটেছে— কিন্তু সে অভাবটাকে এমন সীমায় ঈশ্বর নিয়ে যান নি যাতে নালিশ দায়ের করা যায় বা আপিল মঞ্জুর হতে পারে। তা ছাড়া মনে মনে ঠিক করে আছি মাম্‌লা

আর করব না তাই নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।

বিদ্যালয়টি বেশ পূর্ণ হয়ে এসেছে। ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে এবং হু হু করে সেটি বেড়ে ওঠবার মৎলব করচে। অনেকদিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয়ে এগই নি— ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই।

আজ বর্ষশেষ— কাল এখানে নববর্ষের উৎসব হবে। প্রার্থনা করি যে নববর্ষ কেবল পঞ্জিকার প্রথম পাতে দেখা না দিয়ে যেন জীবনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। আর কোনো সার্থকতা চাইনে। নূতন জীবন চাই। পুরাতনের যত ভয় লজ্জা দুঃখের জের যেন আর না টেনে আনতে হয়— একেবারে সব সাফ করে দিয়ে বড় রাস্তায় যেন বেরিয়ে পড়তে পারি। আর সমস্তেরই মৃত্যু আছে কেবল আবর্জ্জনারই কি মৃত্যু নেই নাকি?

নববর্ষ আপনার জন্য পরিপূর্ণ কল্যাণের ভার অঞ্চলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করে নিয়ে আসুক এই প্রার্থনা করি। অর্থাৎ যাই নিয়ে আসুক্ সুখই হউক দুঃখই হউক্ আপনি তাকে অপরাজিত চিত্তে গ্রহণ করবার শক্তি লাভ করুন।

আপনি আমার বইগুলি পাচ্চেন কিনা খবর দেন না কেন? প্রকাশকরা যদি ফাঁকি দেয় আমার ত জানবার কোনো উপায় নেই। গদ্যগ্রন্থাবলী সবগুলি এবং "শান্তিনিকেতন" পাচ্চেন ত? ইতি ৩১শে চৈত্র ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫

২৩ এপ্রিল ১৯০৯

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

রথীর পরীক্ষা নিশ্চয় এতদিনে হয়ে গেছে। তাকে য়ুরোপে যাবার পাথেয় গতকল্য পাঠিয়েছি। সে একবার ফ্রান্স ও জর্ম্মনিতে তার শিক্ষা সমাধা করে আসুক। বোধহয় এই বৎসরের শেষ ভাগে সে সশরীরে ফিরে আসবে।

সন্তোষ বেশ ভাল পাস করেই B. S. ডিগ্রি পেয়েছে। অর্থাৎ Bachelor of Science। ও সেখানে আরো দু বছর থেকে উপার্জ্জন করে কিছু মূলধন হাতে নিয়ে দেশে ফেরবার সঙ্কল্প করেছে।

আমাদের মেয়ে ইস্কুলের বেতন ও নিয়মাদি বালক বিদ্যালয়েরই সমান। যদি ইতিমধ্যে এখানে একবার আসেন তবে সমস্ত স্বচক্ষে দেখেশুনে তার পরে যথাবিহিত স্থির করবেন।

আপনাকে চিঠি লিখচি— কিন্তু তিনদিকে তিন জন লোক বসে। ওদিকে আজই লুপ মেলে বোলপুর যাত্রা করব তার সময় আসন্ন। আজকাল ভাবের ক্ষেত্র থেকে কাজের ক্ষেত্রে নেমে অবধি সময়ের অত্যন্ত টানাটানি— এ পর্য্যন্ত আপনাকে সুস্থভাবে এক লাইন লেখবার সময় পাই নি। আজ এখনি না লিখলে আর অবকাশ হবে না বলে কোনোমতে লিখে দিচ্চি। আশা করি হাতের অক্ষর ও ভাষা বুঝতে গোল হবে না—

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

প্রিয়বরেষু

আমি এখন পদ্মায়। শরীর মন কিছু ক্লান্ত হওয়াতে কাজের ভিড় হতে পদ্মাচরের নির্জনতার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলুম — এমন সময় অজিত কুর সাহেব উপলক্ষ্যে এখানে এসে জমেছেন — তার পরে কাল ভোরে ডাক্তার জগদীশ বোস হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছেন — ওদিকে প্রমথবাবু দূরে [illegible] চলেছে — পদ্মা এ কূল থেকে ও কূল পর্যন্ত তরঙ্গিত — মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে; পদ্মা যে শান্তি অসংখ্য জনতাকে সাক্ষী করে রেখে এমন জল দেখা যাচ্ছেনা। বোটের উপর ভেতরে

7

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

যদি গোল ঠেকে যখন দেখা হবে সমস্ত বোঝাপড়া করে নেওয়া যাবে। ইতি ১৩ই বৈশাখ ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

[২৫ জুলাই ১৯০৯]

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

প্রিয়বরেষু

আমি এখন পদ্মায়। শরীর মন কিছু ক্লান্ত হওয়াতে কাজের ছল করে পদ্মাচরের নির্জ্জনতার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলুম —এমন সময়ে অজিত জ্বর সারাবার উপলক্ষ্যে এখানে এসে জমেছেন— তার পরে কাল ভোরে ডাক্তার জগদীশ বোস হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছেন— ওদিকে প্রবল বেগে পূবে-বাতাস বইচে— পদ্মা এ কূল থেকে ও কূল পর্য্যন্ত তরঙ্গিত— মাঝে মাঝে বৃষ্টি বয়ে যাচ্চে ; পদ্মা যে শীঘ্র জল-স্থল-বাতাসের সঙ্গে সন্ধি করে নেবে এমন ভাব দেখা যাচ্চে না। নৌকার উপর ঢেউয়ের আঘাত চলচে বলে চিঠি লেখা শক্ত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যালয়ে ভিড় কিছু বেড়েছে। কিন্তু একটা নতুন দোতলা ঘর তৈরি হচ্চে, সেটা হলে তাতেই দু তলায় ২৫ জন ছাত্র ধরবে তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না।

১৮ টাকা বেতন অভিভাবকদের পক্ষে কিছু কঠিন তবু তৎসত্ত্বে এতেও আমাদের টানাটানি হয়। ছেলে যত বাড়চে মাষ্টারও বাড়চে— সুতরাং খরচও বাড়চে। কবে একে নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব জানি নে।

আপনাদের মেয়েটিকে কেন আশ্রমে দিয়ে গেলেন না? আমি প্রতীক্ষা করে ছিলুম। যদি মনের মধ্যে সঙ্কোচ বোধ করে থাকেন সেটা আপনার অন্যায় হয়েছে। এখনো চিন্তা করে দেখবার সময় আছে।

রথীর দেশে ফেরবার সময় আসন্ন হয়েছে— হয় ত আর এক মাস পরেই ফিরবে— তার পরে তার কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সন্তোষও আগামী সেপ্টেম্বরে ফিরে আসবে। ইতি রবিবার [৯ শ্রাবণ ১৩১৬]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭
৯ আগস্ট ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নি[বেদন]

এ [খানে] পদ্মার আতিথ্য ভো[গের বাসনা] শ্রাবণের বর্ষাতেও [আমার মনকে] নিরস্ত করিতে পারিতেছে [না।] মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে[র দিকে]মন টানে— কিন্তু এবার প[ণ] করিয়া আসিয়াছি— গোর[া] গল্পটা শেষ করিয়া তবে জলগ্রহণ— গ্রহণ বলা চলে [না] জল ত্যাগ করিব। তাই ঘা[ড়] গুঁজিয়া গোরা লিখি[তেছি-] [শে]ষের দিকে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। [বি]দ্যালয় সম্বন্ধে আপনার [যাহা] কিছু বলিবার আছে [তাহা] আপনি অসঙ্কোচে [বলিবেন।] জনশ্রুতি ঠাকুরাণীর [মুখে য]াহা শুনিতে পান [তাহা] আমার শ্রুতিগোচর [করি]বেন। অপরে আমাদিগকে কিভাবে দেখিতেছে তাহা [জানা] ভাল— যদিও সকল [সম]য় তাহাতে উপকার [হয় না,] তথাপি Knowledge is power।

আজ রথীর চিঠি প[াইলাম] সে এখন জর্ম্মনিতে আ[ছে।] দেশে ফিরিবার পা[থেয়র জন্য] টেলিগ্রাফ করিয়াছিল [। তাহা] পাঠান হইয়াছে— [হয়ত] সে আর দুই কিম্বা অ[ার এক] সপ্তাহ পরেই ফিরিতে পারে। আশা করি সকল ক'টিকে লইয়া ভাল আছেন। ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠা[কুর]

৫৮

২০ আগষ্ট ১৯০৯

ওঁ [কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

জনশ্রুতিঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর বোধ করি কিছু প্রবল এই জন্যই ছোটকথা বড় হইয়া উঠে। আসল কথা, যে ব্যবস্থা আছে তাহার চেয়ে এত ভাল করা যাইতে পারে যে প্রিন্স অফ ওয়েলসের ছেলেরাও ওখানে কষ্ট বোধ করে না— কিন্তু তাহাতে অর্থের প্রয়োজন— এবং অমন উঁচুদরের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় খুলি নাই। যাহারা সচরাচর মেসে খাইয়া কষ্টে পড়াশুনা চালায় তাহারাই আমার এখানে পড়িতে আসে— অতএব তাহাদেরই উপযোগী বেতন ও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এমন জায়গায় সুখী লোকের ছেলের স্থান নাই। আপনি ত জানেন রথীও এখানকার মোটা রুটি খাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছে। তখনকার আহারাদির চেয়ে এখনকার বন্দোবস্ত ভাল বই মন্দ নয়। মেয়ে ইস্কুলে মীরাও সকলের সঙ্গে একত্রে খায় ও থাকে। নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাহিরের লোকের কোনো পার্থক্য রাখি নাই। ইহা নিশ্চয় জানিবেন আমার সামর্থ্য থাকিলেও ছাত্রদিগকে বর্ত্তমানের অপেক্ষা অধিক আরামে রাখিবার চেষ্টা করিতাম না। আদুরে ছেলেদের আদর ঝাড়াইয়া দেওয়াই তাহাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় শিক্ষা। ইহাতে যে অভিভাবক কষ্ট [বোধ] করেন তাঁহারা নিজের কোলের উপরে বসাইয়াই ছেলের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন

তাহাতে কেহ বাধা দিবে না।

রথীকে বোম্বাই ঠিকানায় বেলা পত্র লিখিতেছে। তাহাতে আপনার খবর দিবার কথা লিখিতে বলিয়া দিলাম। যদি সে চিঠি তাহার হস্তগত হয় তবে আপনিও যথাসময়ে তাহার কাছ হইতে সংবাদ পাইবেন।

কলিকাতায় অহোরাত্র লোকজনের ভীড়ে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি সেইজন্য আপনাকে চিঠি লিখিতে দেরি হইয়া গেল। এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচি। ইতি ৪ঠা ভাদ্র ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

১৮ অক্টোবর ১৯০৯

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

এবার কিছু বৈষয়িক ব্যস্ততার মধ্যে পড়ে গেছি। এইটে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই এবারকার মত বিষয়ব্যাপার থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পেতে পারব এই রকম আশা হচ্চে।

আপনার দক্ষিণ হস্তের রাখী আপনার দাক্ষিণ্য বহন করে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে আমি সাদরে তা গ্রহণ করলুম।

আমার গ্রন্থাবলী এবং শান্তিনিকেতন বোধহয় সবই

হস্তগত হয়েছে। ইতিমধ্যে চয়নিকা প্রভৃতি যে দুইএকখানা বই বেরচ্চে— প্রকাশকেরা তা আমাকে উপহার স্বরূপে দিতে কৃপণতা করচেন। সেইজন্যে আমিও কাউকে দিতে পারচিনে।

রথীকে শিলাইদহে রেখে এসেছি। সেইখানেই তার কর্ম্মের রথ তাকে চালাতে হবে।

ছুটির সময়ে আস্‌চেন না বুঝি? সবসুদ্ধ আছেন কেমন? ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

২ ডিসেম্বর ১৯০৯

ওঁ

[জোড়াসাঁকো
কলিকাতা]

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার চিঠিখানি পেয়ে উদ্বিগ্ন হলুম। আপনি যদি মেয়ো হাঁসপাতালে থাকতে ইচ্ছা করেন তবে এইসঙ্গে সেখানকার অধ্যক্ষ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্র মৈত্রকে যে পত্রখানি দিলুম সেটি ব্যবহার করে দেখ্‌বেন— আমার বিশ্বাস সেখানে তাঁর কাছে বিশেষ যত্ন পেতে পারবেন।

রথীকে নিয়ে আমি এতদিন জলপথে ঘুরছিলুম— দিন তিনেক হল ফিরেছি, রথী শিলাইদহে আছে। আমি আবার কাল লুপ মেলে বোলপুরে যাচ্চি।

আপনি হতাশ হয়ে নিজের মনকে পীড়িত করবেন না, তাতে আপনার আরোগ্যের ব্যাঘাত ঘট্‌বে। আপনি নীরোগ হয়েছেন এই সংবাদটি পেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। ইতি ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

[৮ ? ফেব্রুয়ারি ১৯১০]

ওঁ [কলিকাতা]

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আমি আজ কয়দিন ধরে আপনাকে চিঠি লিখতে বসচি কিন্তু কোনোমতেই সময় পাচ্চি নে। কলকাতায় আমি কি অবস্থায় থাকি জান্‌লে আপনি আমাকে দয়া করতেন। আজই বোলপুরে পালাচ্চি।

রথীর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল কিন্তু ব্যবস্থা যা কিছু হয়েছে সে জন্যে আমাকে দায়ী করলে চল্‌বে না। আমি এসকল বিষয়ে নিতান্ত অক্ষম অনভিজ্ঞ বলে সমস্ত ভার অন্যদের উপর চাপিয়ে চুপ করে ছিলুম— কেবল টাকাটা আমি দিয়েছি মাত্র এবং ছেলেটি আমার। অপরাধ অনেক হয়েছে এবং সে সমস্তই আমাকেই গ্রহণ করতে হ্‌চ্চে কিন্তু আপনার কাছে আমি বেকসুর খালাস প্রত্যাশা করি।

আপনি যে ছেলেটির কথা লিখেছেন তাকে নিতে কোনো

আপত্তি নেই— কেবল সম্প্রতি একেবারেই স্থানাভাব। গ্রীষ্মাবকাশে নূতন ঘর তৈরি হলে তার পরে আষাঢ় মাসে নূতন ছেলে নেওয়া সম্ভব হবে— তৎপূর্ব্বে চল্‌বে না।

ছেলেদের মধ্যে যাতে কোনো রকম ইন্দ্রিয়শৈথিল্য না ঘটে সেজন্যে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখা হয়— কিন্তু ১৩০ জন ছেলের মধ্যে বাংলাদেশে এই উপসর্গ সম্পূর্ণ ঠেকানো গেছে একথা আমার নিজেরই প্রত্যয় হয় না। আমি দেখ্‌তে পাই আমাদের দেশ এ সম্বন্ধে একেবারে কলুষপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন। ঘরে ঘরে এই ব্যাধি। যে সব ছেলে এখানে আসে তারা এই উপসর্গ সঙ্গে করে নিশ্চয়ই আনে— তারপরে আমরা উপদেশ দিয়ে পাহারা দিয়ে যতটা সম্ভব এটাকে দমন করে রাখি— কিন্তু কৃতকার্য্য কি পরিমাণে হই তা নিশ্চয়রূপে জানাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়— তবে শিক্ষকদের দ্বারা কোনো বিকার ঘটে না এ কথা বোধহয় জোর করে বল্‌তে পারি।

আপনি ভাল আছেন ত? আমার শরীরটা ভালো নেই। ইতি মঙ্গলবার [২৬? মাঘ ১৩১৬]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

১৩ এপ্রিল [১৯১০]

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। কয়দিন বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। রথী সপরিজনে এখানে আসিয়াছে। সন্তোষ পাঁচটি গাভী সংগ্রহ করিয়া এখানে গোষ্ঠলীলা আরম্ভ করিয়াছে।

সুবোধ আজকালের মধ্যে দেশে ফিরিবে— সম্ভবত এখানে একবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে।

আশাকরি সকলে মিলিয়া ভাল আছেন। ইতি ৩রা বৈশাখ [১৩১৭]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

২৯ আগষ্ট ১৯১০

ওঁ জোড়াসাঁকো

সাদর নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

কয়দিন হইল কলিকাতায় আসিয়া আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু কলিকাতায় আমি অহরহ এমন জনতার মধ্যে থাকি যে কোনো কাজ বা অকাজ করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তাই উত্তর দিতে পারি নাই।

হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অবস্থা খুব ভাল বলিয়াই জানি। সুরেন তাহার সেক্রেটারি। এ কোম্পানি সম্বন্ধে আমার মনে ত কোনো আশঙ্কা নাই। আপনি সুরেনকে আপনার পরিচয় দিয়া একখানা চিঠি লিখিলেই সকল কথা অবগত হইবেন।

রথীর সঙ্গে এতদিন বোটে করিয়া জলপথে বেড়াইতেছিলাম। আবার তাহাকে লইয়া বোলপুরে চলিলাম। সেখানে দুই চারিদিন থাকিয়া সম্ভবত সে শিলাইদহে ফিরিবে। ইতি ১৩ই ভাদ্র ১৩১৭

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

১৮ অক্টোবর ১৯১০

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণ

বিজয়ার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

সম্প্রতি শিলাইদহে রথীদের আতিথ্য অবলম্বন করিয়াছি। ছুটিটা এখানেই কাটাইব মনে করিতেছি।

রথীরা এইখানে ঘরকন্না পাতিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছে—এখন হইতে এইখানেই তাহার স্থিতি। সন্তোষ বোলপুরে গোষ্ঠলীলায় নিযুক্ত আছে। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫

২৫ অক্টোবর ১৯১০

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

এ জগতে যদি অমোঘ নিয়ম না থাকিত তবে ত্রাহি ত্রাহি করিতে হইত। নিয়ম ব্যতীত প্রকাশ হইতেই পারে না। খেলা করিতে গেলেও খেলার নিয়ম মানিতে হয় নতুবা খেলার আমোদই হয় না, তাহা উন্মত্ততা হয় মাত্র। এই নিয়মই যখন তাঁহার ইচ্ছা— তখন আমাদের ইচ্ছাকে এই নিয়মের অনুগত না করিলে দুঃখই পাইতে হইবে— যখন বিশ্বের ইচ্ছাকে তাঁহার নিয়ম জানিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লইব— তখনই তাঁহার আনন্দের সহিত আমার আনন্দের মিলন হইবে। যতদিন বিদ্রোহ করিব, মানিতে চাহিব না, ততদিন পরাভূত হইতে হইবে।

বিধাতার রাজ্যে যেখানে নিয়ম সেখানে ব্যত্যয় নাই এই কথা যখন মানুষ জানে তখনি সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ— তেমন প্রসাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। তাঁহার ইচ্ছা উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছা নহে এই জন্যেই বিশ্বে তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা নিয়মরূপে দেখিতে পাই— এই কারণেই তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা জানিতে পারি— এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত যোগ দিয়া আমরা সার্থকতা লাভ করিতে পারি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্তুরাজ্যে তাঁহার ইচ্ছাকে আমরা নিয়মরূপে দেখি— কিন্তু কেবলি যে জগতে নিয়মকে দেখি তাহার বেশি কিছুই দেখি না তাহা নহে। পয়ারে চোদ্দ অক্ষরের নড়চড় হইবার জো নাই— তাহার ভাষা ছন্দ ও অর্থের সুবিহিত সুসঙ্গতি আছে— কিন্তু আমরা যদি পয়ারে কেবল চোদ্দ অক্ষরই দেখিতাম অথবা কেবলই প্রত্যেক শব্দের ও পদের সহিত একটা যুক্তিসঙ্গত অর্থ আছে ইহাই জানিতাম তবে তাহাকে কাব্যই বলিতাম না। কিন্তু কাব্যের সমস্ত অটল অমোঘ স্খলনহীন নিয়মের ভিতর দিয়াই তাহার গভীরতম সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত, কাব্যকর্ত্তার অন্তরতম আনন্দ ও প্রেম প্রকাশ পাইতেছে— সেইজন্যই তাহা কাব্য। আলঙ্কারিক তাহার মধ্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম দেখিয়া বাহবা দেয়— বৈয়াকরণ তাহার মধ্যে ব্যাকরণের সূত্র ঠিকমত বজায় আছে দেখিয়া পুলকিত হয়, অভিধানবাগীশ তাহার শব্দ ও অর্থের সঙ্গতি দেখিয়া খুসি হইয়া নস্য লইতে থাকে— কিন্তু সমস্ত নিয়ম ও সঙ্গতির ভিতর হইতে নিয়ম ও সঙ্গতির অতীত আনন্দ তাহারাই দেখে যাহারা রসিক— তাহারা ইহার মধ্যে কবির নিয়মনৈপুণ্য দেখে না, কবির আনন্দউচ্ছ্বাস দেখে। তাহারা যখন জগৎকে দেখে তখন বৈজ্ঞানিকের মত কেবল সত্যকেই দেখে না— দার্শনিকের মত চিত্তকেও দেখে, এবং কবির মত আনন্দকে দেখে— কারণ তাহার নিজের মধ্যে সত্য আছে, চিত্ত আছে, আনন্দ আছে— তাহার মধ্যে কার্য্যকারণ শৃঙ্খল-সঙ্গত নিয়মবন্ধনও আছে, চেতনাময় গতিশক্তিও আছে এবং

আনন্দময় মুক্তির অনুভূতিও আছে— জগতের মধ্যে যখন সে এই তিনের যোগ দেখে তখনি সচ্চিদানন্দকে দেখে, এবং তখনি তাহার দেখা সম্পূর্ণ হয়। নতুবা যখন একটাকে দেখে অন্যটাকে দেখে না তখনই সে বিদ্রোহ করে অহঙ্কার করে, তর্ক করিতে থাকে এবং নীরস হইয়া মরে। আনন্দ আছে অতএব নিয়ম নাই এ কথা যেমন মিথ্যা, নিয়ম আছে অতএব আনন্দ নাই, এ কথাও তেমনি মিথ্যা। আনন্দ হইতেই নিয়ম হইয়াছে নতুবা নিয়ম আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিত, নিয়মের মধ্য দিয়াই আনন্দ প্রকাশ পায় নতুবা জগতে কোথাও আমরা সৌন্দর্য্য দেখিতাম না, প্রেম উপলব্ধি করিতাম না। ইতি ৮ই কার্ত্তিক ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৬

•১৫ এপ্রিল [১৯১১]

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

বিদ্যালয়ে আমার জন্মোৎসবে আপনি আস্‌বেন শুনে বড় আনন্দ পেয়েছি। এই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের সঙ্গে আপনার জীবনের একটি গভীর মঙ্গলসম্বন্ধ যে চিরন্তন হয়ে উঠেছে এই কথাটির পরিচয় আমার কাছে বহুমূল্য বলে জানবেন। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে আপনি নিজের যেন বিশেষ

ক্ষতি করবেন না— আপনার ইচ্ছাকেই আপনার উপস্থিতি বলে বরণ করে নেব। ইতি ২রা বৈশাখ [১৩১৮]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৭

৮ জুন ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ—

ছেলেরা আপনার উপর রাগ করে নাই। প্রথমত রথী ত রাগ করিতেই পারে না— কারণ, কার্য্যবশত সেও বোলপুরে আসিতে পারে নাই— দ্বিতীয়ত সন্তোষের রাগী স্বভাবই নয়। আপনি যদি ক্ষতিস্বীকার করিয়া আসিতেন তাহা হইলে আমি নিতান্তই দুঃখিত হইতাম। আমার প্রতি আপনার অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যের প্রয়োজন দেখি না।

আমাদের প্রত্যেকের ভীরুতা সম্মিলিত হইয়াই ত সমাজভয় জিনিষটা জুজুর মত জাগিয়া উঠিয়াছে। সমাজের অন্যায় অত্যাচার স্বীকার করিব না ইহাতে যত দুঃখই পাই না কেন, একথা জোর করিয়া বলিতে পারিলে তবেই একদিন সমাজ সীধা হইতে পারিবে— নিজের বুকের রক্ত দিয়া যতই ইহার খোরাক জোগাইবেন বুকের রক্তের প্রতি ইহার লোভ ও দাবী

ততই আরো বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। বক্তৃতা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার যথার্থ প্রতিকার হয় না— কারণ, যে সকল প্রথা সমাজের লোককে বেদনা দিতেছে তাহারা যে বেদনাকর ইহা বুঝাইবার জন্য কোনো বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সমাজের লোক যেদিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমাজের মুখে তুড়ি মারিয়া বলিতে পারিবে কেয়ার করি না তোমাকে— তুমি যা খুসি তাই কর— তখনই সমাজ ভালমানুষটির মত তাড়াতাড়ি রফানিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।

আমি এখন শিলাইদহে ছুটিটা রথীর আতিথ্যে যাপন করিতেছি। এখানে আমার ছোট কন্যা এবং জামাতাও আছে। সকলে মিলিয়া বেশ আনন্দে কাজকর্ম্ম এবং চাষবাস লইয়া আছে। ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮

২২ জুলাই ১৯১১

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

পাঁচ ছয়দিন হইল বিশেষ চেষ্টায় বিদ্যালয়ের জন্য তিন হাজার টাকা শতকরা বারো টাকা সুদে ধার লইয়াছি, কি উপায়ে শোধ করিতে হইবে এখন হইতে তাহা চিন্তার বিষয়।

প্রাচীন দেনার বোঝা যাহা কাঁধে চড়িয়া বসিয়া আছে তাহা সিন্ধ্‌বাদের সেই স্কন্ধারূঢ় ব্যক্তিটির মত, তাহার নড়িবার কোনো তাগিদ্ নাই— প্রতি মাসে তাহার সুদ জোগাইতেছি। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন চপলা লক্ষ্মী আমার প্রতি নিগ্রহ সম্বন্ধে কিরূপ অচপল— অনেকদিন হইতেই আমার প্রতি তাঁহার ব্যবহার সমভাবেই আছে। আমার হাতে দেনা কেবলি বাড়িয়া চলিয়াছিল দেখিয়া বিষয়ের ভার সম্পূর্ণ রথীর হাতে দিয়া আমি সংসারের রণে হার মানিয়া ভঙ্গ দিয়াছি। ঋণ দিয়াই সে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে পরিশোধ দিয়া যদি শেষ করিতে পারে তবেই সে আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান।

উচ্চ সুদে ধার করিয়া দেওয়া ছাড়া যদি আর কোনো রাস্তা থাকিত তবে নিশ্চয় জানিবেন আমি আপনাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া দিতাম। কিন্তু যে নিজে ডুবিয়াছে সে অন্যকে কূলে টানিয়া তুলিবে কি করিয়া ?

সমাজ দেবতার কাছে বলি দিবার প্রথা আরো কতদিন চলিবে জানি না। রক্ত কি আর কিছু বাকি আছে ? দুঃখ ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে অথচ শিক্ষা হইতেছে না—সমাজ কি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত না গিয়া কোনোমতেই ক্ষান্ত হইবে না ? অমঙ্গলকে স্বীকার করিতেছি প্রত্যেকেই অথচ প্রতিকার করিতেছি না কেহই, এমন সাংঘাতিক জড়ত্ব পৃথিবীর আর কোনো দেশে কি দেখা গিয়াছে ? যে সমাজ সমাজের আশ্রিতবর্গকে, সর্ব্বপ্রকারে পীড়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না সেই সমাজকে মানিয়া চলাই অপরাধ। দুর্ব্বল বলিয়াই দুঃখের

ভয়ে মানি, মানি বলিয়াই দুঃখ পাই— এই চক্র এমনি করিয়াই ফিরিতেছে। ইতি ৬ই শ্রাবণ ১৩১৮

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১১

ওঁ কলিকাতা

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আমাদের য়ুরোপ যাওয়া স্থির হয়ে গেছে। আগামী ১৬ই অক্টোবরে জাহাজ বম্বাই ছাড়বে— তার ৩।৪ দিন আগে আমাদের রওনা হতে হবে। এরই মধ্যে সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হবে। মাঝখানে এমন একদিনো সময় পাব না যখন ফাঁকতালে আর একটা ছোটোখাটো ভ্রমণ সেরে নেওয়া যেতে পারে। যদি B. N. R. দিয়ে যাত্রা কর্ত্তুম তাহলেও একবার উঁকি মেরে আসা অসম্ভব হত না— কিন্তু এলাহাবাদ হয়ে যাবার কথা হচ্চে— এলাহাবাদে সত্য আছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবার প্রয়োজন আছে। কাজেই আপনার সাদর নিমন্ত্রণটি মনের মধ্যেই তোলা রইল সেটিকে কাজে লাগাতে পারা গেল না। এবারকার মত সমুদ্রপারেই চল্লুম— তার পরে ফিরে এসে যদি ভ্রমণের ঝোঁকটা না মিটে যায় তাহলে ভারতবর্ষেই কিছু ঘোরা ফেরা করে নেব— আপনার নিমন্ত্রণটি যদি ততদিন পর্য্যন্ত কায়েম থাকে তাহলে

সেটি যথারীতি আদায় করে নেব। মনে ত করচি এখন থেকে খাঁচায় বসৎ তুলে দেওয়া গেল— বাকি ক'টা দিন উড়ে উড়েই কাটিয়ে দেব।

আপনি বোধহয় জানেন না রথী এবং বৌমা আমার সঙ্গে বিলাত যাচ্চেন। রথী মাস তিনচার থেকে চলে আস্‌বেন— আমরা হয়ত বছর খানেক অথবা ভাল লাগ্‌লে তার চেয়ে বেশি দিনও থাকৃতে পারি— অতএব দীর্ঘকালের জন্য আপনাদের নমস্কার করে পাড়ি দিতে চল্লুম। ইতি ১৩ই আশ্বিন ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭০

১৯ নভেম্বর ১৯১৩

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

অপমান ত অনেক সহিয়াছি— বোধ করি সম্মানও সহ্য করিতে পারিব। আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। যিনি মান দিয়াছেন তিনিই আমার মান রক্ষা করিবেন একেবারে কাৎ হইয়া পড়িতে দিবেন না। ইতি ৩ অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭১

১৫ ডিসেম্বর ১৯১৩

কলিকাতা

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

সত্য বলিয়াছিলাম বলিয়া দেশের অনেক লোক রাগ করিয়া আমাকে গালি দিতেছেন। ইঁহাদের নিকট হইতে এই অসম্মানই আমি ভূষণ বলিয়া এতদিন গলায় ধরিয়াছি আজও ইহা বহন করিব— অতএব এ লইয়া আপনি লেশমাত্র দুঃখবোধ করিবেননা।

অসম্মানের চেয়ে সম্মানে আমাকে অনেক বেশি ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে সেজন্যে চিঠি ছোট করিতে হইল।

ইতি ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২

১৯ এপ্রিল ১৯১৪

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

সাদরনমস্কার সম্ভাষণ

আপনার শরীর অনেকটা সারিয়াছে শুনিয়া খুসি হইলাম।

রথী কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছে।

অ্যালোপ্যাথি ব্যবস্থায় যখন উপকার পাইয়াছেন তখন আর চিকিৎসার বদল করিবেন না। যদি বোঝেন জড় মরিতেছে না তখন চেষ্টা দেখিবেন।

সর্ব্বপ্রকারে আপনার কল্যাণ হউক নববর্ষারম্ভে এই আমি কামনা করি। ইতি ৬ই বৈশাখ ১৩২১

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩

১৩ জানুয়ারি ১৯১৬

ওঁ

বোলপুর

প্রীতিনমস্কারনিবেদন

অনেককাল পরে আপনার চিঠিখানি পাইয়া বড় আনন্দ হইল।

বন্দেমাতরমের নামে দেশে যে একটা দুষ্কৃতির ঢেউ উঠিয়াছে সেটার ত একটা Psychology আছে— ঘরে বাইরে গল্পে তারই আলোচনা চলিতেছে। আমি ইচ্ছা করিয়া আগে হইতে ভাবিয়া একাজে প্রবৃত্ত হই নাই— আপনা-আপনি কেমন করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিবেন।

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যে মাঘের মাঝামাঝি একটা অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছে— তাই লইয়া বিষম ব্যস্ত আছি। একবার ধাঁ করিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া যাইবেন না কি? ইতি ২৮ পৌষ ১৩২২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬

ওঁ শিলাইদা

প্রীতিনমস্কার নিবেদন—

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটা এতই সহজ যে ঘটা ক'রে তার অর্থ বোঝাতে সঙ্কোচ বোধ হয়।

জগৎটার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে দেখা যায় যে যদি চ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্চে তবু সে জীর্ণ নয়— আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্ম্মল, ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান— অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখ্‌তে গেলে দেখি ফুল ঝরচে, পাতা শুকচ্চে, ডাল মরচে। জরা মৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেচে, তবুও বিশ্বের চির-নবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরামৃত্যু Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবনযৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্ত্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্ত্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে মৃত্যুকে ধরে রাখ্‌তে গেলেই দেখি সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তাহলে অনাদি-কালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত— এর উপরে যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধসে যেত।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে

চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্চে মানুষ প্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চল্‌চে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করচে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।

ফাল্গুনীর যুবকের দল প্রাণের উদ্দাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্চে। সর্দ্দার বল্‌চে, ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করিনে— আচ্ছা দেখ্, যদি তাকে ধরতে পারিস ত ধর্। প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে চিরন্তন করে দেখ্‌তে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাক্‌লে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ ত মারা যেত। ইতি ২০ মাঘ ১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫

[ফেব্রুয়ারি / মার্চ ১৯১৬]

ওঁ

প্রীতিনমস্কার

আমি আপনার উপর লেশমাত্র বিরক্ত হই নাই। আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বলে হয়ত আমার অজ্ঞাতসারে আমার কলমের মুখে সেই ক্লান্তির একটা গ্লানি প্রকাশ হয়ে থাকবে

কিন্তু আপনার প্রতি রাগ করবার কোনো কারণ ঘটেনি এবং আমি স্বভাবতই যে রাগী তাও নয়।

ফাল্গুনীতে সর্দ্দারের কাজটা ভিতরে থেকে গোপন— যারা তার দ্বারা চালিত হয় তাদের মধ্যেই সর্দ্দারের প্রকাশ— এইজন্যে সর্দ্দারকে আমি অধিকমাত্রায় নাড়াচাড়া করি নি।

[মাঘ/ফাল্গুন ১৩২২]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬

[এপ্রিল ? ১৯১৭]

ওঁ

কলিকাতা

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আমি দেশে ফিরে এসে রথীর সম্বলপুরপ্রয়াণের বৃত্তান্ত প্রথম শুনলুম। আপনি দিনরাত্রি কি রকম অক্লান্ত যত্নে তার সেবা করেচেন এইটেই হচ্চে তার একমাত্র ধুয়ো। রথী যে পথের থেকে ব্যামো নিয়ে আপনার ঘরে গিয়ে নাম্‌লেন এটা কেবলমাত্র আপনার স্নেহের পরীক্ষার জন্যে দেবতার চক্রান্ত। এই পরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ হয়েচেন— তবে কিসের জন্যে এত কুণ্ঠিত হচ্চেন ? আপনার ঘরে বিলাস-উপকরণের যদি অভাব থাকে তবে সে জন্যে দায়ী হচ্চেন স্বয়ং লক্ষ্মী— কিন্তু হৃদয়-ভাণ্ডারের যে পরিপূর্ণতা প্রকাশ করেচেন সে ত সম্পূর্ণ আপনার নিজেরই। সংসারে এই জিনিসটাই সব চেয়ে বিরল এবং এরই মূল্য সব চেয়ে বেশি।

একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় সমুদ্রতীরে ঘুরপাক খাইয়ে আবার আমাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। বিদেশে অনেক জয়মাল্য বরমাল্য লাভ করেচি— এখন স্বদেশে সেইগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবার পালা চলবে।

আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে? নববর্ষ আপনার গৃহকে কল্যাণপূর্ণ করুক। ইতি [চৈত্র ? ১৩২৩]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭

৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭

ওঁ

সাদরনমস্কার নিবেদন

"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" বক্তৃতাটি যাতে বহুসংখ্যক পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছয় এই মনে করেই প্রবাসী ও ভারতীতে ছাপিয়েচি। সবুজপত্রের পাঠক অল্প এবং এবারে অনেক বিলম্বে ওটা ছাপা হওয়াতে সবুজপত্র বেরবার আগেই অন্য কাগজে ছাপ্‌তে হল। ঐ বক্তৃতাটি যদি কেবলমাত্র সাহিত্যের সামগ্রী হত তাহলে কথাই ছিল না। যা হোক্ যাতে ওটা আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যস্ত আছি। ইতি ১৮ই ভাদ্র ১৩২৪

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮

১৮ মে ১৯২২

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার আত্মজীবনীর একটি ছোট অধ্যায় পড়ে আমার খুব ভাল লাগ্‌ল। সন্তোষকে দেব, ওদের শান্তিনিকেতনে বের করবে। এখানে আমাদের কাজ হঠাৎ নানা শাখাপ্রশাখায় অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েচে। তাই নিয়ে আমাদের নিরন্তর চিন্তা ও চেষ্টা করতে হচ্চে অবকাশমাত্র নেই। দুই একজন উৎসাহী অথচ পাকা লোক যদি পাওয়া যেত তাহলে অনেকটা ভার লাঘব হত। আপনি যে আর এক স্রোতে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভেসে গিয়েচেন, এখন আপনাকে আর ফিরিয়ে আনবার পথ নেই— নইলে আপনাকে ছাড়তুম না। আমার এখানে সমুদ্রপার থেকে কেউ কেউ আসচেন তাঁদের কাছ থেকে অনেক কাজ পাওয়া যাচ্চে। আপনি যদি কোন এক অবকাশে একবার এসে দেখে যান তাহলে অনেক নতুন জিনিষ দেখ্‌তে পাবেন এ জায়গা চিন্‌তে পারবেন না। ইতি ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Hawarden
Race Course
Coimbatore

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বকনিবেদন

আপনি এতবড় অদ্ভুত ভুল করলেন কি করে? আপনার সঙ্গে আমার বর্ণিত হেডমাস্টারের কোন্‌খানে মেলে? আপনি চলে যাবার পরে হিতৈষীবর্গের তাড়নায় আমি বীরভূমের কোনও জেলা ইস্কুল থেকে একটি ভদ্রলোককে তার হেডমাস্টারি সমেত সমূলে উৎপাটিত করে আমাদের বিদ্যালয়ে রোপণ করেছিলেম। কিন্তু মাটির গুণে এখানে তাঁর শিকড় বস্‌ল না। আপনাকে ফিরে পেলে ত আমরা হরির লুট দিই— কিন্তু সেই আমাদের ভূতপূর্ব্ব হেডমাস্টারটিকে? নৈব নৈবচ। দেশে দেশে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চি। এখান থেকে সিংহলে যাবার কথা আছে। বাঙালী বিজয়সিংহ এককালে সেখানে জয় করতে গিয়েছিলেন, আমি যাচ্চি ভিক্ষা করতে। ফিরব ডিসেম্বরে। ইতি ৩ অক্টোবর ১৯২২ [১৬ আশ্বিন ১৩২৯]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ এপ্রিল ১৯২৩

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বকনিবেদন—

আমাদের বাড়িতে আমরা একরকম লম্বাগোছের কাপড় ব্যবহার করে থাকি, সেই বেশ আপনি যদি পছন্দ করেন তবে কেন গ্রহণ করবেন না তার কারণ বুঝিনে। তার পরিমাণের প্রাচুর্য্য দেখে কেউ কেউ ভয় পান, কিন্তু প্রাচ্যবেশের ঔদার্য্যই ত সেই প্রাচুর্য্য নিয়ে। কিছু বদল সদল করে নিতে পারেন। আমার নিজের জিনিষপত্র কোথায় কি আছে তার ঠিকানা জানিনে— একটা নমুনা পাঠাবার চেষ্টায় রইলুম। নববর্ষের সাদর নমস্কার। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ মে ১৯২৩

ওঁ শিলং আসাম

সাদর নমস্কার নিবেদন—

আপনাকে চিঠি লেখার পরদিনই শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসেচি। তার উপরে আমার একমাত্র ভৃত্য ছুটি নিয়ে তার জন্মস্থানে চলে গেছে। তাই আপনাকে কাপড় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারিনি। কোথায় আমার সম্পত্তির কোন্ অংশ

আছে আমি নিজে জানিনে। অতএব বর্ষার সময়ে শান্তি-নিকেতনে ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে কাপড় পাঠাবার সুবিধা করতে পারব না। আশ্রমে ফিরে গেলে একবার মনে করিয়ে দিতে ভুলবেন না। অত্যন্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েচি। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

নভেম্বর ১৯২৩

ওঁ

পোরবন্দর

প্রীতিনমস্কার নিবেদন—

নানাস্থানে নিয়ত ঘুরে বেড়াতে হচ্চে। অনেকদিনের জমা চিঠি হঠাৎ পথের মধ্যে কোনো এক জায়গায় পাই— জবাব দেবার সময় থাকে না। মনও অস্থির থাকে— শান্ত হয়ে বসে লিখ্‌তে পারিনে। এ কাজটা আমার নয়, অথচ আমাদের আর কারো দ্বারাও এটা সম্পন্ন হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এইজন্যে ভিক্ষাবৃত্তির ঘূর্ণি হাওয়ায় আমাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরপাক খাইয়ে বেড়াচ্চে। এর একটা সুবিধা হচ্চে এই যে, বিশ্বভারতীর অন্তরের কথাটা ভারতের নানা প্রদেশে বল্‌বার সুযোগ পাচ্চি। এদিককার মানুষেরা সাদাসিধে, বড় আইডিয়াকে তারা শ্রদ্ধা করে, আমার উপরেও তাদের অশ্রদ্ধা নেই, তার প্রধান কারণ, বাংলাদেশের লোকের মত তারা

আমাকে এত নিকটে থেকে এত অধিক করে জানবার অবকাশ পায় নি। তার পরে আবার শুনেচে আমি নোবেল প্রাইজ পেয়েচি, মনে ভাবে সত্যিই বুঝি বা মানুষটা কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা কিছু হবে। সেইজন্যে মন পরিষ্কার করে কথাগুলো শোনে, কাজেই বুঝতে তাদের বিশেষ বাধে না।

এবার আপনি যখন আশ্রমে ছিলেন, আমার সঙ্গে স্থির হয়ে বসে কথা ক'বার সুযোগ পান নি। আপনি যদি কোনো সঙ্কোচ না করে ঘরের মধ্যে ঢুকে দাবী করতেন তাহলে অনায়াসে আলাপ হতে পারত। সাধারণত আমার সময় অল্প বটে, কিন্তু মোটের উপর আমাদের সময় জিনিষটা স্থিতিস্থাপক। টান দিতে পারলে খানিকটা বেড়ে যায়— যদি ভরসা করে টান দিতেন তাহলে সময়ের নিতান্ত অভাব হ'ত না। আসলে, আমি কাজে যে খুব বেশি ব্যস্ত তা নয় কিন্তু আমার মন আজকাল নিয়তই ক্লান্ত থাকে, এইজন্যে যতটা পারি জগৎ-সংসারটাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলি— কিন্তু জগৎসংসারের স্বভাব এই যে, সে চেপে এসে পড়ে। আপনি আমাকে যখন ছুটি দিতে চেয়েছিলেন তখন আর সবাই যে ছুটি দিয়েছিল তা নয়— সুতরাং আপনিই বঞ্চিত হয়েচেন আমি বিশেষ নিষ্কৃতি পাইনি।

সম্প্রতি রাজবাড়িতে আছি, রাজদরবারে চা খেতে যেতে হবে। রথ এসে দ্বারে প্রস্তুত। অতএব নমস্কার। [অগ্রহায়ণ ১৩৩০]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ মে ১৯২৫

ওঁ　　　　　　　　শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

আপনাদের ওখানে যাঁরা যাঁরা আমার জন্মদিনে আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সকলকে আমার সাদর অভিবাদন জানাবেন।

পুরাণে যে ইন্দ্র মন্দর পর্ব্বতের ডানা কেটে তাকে অচল করে দিয়েছিলেন বর্ত্তমান যুগে আমার প্রতি তিনি হস্তক্ষেপ করেচেন। আমি আমার এই ঈজিচেয়ারের অস্তশিখর অবলম্বন করে আছি— এই নিশ্চলতার রাত্রি অবসান হোক্ তারপরে আপনাদের দিগন্তে একবার আহ্বান করে দেখবেন। ইচ্ছা থাকলে রাস্তা পাওয়া যায় কথাটা সত্য, পা-দুটো যদি ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই। পদের অসামর্থ্যেই আমি বিপদাপন্ন। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩৩২

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪

২ অক্টোবর ১৯২৫

ওঁ　　　　　　　　[শান্তিনিকেতন]

সুহৃদ্বরেষু

মাঝে মাঝে শরীর বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে ওঠাতে চিঠিপত্র লেখা একরকম বন্ধ করে দিয়েছি। আপনার পূর্ব্বের চিঠির

উত্তরে রথীকে বলেছিলেম ছুটির সময়ে আপনাকে আস্‌তে লিখতে— নিশ্চয় সে ভুলে গেছে। এখনো যদি সময় উত্তীর্ণ হয়ে না থাকে তাহলে একবার মোকাবিলা করে যাবেন। ইতি ১৬ই আশ্বিন ১৩৩২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৫

২৭ ডিসেম্বর ১৯২৫

ওঁ Santi-Niketan
Bengal, India

প্রিয়বরেষু

এখানকার কাজের সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন তাতে আমি লেশমাত্র বিরক্তি বোধ করিনি। বিদ্যালয়ের কাজে শৈথিল্য আছে বলে আমিও অনেকসময়ে উদ্বেগ অনুভব করেছি, সম্পূর্ণ প্রতিকারের পথ দেখ্‌তে পাই নে— আমার অবস্থাও এমন যে নিজে এর ভিতরে থেকে সংস্কার সাধন কর্ত্তে পারি নে। তা ছাড়া এই পরীক্ষা-পাস করাবার ইস্কুলটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বভারতীর আদর্শসঙ্গত জিনিষ নয়— দেশে এই উদ্দেশ্য নিয়ে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান আছে। আমি তাই এ জিনিষটা উঠিয়ে দেবার জন্যে মাঝে মাঝে প্রস্তাব করি। কর্ত্তৃপক্ষদের এখনো রাজি করতে পারি নি। আশা করি এক সময়ে এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতিলাভ করতে পারব।

৭ই পৌষের উৎসব শেষ হয়ে গেল। কয়েকদিনের উৎপাতে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েচে। ইতি ১২ই পৌষ ১৩৩২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬

৬ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ কলিকাতা

সবিনয়নমস্কার নিবেদন

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম এখনো জের ফুরোয় নি। ক্রিস্টমাসের সময় আশ্রমে উপস্থিত থাকব। আপনি এলে দেখাসাক্ষাৎ আলোচনার সময় করে নেব। ইতি ৬ নবেম্বর ১৯২৭ [২০ কার্তিক ১৩৩৪]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭

[আগষ্ট ১৯২৮]

ওঁ [কলিকাতা]

প্রিয়বরেষু

অসুস্থ শরীরের ক্লান্তিতে বিছানায় নিশ্চল হয়ে পড়ে আছি। ডাক্তারের এই বিধান। কিছু বলসঞ্চয় করে নিয়েই য়ুরোপে পাড়ি দেবার ইচ্ছা। ঠিক কবে যেতে পারব এখনো নিশ্চিত

বলা যায় না। এখানকার কাজ ত অনেক করেছি— দেশ গ্রহণ করুক বা না করুক আমার তরফে কোনো কার্পণ্য হয়নি। ওপারের লোক আমাকে প্রার্থনা করচে— এখন সেখানেই আমার স্থান। যেখানে দৈবক্রমে জন্মেছি সেই কি আমার সত্য জন্মভূমি? [শ্রাবণ ১৩৩৫]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

আমি যে কত ক্লান্ত এবং ছোট ছোট কত কাজ ও অকাজের দায় আমার এই পরিশ্রান্ত জীবনটাকে নিয়তই গুরুভারে আক্রান্ত করে রেখেচে যদি জান্‌তেন তাহলে আপনি আমার নিরুত্তর লেখনীকে ক্ষমা করতেন। আয়ু যখন শেষের দিকে আসে তখন যেটুকু কাজ নিতান্তই নিজের সেইগুলিরই দাবী স্বীকার করে আর সমস্ত ত্যাগ না করতে পারলে গুরুতর ক্ষতি হয়। তৎসত্বেও সংসারে থাক্‌তে গেলে একেবারে নিছক স্বধর্ম্মটুকু পালন করে চল্‌লে চলে না। অনেক বাজে [কাজ] করতে হয়, বাজে লোকের উদ্দেশে। প্রায়ই বঞ্চিত করি বন্ধুদেরই। যখন থেকে বুঝেছি যে শরীরটাকে মেরামৎ করে মজবুৎ করে তুল্‌তে পারব না তখন থেকেই আবার আমার

এখানকার সমস্ত কর্ম্মভার নিজে তুলে নিয়েছি— যতদিন বাঁচি যথাসম্ভব এটাকে সম্পূর্ণ করে যেতে ইচ্ছা করি। অথচ উদ্যমশক্তি এখন অপর্য্যাপ্ত নয়, তাই কৃপণতা করা ব্যতীত আমার অন্য উপায় নেই। দরাজ হাত তাকেই শোভা পায় যার হাতে যথেষ্ট পরিমাণে সম্বল আছে। আমার হয়েচে অস্তভক্ষ্য ধনুর্গুণ। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯২৮ [২৪ আশ্বিন ১৩৩৫]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৯

[২৭] অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ "UTTARAYAN"

Santiniketan, Bengal

প্রিয়বরেষু

বিজয়ার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

রথীরা এখনো আসিয়া পৌঁছায় নাই। কলম্বোতে ৩ নবেম্বরে জাহাজ আসিবে। দক্ষিণের রেলপথে যে দুর্য্যোগ তাহাতে অনেক ঘুরিয়া তবে দেশে পৌঁছিতে পারিবে। নবেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি তাহারা ঘরে ফিরিতে পাইবে।

আমি চুপচাপ ঘরে পড়িয়া থাকি, চলাফেরা প্রায় বন্ধ। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। ইতি শুক্লা ত্রয়োদশী [১০] কার্ত্তিক ১৩৩৫

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০

৫ জানুয়ারি ১৯২৯

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan
Bengal

প্রীতিনমস্কার

বিলাতী নববর্ষদিনের শুভকামনানিবেদন গ্রহণ করবেন।

শান্তিনিকেতনের কাজের ভার আবার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেচি। শরীরে শক্তিলাঘব ঘটেচে তাই বলে কর্ম্মের দায়িত্বলাঘব করা চল্‌বে না। যতদিন আয়ু আছে ততদিন লগি ঠেলতে হবে, কর্ণধার ছুটি মঞ্জুর করচেন না।

রথী ফিরে এসে কাজে লেগে গেছে। শ্রীনিকেতনের ভার সম্পূর্ণ তার উপরে। খুবই ব্যস্ত হয়ে আছে। আজকাল নিত্যকর্ম্মের মধ্যে নৈমিত্তিক উপদ্রব হচ্চে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানো। এক একদিন বিশ পঁচিশ জন লোক এসে সাইক্লোনের মত আশ্রমময় পাক খেয়ে বেড়ান কাজ করা দায় হয়। লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করি— তাঁরা চেষ্টা করেন টেনে বের করতে। জয় হয় তাঁদেরই। ইতি ৫ই জানুয়ারি ১৯২৯ [২১ পৌষ ১৩৩৫]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯১

১৫ অক্টোবর ১৯২৯

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করবেন এবং ছেলেমেয়েদের আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে দেবেন। ইতি ২৯ আশ্বিন ১৩৩৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯২

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রীতিভাজনেষু

নাগপুর দিয়ে আসা সম্ভব হল না। বিলিতি ডাকগাড়ি অনুসরণ করে চলে আসা গেল। অন্য কোনো উপলক্ষ্যে নিশ্চয় দেখা হবে। রথী অনেকটা সুস্থ হয়েচে, তবু যথেষ্ট সাবধানে থাকা আবশ্যক। আমার শরীরের অবস্থা বয়সেরই উপযোগী— পঞ্জিকা সংশোধন করতে না পারলে তার সংশোধন অসম্ভব। এখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত স্থাবর অবস্থায় দিনযাপন করতে হবে। ইতি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ [২০ মাঘ ১৩৩৭]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯ ডিসেম্বর ১৯৩১

ওঁ [শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কার

ভুল বুঝেচেন— আগেকার সঙ্গে একমাত্র প্রভেদ এই যে আগে অবকাশের টানাটানি ছিল না। এখন কর্ম্মজালে চিন্তাজালে জড়িত হয়ে পড়েচি— উদ্বেগও যথেষ্ট। মনোযোগের শৈথিল্য যদি লক্ষ্য করে থাকেন তার এই কারণ। ছুটি পাবার জন্য সর্ব্বদা মন উৎসুক হয়ে আছে— গুরুভারাক্রান্ত সময়ের বোঝা বয়ে ক্লান্ত হয়ে আছি। ইতি ৩ পৌষ ১৩৩৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৪

৮ নভেম্বর ১৯৩৩

ওঁ শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার

অসুস্থ শরীর নিয়ে চলে গিয়েছিলুম বোটে, ডাকঘর-বিবর্জ্জিত জলপথে। সেখান থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে ফিরে এসেছি স্বভবনের শয্যাতলে।

কিছুকাল থেকে নিজে চিঠিপত্র খুলি নে জবাব যায় পরের হাত দিয়ে। এ যুগে বানপ্রস্থের সুযোগ নেই সেই জন্যেই ঘরের মধ্যেই নৈষ্কর্ম্ম্যের বেড়া তুলতে হয়— সত্তর বছরের পরে

কর্ত্তব্য অপালন করার অধিকার দাবী করা যেতে পারে। কিন্তু কমলি নেই ছোড়তি— বিছানা থেকে মুক্তি পেলেই উঠ্তে হবে রেলগাড়িতে— সেটা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের অপরিহার্য্য তাগিদে। যে দায় ঘাড়ে পড়েছে তাকে বহন করতে হবে যতদিন না শ্মশানপথে আমি শেষ বহনীয় হই। স্টেট্সম্যানে যে সংবাদ পেয়েছেন সেটা আমার স্বাস্থ্যলাভের সংবাদ নয় সেটাতে আমার দুর্গ্রহের তাড়না সূচনা করচে।

কাজ শেষ পর্য্যন্তই করতে হবে, তবু চেষ্টা করি ক্ষীয়মাণ শক্তি যতটা বাঁচাতে পারি। চিঠি পেলেই উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বাভ্যাস আজও আছে সেইজন্যে চিঠি যাতে না পাই সেই ব্যবস্থা করা হয়েচে— তাতে নিন্দা পাবার আশঙ্কা আছে— কিন্তু নিন্দাবাক্য লিপিবদ্ধ আকারে যাতে আমার কাছে না এসে পৌঁছয় পরিজনবর্গ সেরকম সতর্কতা অবলম্বন করেচেন। অর্থাৎ বেঁচে থেকে মৃত্যুর যতগুলি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তার চেষ্টা করা যাচ্চে। কিন্তু বেড়ার মধ্যে ফাঁক আছে এত যে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক মনে আরাম কেদারায় চুপচাপ থাকা অসম্ভব। এই কারণে খবরের কাগজে আমার উদ্যমশীলতার যে সকল সংবাদ পাবেন সময়োচিত তার ব্যাখ্যা করে নেবেন। ইতি ৮ নবেম্বর ১৯৩৩ [২২ কার্তিক ১৩৪০]

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ শান্তিনিকেতন

শ্রীতিনমস্কারসম্ভাষণ

পত্রবিভাগের সচিব এখন ছুটিতে। আপনার চিঠিখানি অবাধে আমার হাতে এসে পৌঁচেছে।

জরাসুর ক্রমশই আমার দেহে তার অধিকার বিস্তার করচে। ম্যাণ্ডেটের অবস্থা পেরিয়ে এখন রীতিমত অক্যুপেশনের চেহারা দেখা দিচ্চে। মস্তিষ্ক রাজধানীটার পরে এখনো বোমা পড়েনি, কিন্তু মেরুদণ্ডটাকে কাবু করেছে, হৃদ্‌যন্ত্রটাও হার মানবার অবস্থায়। সর্ব্বাঙ্গে এই পরাভব বহন করে চুপচাপ করে থাকি, কাজকর্ম্মের দিকে মন নেই, লেখনী চালনাকে উজানে লগি ঠেলার মতো লাগে।

বিজয়ার অভিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯৩৫ [২৩ আশ্বিন ১৩৪২]

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

উত্তরায়ণ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে সেই কারণে চিঠিপত্র লেখা এবং পড়া আমার পক্ষে কষ্টকর ও ক্ষতিকর।

বাংলা দেশের দুর্গতির লক্ষণ প্রতিদিন পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছে, এর কারণ আমাদের জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতা। নেতা এবং নীত সকলেরই প্রকৃতিগত বিষের ক্রিয়া দেশের জীবনীশক্তিকে আক্রমণ করেছে। মাঝে মাঝে যখন অসহ্য হয় কিছু বলবার চেষ্টা করি, জানি তা ব্যর্থ। আমার দায়িত্বের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। এখন আমি কোনো পক্ষকে বিচার করতে চাই না এবং বিচার করতে আমি অক্ষম। আমার এই শেষ কয়দিন আমার আপন কর্মক্ষেত্রের একপ্রান্তে বসে শান্তিতে যাপন করতে ইচ্ছে করি। ভালো মন্দের দণ্ড পুরস্কার যাঁর হাতে তিনিই তার বিধান করবেন। আমি বিদায় নিলুম। ইতি ১০।৯।৩৮ [২৪ ভাদ্র ১৩৪৫]

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৭

১৮ এপ্রিল ১৯৩৯

ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

প্রীতিনমস্কার

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানবেন।

আমি কেবলমাত্র কবি, তার চেয়ে বেশি কিছুই নই। দেশকে নতুন করে গড়বার শক্তি যদি আমার থাকত তাহলে স্বতই এতদিনে তার পরিচয় পেতেন। যে কাজ পারি তা সাধ্যমতো করেছি, যা পারি নে তা যদি করতে যেতুম তাহলে অঘটন ঘটাতুম। অহঙ্কারের তাড়নায় নিজের সহজ সীমা লঙ্ঘনের চেষ্টায় পৃথিবীতে বিস্তর দুষ্কর্ম্মের সৃষ্টি হয়ে থাকে, এই বয়সে আমার উপর সেই দুর্গতির ভার চাপাতে চান কেন? অকৃতিত্বের অপবাদ সইতে রাজি আছি কিন্তু নির্বুদ্ধিতার নয়। আপনার চিঠিতে একথাও লিখেছেন ঘোরা ফেরা ছেড়ে দিয়ে কবিতা লিখি নে কেন— অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করি তাও আপনার মনঃপূত নয়। সখ করে কাজ করিনে, দায়িত্ব অন্তরে এসে চেপে ব'সে চালনা করে, সে দায়িত্বের ক্ষেত্র ক্ষমতার সীমানার মধ্যেই। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৪৬

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

২০ ? জুন ১৯৩৯

মংপু দার্জিলিং

প্রীতিভাজনেষু

ক্লান্ত শরীর নিয়ে এই পাহাড়ে এসেছি।

গীতা সম্বন্ধে আপনার বইখানি পেলুম। এর ভাষা সরল এবং এতে চিন্তার বিষয় যথেষ্ট আছে। ইতি ২০[?]।৬।৩৯ [৫ ? আষাঢ় ১৩৪৬]

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

[শান্তিনিকেতন]

শ্রীমান করুণা কিরণের কর্ম্মপথ যাত্রা সর্বতোভাবে নির্বিঘ্ন ও জয়যুক্ত হউক এই আমার সর্বান্তঃকরণের কামনা। ইতি ৪. ৯. ৩৯ [১৮ ভাদ্র ১৩৪৬]

আশীর্বাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০০

২৮ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ মংপু

প্রীতিনমস্কার

বিজয়ার অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

কিছুদিন পাহাড়ে কাটানো গেল— ফেরবার সময় হয়েছে। জীর্ণ শরীর সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য নয়। ইতি ২৮।১০।৩৯ [১১ কার্তিক ১৩৪৬]

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০১

১২ নভেম্বর ১৯৩৯

ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

প্রীতিনমস্কার

শরীর আমার অকর্মণ্য তাতে সন্দেহ নেই। য়ুরোপে থাকতে দেহচালনা করতে ডাক্তারেরা আমাকে বারবার নিষেধ করেছে। আমাদের দেশে তাদের নিষেধের দোহাই কেউ মানতে চায় না। তাই দেহের প্রতি পীড়ন বেড়ে চলেছে। যাঁরা দয়া করে ক্ষমা করেন তাঁদের নমস্কার করি। যাঁরা করেন না তাঁদের কাছে আমার স্বাস্থ্যকে আমি বলি দিয়ে আসচি। অনেক সময় এমন ছুর্নিবার কারণ ঘটে যে আমার কাজের

খাতিরেই অনুরোধ কাটিয়ে উঠতে পারি নে। এই কথাই বারবার মনে হয়, দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ বিপত্তি— কারণ শক্তি কমতে থাকে দাবী বাড়তে থাকে— অক্ষমতাবশত অনেককে দুঃখ দিতে হয় এমন দায়গ্রস্ত জীর্ণজীবন বহন করে লাভ কী। ইতি ১২।১১।৩৯ [২৬ কার্তিক ১৩৪৬]

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০২
১৪ জুন ১৯৪০

ওঁ

Gouripur Lodge
Kalimpong

প্রিয়বরেষু

দীর্ঘকাল রোগে ভুগেছিলেন খবর পাই নি সেরে উঠেছেন শুনে খুশি হলুম। আজকাল চারিদিকেই দুঃসংবাদ, দুর্ঘটনা ঘটচে পদে পদে। মনটা খারাপ হয়ে থাকে। দূরে নিকটে এই বিনাশের আবর্তে আমি যে কেমন করে আজও টিঁকে আছি তাই ভাবি শরীর মন যেন আলগা বৃন্তে সদ্যঃপাতী হয়ে আছে।

আপনি আমার অন্তরের শুভকামনা গ্রহণ করুন। ইতি ১৪।৬।৪০ [৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭]

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৩

১৮ জানুয়ারি ১৯৪১

ওঁ

শ্রীমান করুণাকিরণের শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে আমার কামনা এই যে, দম্পতির সম্মিলিত জীবন এই নূতন সংসার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত তাহার বেদীতলে কল্যাণের ধ্রুব প্রতিষ্ঠা হোক। নরনারীর অকৃত্রিম প্রেমের উৎসে বিধাতার আশীর্বাদ স্বত উৎসারিত হয়, নবদম্পতির চিত্তে সেই উৎসধারা অবাধ হউক অক্ষয় হউক পুণ্য অনুষ্ঠানে এই আমার আশীর্বাদ দূর হইতে প্রেরণ করিতেছি। [৫ মাঘ ১৩৪৭]

শান্তিনিকেতন শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮. ১. ৪১

শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবীকে লিখিত

১

২৭ অক্টোবর ১৯২৮

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN
BENGAL

কল্যাণীয় কিরণ

তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১০ কার্ত্তিক ১৩৩৫

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ জুন ১৯৩১

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়েষু

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ এই সংবাদে আনন্দিত হলুম। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবীকে লিখিত

১

২০ অক্টোবর ১৯২৯

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৩ কার্ত্তিক ১৩৩৬

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

১

[নভেম্বর ১৯০২]

কল্যাণীয়েষু

১১০ টাকা পাঠাইলাম। ইহার মধ্যে ১০০ টাকা বিদ্যালয়ের, দশ টাকা পাথেয় খরচ। যদি পথ-খরচ আরো বেশি লাগে তবে ১০০ টাকা হইতে আপাতত লইয়া পরে আমাকে লিখিলে পূরণ করিয়া পাঠাইব।

মিস্ত্রিকে বেতন চুকাইয়া ছাড়াইয়া দিবে।

শমীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়ো। উহার আহারাদির সময় তোমরা একজন কেহ উপস্থিত থাকিলেই শরীরের অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিবে। যেদিন ক্ষুধা নাই বলিয়া খাইবে না সেইদিন সাবধান হইবে। বিদ্যালয় হইতে বাড়িতে যাতায়াতের সময় অথবা খেলার সময় অধিকক্ষণ রৌদ্র যেন না লাগায়। উমাচরণকে কাছাকাছি সর্বদা হাজির রাখিবে। দাস্ত কোন্ দিন হইল না বা পেটের অসুখ করিল উমাচরণ যেন তোমাদের খবর দেয়। জ্বরের ভাব আরম্ভ হইবামাত্র Aconite 30° অথবা Belladonna 30° দিবে— পেটের গোলমালের সূত্রপাতেই Nux 30° দিবে। কুঠিবাড়িতে দোতলাতেই রথীর সঙ্গে শমী শুইবে— তুমিও যদি সেখানে শুইতে পার ত ভাল হয়।

চাবি তোমাকে দেওয়া যাইতেছে। যখন যে জিনিষ দরকার— যথা চা জ্যাম বিস্কুট— তুমি বাহির করিয়া লইয়া

চাবি নিজের কাছেই রাখিবে। উমাচরণকে কিছুতেই চাবি দিয়ো না কারণ উহাকে কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না।

তোমাদের জন্য নূতন গুড়ের সন্দেশ দেওয়া গেল— সকল ছাত্র এবং অধ্যাপকেরাই যেন ভোগ করেন।

রথীর গায়ে দিবার জন্য একজোড়া মোটা সিল্কের চাদর দিলাম— অল্প শীতের সময় একটা, এবং বেশি শীতের সময় এক জোড়া পরিলে বোধ করি বেশ কাজ চলিয়া যাইবে।

যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে মনোরঞ্জনবাবুকে সমস্ত বলিয়ো। কুঞ্জবাবু সম্বন্ধে কোনপ্রকার পূর্ব্বসংস্কার তোমরা মনে রাখিয়ো না— উপযুক্ত লোক পাওয়া বড় কঠিন। ঔষধের বাক্স ও বইগুলি যেন অন্তর্হিত হইয়া না যায়। বই অনেকগুলি এখানে আনিয়াছি বাকিগুলি সম্ভবত অধিকাংশ ডাক্তারের নিজের— কিন্তু ঔষধগুলির অধিকাংশ শান্তিনিকেতন আশ্রমের।

Religious Systems এবং Origin of Aryans বই দুখানি পাঠাইলাম— লাইব্রেরিতে রাখাইয়ো। লাইব্রেরি ঝাড়িয়া তাহার মধ্যে নূতন করিয়া ন্যাপ্থালিন দিবে। বইগুলি ও পুঁথিগুলি এক একবার রৌদ্রে দিবে।

তাঁত শীঘ্র সম্পূর্ণ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিবে। যত শীঘ্র পারি আমি ছাপার বন্দোবস্ত পাঠাইব। History Readers মনোরঞ্জনবাবু যদি লিখেন ত ভাল হয়। ইতি

[অগ্রহায়ণ ১৩০৯]

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

২

২৫ জুলাই ১৯০৩

ওঁ [আলমোড়া]

কল্যাণীয়েষু,

আসন্ন ঝড়ের মুখেই তুমি বিদ্যালয়কে ছাড়িয়া আসিয়াছিলে। ইতিমধ্যে তাহার উপর দিয়া বিপ্লব চলিয়া গেছে। আমি সুদূরে রোগতাপের মধ্যে কেবল চিঠি ও টেলিগ্রামযোগে এই সঙ্কটের সময়টাকে এক রকমে উত্তীর্ণ করিয়া দিলাম। অন্তত এই সময়ে যদি তুমি থাকিতে তবে আমাকে এত বেশি হাঙ্গাম করিতে হইত না। অনুপস্থিতি যখন অনিবার্য সেই সময়ে এই সমস্ত পরিবর্তন করা যে আমার পক্ষে কিরূপ সুকঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কল্পনা করিতে পারিবে না।— রঙ্গমঞ্চ যেখানে, নেপথ্য তাহা হইতে যদি হাজার মাইল দূরে থাকে তবে অভিনয় ব্যাপারের দশা যেরকম হয় বিদ্যালয়ের সেই দশা হইয়াছিল। ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ কালে কালে বহুতর বিঘ্ন কাটাইয়াই চলিতে হইবে— শুভানুষ্ঠানের নিয়মই এই— নতুবা সে বল, বেগ ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। ইহা দেখিয়াছি, বিপ্লবে যতটা ক্ষতি হয়, লাভ তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। যাহা হউক এইরূপ আঘাত-পরম্পরায় বিদ্যালয় ক্রমশই প্রসারতা ও পরিণতি লাভ করিতেছে— আমারও ভরসা ক্রমে বাড়িতেছে —বন্ধুরাও ক্রমশ আকৃষ্ট হইতেছেন এবং সেই সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে যখন ইহাকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারিবে

না। ইহার শৈশবে মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দ ও তুমি ইহাকে লালন করিয়াছ, এখন কৈশোরে তোমাদের মধ্যে একা জগদানন্দ অবশিষ্ট আছেন— ইহার বলশালী তেজোময় যৌবন আসন্নপ্রায়, যদি ধৈর্যের সহিত এখন তুমি ইহার সহিত যুক্ত থাকিতে পারিতে তবে গৌরব লাভ করিতে সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয় বাংলাদেশ গঠনের ইতিহাসের একটি অঙ্গ হইবে ইহা মনে করিয়ো— যাঁহারা ইহাতে জীবন-সমর্পণ করিবেন তাঁহাদের জীবন সার্থক হইবে। কিন্তু বিধাতার রণক্ষেত্রে অনেক লোকেই আহত হয়, সকলেই টিঁকিয়া থাকে না।

রাণীর রক্ত ওঠা থামিয়া গেছে— কিন্তু তাহার শরীর ভাল নাই। পেটের অসুখ চলিতেছে— দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সম্বন্ধে আমার মনে কোন আশা নাই।— জন্মমৃত্যুর উপরে যাঁহার মঙ্গলচ্ছায়া সমানভাবেই পড়ে সেই বিধাতার হস্তে আমি রেণুকাকে সমর্পণ করিয়াছি।

অনেকদিন পরে সম্প্রতি এখানে বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এখানে বাদলার উপদ্রব অন্যান্য পাহাড়ের মত অত্যধিক নহে।

সত্যেন্দ্র পর্শু এখানে আসিয়াছে। হেমবাবু [হেমচন্দ্র মল্লিক] আমার প্রতিবেশী— তাঁহার নিকট হইতে অনেক সহায়তা পাইয়া থাকি। ইতি ৯ই শ্রাবণ, ১৩১০

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

ওঁ [কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু,

কই— সেই ইংরাজী রীডার কপি করিয়া পাঠাইলে না? আমি ত কাল যাত্রা করিতেছি। ইতিমধ্যে পাঠাইলে ছাপার বন্দোবস্ত করিতে পারিতাম। মোহিতবাবুকে বলিয়া গেলাম— তাঁহাকে পাঠাইলে তিনি প্রেসে দিয়া দেখিয়া শুনিয়া ছাপাইবেন। বিলম্ব করিয়ো না।

রথীর জন্মদিনের উৎসব আশা করি নির্ব্বিঘ্নে ও আনন্দে সম্পন্ন হইয়াছে। মনোরঞ্জনবাবুরা আসিয়াছিলেন কি?

রাজেন্দ্রবাবুর জন্য উদ্বিগ্ন আছি। এদিকে ভবেন্দ্রবাবুও অনুপস্থিত— পদে পদে পাঠের বিঘ্ন ঘটিতেছে। যখন কোন অধ্যাপক ছুটি লইবেন তখন তাঁহার ক্লাসের ছেলেরা নিজে পড়ার ব্যবস্থা যাহাতে করে এরূপ নিয়ম করিয়ো। ছাত্রগণ ঘরে সময় পায় না বলিয়া তোমরা আক্ষেপ কর, অতএব কোন অধ্যাপক অনুপস্থিত হইলে যে সময় হাতে পাওয়া যাইবে সেই সময়টিকে তোমাদের মনের মত কাজে লাগাইয়া লইয়ো— যেন এলোমেলো ভাবে সময় না কাটায়।

ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক মঙ্গলভাব রক্ষা করিয়ো। তাহাদিগকে সন্তানস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ধৈর্য্যের সহিত নিয়ত তাহাদের হিতসাধন করিবে এই আমি সর্ব্বদা কামনা করিতেছি।

মাঝে মাঝে দীনু ও সন্তোষকে অধ্যাপনা সম্বন্ধে পরামর্শ

দিতে ভুলিয়ো না। ছেলেদের ধর্ম্মভাব যাহাতে সজীব থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়। নূতন দুটি-একটি ছেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

নগেন্দ্রবাবুকে বলিয়ো ভবেন্দ্রবাবুকে যখন একেবারেই বিদায় দেওয়া যাইতেছে তখন যেকয়দিন তিনি আইন পড়ার উপলক্ষ্যে কামাই করিয়াছেন সে কয়দিনের বেতন কাটিবার প্রয়োজন নাই।

ঈশ্বর তোমাদের সকলের কুশল করুন। ইতি সোমবার
[১৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০]

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৪

১৭ আগস্ট ? ১৯০৫

ওঁ [কলিকাতা]

সুবোধ—

কলকাতায় এসে মহারাজের টেলিগ্রাফ পাওয়া গেল যে তিনি মঙ্গলবারে ছাড়বেন। মঙ্গলবারে টেলিগ্রাম পেলুম যে সেদিন তিনি আস্‌বেন না— আমি বিরক্ত হয়ে ঠিক করলুম বুধবার রাত্রেই আমি গিরিডি যাব। বুধবারে টেলিগ্রাম পেলুম— am indisposed, shall start after three days, will you kindly wait? কাজেই উত্তর দিতে হল যে, shall wait। ইতোমধ্যে পার্টিশনের [ব্যা]পারে উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে প্রত্যহই দলবেদলের লোক আস্‌চে, তারা ধরেছে এই সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে

৩

সুবোধ —

কলকাতায় এসে মহারাজের টেলিগ্রাফ পাওয়া গেল যে তিনি মঙ্গলবারে ছাড়বেন। মঙ্গলবার টেলিগ্রাম পেলুম যে সেদিন তিনি আসবেন না — আমি বিরক্ত হয়ে ঠিক করলুম বুধবার সকালেই আমি গিরিডি যাব। বুধবারে টেলিগ্রাম পেলুম — Am indisposed, shall start after three days, will you kindly wait? কাজেই উত্তর দিতে হল যে, Shall wait। ইতোমধ্যে পার্টিশনের শোকে উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে প্রত্যহই দলে দলে লোক আসচে, তারা ধরেছে এই সময়ে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাকে টাউনহলে বলতে হবে। এই সমস্ত উৎপাতের মধ্যে আছি — শরীর যে ভাল আছে তা সত্যের অনুরোধেই বলতে পারিনে — কিন্তু ন যযৌ ন তস্থৌ।

সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র

আমাকে টাউন হলে বল্‌তে হবে। এই সমস্ত টানাছেঁড়ার মধ্যে আছি— শরীর যে ভাল আছে তা সত্যের অনুরোধে বল্‌তে পারিনে— কিন্তু ন যযৌ ন তস্থৌ।

তোমাদের খবর কি? শমী মীরার পড়া কি রকম চল্‌চে? বৌঠাকরুণকে বলে দিয়ো মীরাকে তিনি যেন তাঁর ঘরকরনার সঙ্গিনী করে রাখেন— চাই কি ওকে দিয়ে তিনি তাঁর হিসেব রাখাতে পারেন। এ ছাড়া মিষ্টান্ন তৈরির ব্যাপারে যদি তাকে সহকারীরূপে দীক্ষিত করে রাখেন তবে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক কাজে লাগ্‌বে এবং তোমাদেরও মধ্যে মধ্যে গুরুদক্ষিণা মিল্‌তে পারে।

ইস্কুলের ছেলেরা কি করচে? পালিত কি ভাবে চল্‌চে? সর্ব্বেশের সঙ্গে তার কি বাগ্‌যুদ্ধ হয়? কিছু পড়াশুনো করচে ত? অরুণ দেবল কি রকম দিন যাপন করচে?

রথী সন্তোষদের পড়া চলে? সেই জর্ম্মান বন্ধুর কাছে জর্ম্মান শিক্ষার চেষ্টা করচে কি? সেটা এই সুযোগে কতকটা অগ্রসর হলে ভাল হয়।

পিসিমার খবর কি? তাঁর কি রকম লাগ্‌চে? শালবনে খুব ঘুরে বেড়াচ্চেন? বেড়াতে না পারলে তাঁর মন টিঁকবে না? তাঁর শরীর কি রকম আছে?

সেই জমি নেবার কথা তোমার ন দাদাকে বলেছ ত?

আজ এই সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিষের রসিদ পাঠাই।

শমীর ধুতি ৪ জোড়া—

তোয়ালে ছোট বড় ৯ জোড়া

কাঁসার থালা— ৬ খানা

কাঁসার বাটি— ১৮

কাপড় ঝোলানো র‍্যাক্‌— ৮টা

দিশি ছাতা— ৬টা

মুগের ডাল— ১০ সের

টার্কিশবাথসোপ, একবাক্স।

ইতি বৃহস্পতিবার [১ ভাদ্র ? ১৩১২]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[২৫] অক্টোবর ১৯০৫

ওঁ [কলিকাতা]

সুবোধ,

তোমার ৭৬৲ টাকা বাদে ৩০০৲ টাকা পাঠাচ্ছি। পিসিমাকে বোলো যে, আমার তহবিল একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। এই টাকাতেই যেমন করে হোক কার্ত্তিক মাস না চালালে আমি বিপদে পড়ব। আমার হাতে ঠিক ২৫ টাকা আছে তাতেই আমার কলকাতার খরচ চালাতে হবে। আজ মাসের ৮ই, আজই যদি আমার এই অবস্থা, তবে আগামী মাসে আমাকে দেনা দিয়ে মাস সুরু করতে হবে— এ রকম আর কতদিন চলবে? তোমরা এখানে না এলে তোমাদের যেদিন ইচ্ছা বোলপুরে যেয়ো।

সুরেনের একটি পুত্রলাভ হয়েছে— আজ তাকে দেখতে

যেতে হবে। পিসিমা বোধহয় এতক্ষণে খবর পেয়ে থাকবেন।

আসবার সময় তাড়াতাড়িতে বৌঠাকরুণের কাছে বিদায় নেওয়া হল না, সে জন্যে মনটা অনুতপ্ত আছে। বিদায় নিতে গেলে গাড়িও পেতুম না— আমরা একেবারে ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলুম।

তোমরা বোলপুর বিদ্যালয় খোলবার বরঞ্চ দুই-এক দিন আগে গেলেই ভাল করবে। সেখানে সত্যেন্দ্র আছেন। অক্ষয়ের শরীর কি রকম? আজই ডাকে ভাই-ফোঁটার বস্ত্রাদি গেল— আর কিছুক্ষণ পরেই পাবে বোধহয়।

শ্রীশবাবুকে বোলো গিরীন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে যাতে লাইনের কাছে অর্থাৎ স্টেশন থেকে ৪।৫ মাইলের মধ্যে যত সম্ভব জমি— এক স্থানে বা ভিন্ন স্থানে— একটা মৌজা বা ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় সংগ্রহ করে রাখবার চেষ্টা যেন নিশ্চয়ই করেন— নইলে ভারি অসুবিধা হবে। আমার ইচ্ছা আছে মীরার জন্যে আমি ঐ অঞ্চলে ঐ রকমের একটা সম্পত্তি করে রাখি সেটাতে বাড়ি করে চাষবাস করে তাকে দেব— এই সংকল্পটা আমার মনে খুব লেগে গেছে, তোমরা এতে আমাকে সাহায্য কোরো। শরৎও একখণ্ড জমি ইচ্ছা করছেন— সে তিনি নিজের খরচেই করবেন। যাই হোক ও অঞ্চলে যতই জমি যেখান থেকে পাওয়া যায়— তার স্বত্ব কিছুমাত্র ভাল থাকলেই নেবার চেষ্টা করা যেন হয়। তোমার ন দাদাকে এ সম্বন্ধে খুব একটা তাগিদ দিয়ো। ইতি [৮]কার্তিক ১৩১২

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

কল্যাণীয়েষু,

তোমার বিপদের সংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইয়াছি। এই দুঃসময়ে তোমার যে পরিমাণ ছুটির প্রয়োজন তাহা অসঙ্কোচে লইয়ো। আমি মীরাকে এক ঘণ্টা ইংরেজি পড়াইবার জন্য মনোরঞ্জনবাবুকে লিখিয়া দিয়াছি। তোমার স্ত্রীর অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি পীড়া বোধ করিতেছি। কালক্রমে ছাড়া তাঁহার সান্ত্বনার কি উপায় আছে তাহা ত জানি না। বোলপুরে পিসিমার কাছে গেলে যদি তাঁহার আরাম পাইবার সম্ভাবনা বোধ কর, তবে সেইখানেই লইয়া যাইবে। কারণ, আত্মীয়দের মধ্যে সর্ব্বদাই শোকের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়, হয়ত দূরে কতকটা শান্তি পাইতেও পারেন। সমীরের টীকা দেওয়া হইয়াছে? আশা করি তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের বিঘ্ন ঘটে নাই। আমি এখানে আর এক সপ্তাহের অধিক থাকিব না। এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া কলিকাতাতেও বিলম্ব করিব না। রথীরা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি যাত্রা করিবে অতএব তাহাদের আর অধিক বিলম্ব নাই— ইতিমধ্যে যাত্রার আয়োজনস্বরূপ কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে হইবে। সন্তোষ যদি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া থাকে তবে তাহাকেও আনাইয়া লইতে হইবে। তুমি যে কয়দিন কলিকাতায় আছ যদি পার ত

ইংরেজি সোপানটাকে অগ্রসর করিয়া লইবে।

একবার প্রমথর সঙ্গে সেই বিবাহ প্রস্তাবটার পুনরালোচনা করিয়া দেখিয়ো। তিনি যখন বিলাতেই যাইতেছেন তখন আর ত জাতের ভয় রাখিলে চলিবে না— আমি তাঁহার লণ্ডনের খরচ যথাসম্ভব জোগাইব।— কেদার দাসগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিয়ো তিনি যে ছেলেটির কথা জানাইয়াছেন তাহার কি হইল— B. L. Chowdhury ইহার কথা বলিয়াছিলেন। যদি সুবিধা হয় তাহাকে দেখাইয়া লইয়ো। তোমার স্ত্রীকে ঈশ্বর সান্ত্বনা দান করুন এই আমি কামনা করি। ইতি ১৮ই মাঘ ১৩১২

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১ জুন ১৯০

কল্যাণীয়েষু

আজ সকালবেলায় মোহিতবাবু এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি গ্রীষ্মাবকাশের অবশিষ্ট কয়দিন বোলপুরে যাপন করেন। আমি সম্মতি দিয়েছি। আমি খুব সম্ভব আগামী বৃহস্পতিবারে যেতে পারব— কারণ বুধবারে আমার প্রবন্ধপাঠের কথা হচ্চে— তাহলে মোহিতবাবু, তাঁর স্ত্রী ও দুই শিশুকন্যা আমার সঙ্গেই যাবেন এবং প্রায় দিন দশেক ওখানেই থাকবেন। যে ঘরে মীরা, পিসিমা আছেন সেইখানেই তাঁদের থাকবার

বন্দোবস্ত করতে হবে, আর ত কোথাও সুবিধা দেখ্‌চি নে— অতএব ঐ দিন দশের জন্যে মীরাদের ঘর ছাড়তে হবে।

নরেন ঠাকুর শুনচি যেদিন রাত্রের ট্রেনে যাবে বলে গেল সেদিন না গিয়ে তার পরদিন মেলট্রেনে গেছে। তার এই অপরাধ মার্জনা করবার যোগ্য নয়। সে রাত্রে নিশ্চয় যাবে বলেই আমি তোমাকে চিঠি বা টেলিগ্রাফ দিই নি— নরেনও যেতে পারেনি বলে আমাকে যদি খবর দিত তাহলেও আমি যথোচিত বিধান করতে পারতুম— এই কারণে উমাচরণকে দু দিন দুঃখভোগ করতে হল এবং আমাকে কালিগ্রামে যেতে দিলে না। নরেনকে জানিয়ো তার এই ব্যবহারে তার প্রতি আমার একান্ত ঘৃণা জন্মিয়েছে। বিপদে লোককে উদ্ধার করবার জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে যে ব্যক্তি কুণ্ঠিত হয় সে আবার মানুষ! যে কয়দিন নরেন অনুপস্থিত ছিল সে কয়দিনের মাইনে তাকে যেন না দেওয়া হয়!

বেলা প্রজ্ঞার আমিষ আহারের বইটা (অর্থাৎ ২য় খণ্ড) চেয়ে পাঠিয়েছে, সেটা আমাদের লাইব্রেরিতে আছে— খোঁজ করে নিশ্চয় তাকে পাঠিয়ে দিয়ো এবং সেইসঙ্গে নতুন ম্যাগাজিন প্রভৃতি যা হাতে এসেছে পাঠিয়ো।

গরম কি রকম? প্রথম কয়দিন এখানে অসহ্য হয়েছিল কাল থেকে ঠাণ্ডা দেখা দিয়েছে।

স্কুলে তোমার কার্য্যভার সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রকে যে পত্র লিখেছি বোধ করি পেয়ে থাকবে। ঐ রকম ভাবে কাজ চালিয়ো।

মীরার পড়া বোধহয় যথানিয়মেই চল্‌চে। তার রান্নাটাও যাতে রোজ হতে থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা চাই।

আমার বাসস্থানটি এতদিনে বোধহয় অনেকটা সমাপ্তির দিকে গেছে— কিন্তু আশা করি কোনো একদিন ঝড়ে তার খড় কুটো সমস্ত উড়িয়ে বাড়িটাকে নেড়া না করে দেয়। লোহার শিক দিয়ে এঁটে দেওয়াই ভাল। কুসুমতোকে আমার নাম করে বোলো যদি বাকি র‍্যাক্‌টা ইতিমধ্যে তৈরি করে দেয় ত আমি খুসি হই। মোহিতবাবু যাবার পূর্বে লাইব্রেরিটা বেশ সুসম্পূর্ণ করে রাখা চাই।

য়োকোহামায় সন্তোষরা পৌঁছে যে চিঠি ডাকে দিয়েছে সেটা পশু আমি পেয়েছি। তোমরা কি রথীর কোনো চিঠি পেয়েছ। চিঠিটা সন্তোষ জাহাজেই লিখেছিল সুতরাং বিশেষ নতুন কোনো খবর নেই। ৩০শে এপ্রিলে তারা য়োকোহামায় পৌঁচেছে। ইতি শুক্রবার ১৩১৩

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৮

৩ জুন ১৯০৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

যে রকম গতিক দেখা যাচ্চে আগামী শনিবারের পূর্ব্বে যে ছুটি পাব, সে আশা দেখচি নে। এক লক্ষ্মীছাড়া শিবাজি মেলা নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত আটক পড়েছে, কাজেই তার পরে

শুক্রবারে প্রবন্ধ পাঠ করে শনিবারে আমি খালাস পাব। উমাচরণকে তা হলে ৮ই পাঠাতে হবে। তাকে ৭ই বোলপুর পাঠাব—৮ই তুমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো নইলে সে ভয় পাচ্চে। ৭ই মেলে বোলপুরে যাবে—৮ই মেলে বর্দ্ধমানে গেলেই চলবে। কাকে তুমি কি চিঠি লিখতে বলেছ আমি ত কিছুই বুঝতে পারলুম না।

অরুণকে দীনেশবাবু এক সপ্তাহের মত চান—অরুণই শুনচি আসতে চেয়েছে। অতএব পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল—কিন্তু তাহলে তাকে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষায় উপস্থিত হতে দেওয়া চলবে না। দেখচি কেবল উপেন আর সুজিতকে পরীক্ষায় পাঠান সঙ্গত হবে।

তারকবাবুরা আমাকে ধরেছেন যে আমাদের স্কুলের তিন মাস ছুটির সময় সানোসান যদি তাঁদের টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জুজুৎসু শেখান এবং তার পর থেকে হপ্তায় দুদিন করে এসে Exercise করিয়ে যান ত ভাল হয়। আমি জানি সানোসান ঐ সময়ে ছুটিতে পাহাড়ে যেতে ইচ্ছুক অতএব এ প্রস্তাবে তিনি বোধহয় সম্মত হবেন না। যা হোক্ তাঁর মত পেলে আমি পালিতকে জানাব।

এখানে বড়দিদি মেজবোঠান নদিদি প্রভৃতি সকলেই এক বাক্যে বল্‌চেন যে মীরা বেমানান্ মোটা হয়ে পড়েছে। সর্ব্বদা কাছে থাক্‌লে বোঝা যায় না কিন্তু এখানকার মেয়েরা সকলেই বড় আপত্তি করচেন। শুনে আমার মনটা উদ্বিগ্ন হয়েছে। নদিদি আমাকে বিশেষ করে বলচেন ওকে স্যাণ্ডউয়ের

Exercise করাতে। অর্থাৎ কেবল হাত পা নেড়ে যে Exercise করতে হয়। কিন্তু তোমরা কেউ বোধহয় তার নিয়ম জান না। অতএব ইতিমধ্যে দু বেলা ওকে দ্রুতপদে খুব খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে আসা চাই— এটা যাতে হয় সে তোমাকে দেখ্‌তে হবে। ও সকালে বিকালে যে দুধ খায় তার পরিবর্ত্তে ওর চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেবে। বিপিনের হাতের তৈরী কড়া চা যেন না হয়। আমি যা বল্লুম সেটা যাতে পালন হয় তা করতেই হবে। ওর পড়া এবং রান্না চল্‌চে ত ?

বেলাকে আমিষ রান্নার বই পাঠিয়েছ ত ?

সানোদের জন্যে সুটকে মাছ কাঁকড়ি এবং পেঁয়াজ পাঠান হয়েছে— পেয়েছে কি না এবং পছন্দ হয়েছে কি না খবর দিয়ো।

তোমাদের আম পাঠাতে হবে কি না অর্থাৎ বোলপুরে আম পাওয়া যাচ্চে কি না জানিয়ো। আমের ভারি দুর্গতি। কোনো আমই মুখে দেবার জো নেই।

কাল রাত্রে এখানে বৃষ্টি হয়ে এখনো মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তোমাদের আকাশের অবস্থা কি রকম ?

ইংরেজী সোপানের দ্বিতীয় খণ্ড ত পেয়েছ! অনেকগুলো ছাপার ভুল দেখলুম। এই খণ্ডটি একদিন অন্তর সত্যরঞ্জন নরেন খাঁদের ক্লাসে পড়ালে হয়। ইতি ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

সানোসানোর বাংলা চলচে ? কুসুমতো কি করচে ? তোমার

নূতন ছাত্রীদের পড়া এগচ্চে ?

সত্বর এ পত্রের উত্তর পেলে উমাচরণ সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করা যাবে।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৯

৪ জুন ১৯০৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোমরা সমস্ত ভুল বুঝিয়াছ। আমি বলিয়াছি এক একটা ক্লাস তুমি সাত দিন করিয়া পড়াইবে— অর্থাৎ প্রথমে সত্যর ক্লাস এক সপ্তাহ পড়ানো হইল— তাহার পরের সপ্তাহ অক্ষয়ের ক্লাস পড়াইলে— তাহার পরে জ্ঞানবাবুর, তাহার পর অজিত— তাহার পরে কয়েক দিন History Geography— তাহার পরে আবার সত্যর ক্লাস হইতে আরম্ভ করিয়া আবার পড়াইয়া চলিবে।— ইহাতে স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে তোমার কিছুই জানিতে বাকী থাকিবে না। ইহাতে প্রতিদিন তোমাকে এক ঘণ্টার বেশী পড়াইতে হইবে না।

মোহিতবাবুরা যদি যান ত শান্তিনিকেতনেই থাকিবেন। অরুর মেয়ের বিয়ে যদি বোলপুরে ১লা আষাঢ়েই স্থির হইয়া যায় তাহা হইলে মোহিতবাবুকে লইয়া যাইব না।

বিদ্যালয়ের যে সকল বই এদিকে ওদিকে ছড়াছড়ি যাইতেছে সে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া লাইব্রেরিতেই

গুছাইয়া রাখিবে। মাঝের ঘরে যে আলমারিটা খালি আছে সেইটাতেই রাখিতে পার।

মীরাকে বলিও সে যেন প্রত্যহ ব্যায়ামচর্চা করে। তাহার দিদিকে আমি শিলাইদহে রোজ ডাম্বেল মুগুর ডন অভ্যাস করাইয়া দুইবেলা ছাতে দ্রুতপদে পায়চারি করাইয়া অতিরিক্ত মোটা হওয়ার মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি। মীরাকেও এখন হইতে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। নহিলে ভবিষ্যতে যখন প্রতিকারের উপায় থাকিবে না তখন কেবলি অনুতাপ করিতে হইবে।

মীরার Sohrab Rustam পড়া শেষ হইলে তাহাকে টেনিসনের Enoch Arden পড়াইতে শুরু করিয়ো। ইতি ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১০

[১১ ? ডিসেম্বর ১৯০৬]

ওঁ

সুবোধ,

আজ কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁছিলাম। দুই-একদিন এখানে থেকে শিলাইদহে যাব। কাওয়াগুচির সঙ্গে দেখা হয়েছিল— তিনি বিশেষ অনুনয় সহকারে Goldstucker's পাণিনিখানা পড়তে চাইলেন, বারবার বললেন আমি কোন মতেই হারাব না। আমিও ওঁকে সে বইখানি দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি—

অতএব Babu Surendranath Tagore, 19 Store Road, Ballygunge, Calcutta ঠিকানায় উক্ত বই ভালরকম মোড়াই করে রেজেষ্ট্রী ডাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

ইংরেজি সোপান যেন আবার তোমার জন্য দেরী না হয়— তাগিদ রেখো— তোমার অবশিষ্ট অংশ লেখা শেষ কোরো।

ইস্কুলের খবর কি? ভূপেনবাবু চলে যাওয়াতে আশা করি বিশেষ মুস্কিল ঘটবে না! সত্যর খবর কি?

লাইব্রেরির র‍্যাকগুলো এই বেলা তৈরি করিয়ে নিয়ো— কুসুমাতুকে আমার নাম করে বোলো। আমার প্রাসাদ কতদূর এগোলো? ইতি মঙ্গলবার [২৫ ? অগ্রহায়ণ ১৩১৩]

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১১

২৭ মার্চ ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ

কল্যাণীয়েষু,

মহারাজের স্টেটে তুমি কর্মে প্রবেশ করিয়াছ শুনিয়া আমি অত্যন্ত সুখী ও নিরুদ্বিগ্ন হইলাম। সেখানে ক্রমশ উন্নতি লাভ করিয়া তোমার শক্তির পরিচয় দিবার ক্ষেত্র বিস্তার করিতে থাক এই আমি কামনা করিতেছি। আশা করিতেছি এই উপলক্ষে তোমার সমস্ত চেষ্টা উদ্বোধিত হইয়া তোমার জীবন সম্পূর্ণতর হইবে। তোমার এখানকার দেনা পাওনা সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া দিব।

আমি এখানকার গ্রাম্যসমাজ স্থাপনার চেষ্টায় এখনো আবদ্ধ আছি। ভূপেশের সহযোগিতা করিবার জন্য পূর্ববঙ্গ হইতে একজন উৎসাহী যুবক পাওয়া গিয়াছে। আশা হইতেছে এ কাজ সফল হইয়া উঠিবে। আর একটি যুবককে পূর্ববঙ্গে সমাজ গঠনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছি— সে ছেলেটিও ভাল— তাহার দ্বারা অনেক কাজ পাইব মনে করিতেছি।

বোটে আমরা ভালই আছি। গরম পড়িয়া আসিয়াছে। বৃষ্টির প্রত্যাশায় আছি— মেঘ করিয়া আছে কিন্তু বৃষ্টি হইতেছে না বলিয়া উদ্বিগ্ন আছি। বৃষ্টি অভাবে কেবল আবাদের নহে, স্বাস্থ্যেরও অপকার ঘটিতেছে।

আমেরিকার পত্র নিয়মিত পাওয়া যাইতেছে। সেখানকার সংবাদ ভালই। রথী সন্তোষের পড়াশুনা যথোচিত অগ্রসর হইতেছে। সন্তোষ যদি অশ্বপালন ও চিকিৎসা শিখিয়া আসিতে পারে তাহা হইলে বোধ করি তোমাদের মহারাজের অধীনেও তাহার উপযুক্ত কাজ জুটিতে পারে। তুমি তাহাদিগকে পত্র লিখিয়ো— তোমার দুঃসংবাদে তাহারা ব্যথিত আছে।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি ১৪ই চৈত্র ১৩১৪

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১২

২৭ জুলাই ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

আমার কি আর টানাটানি সয়? নড়তে গেলেই আমার আয়ুসুদ্ধ নড়ে ওঠে। এই ত শরীরের অবস্থা। তারপরে আজকাল বিদ্যালয়ের এত কাজে আমাকে নিযুক্ত থাকতে হয় যে অল্পকালের জন্যেও ছুটি পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

তারকবাবুকে দীর্ঘকাল দেখিনি বটে কিন্তু তাঁকে ভুলে গেছি এমন আশঙ্কা করবার কারণ নেই।

যদি শাখাপরিষৎ স্থাপন করবার উদ্যোগ কর তাহলে নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে দুই একজন কৃষ্ণবিষ্ণুকে টেনে আন্তে পারবে। ত্রিবেদী আছেন, ব্যোমকেশ আছে, হীরেন্দ্রবাবুকেও পাওয়া বোধহয় অসম্ভব নয়— এঁরা সকলেই আসর জমিয়ে তুলতে পারবেন। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাহিত্যপরিষৎ স্থাপন করা যে অত্যন্ত কল্যাণকর এ সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহমাত্র নেই— অতএব দূর হতে টেলিপ্যাথিক সহানুভূতির দ্বারা যদি তোমাদের সভার কোনো উপকার হয় তবে সে সম্বন্ধে কৃপণতা করব না।

পিসিমা রাঁচি গেছেন— সেখানে তাঁর শরীর ভালই আছে। ইতি ১১ই শ্রাবণ ১৩১৭

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১৩

২৯ জুলাই ১৯১১

ওঁ বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

আমি নানা জালে জড়িয়ে আছি সেইজন্যে যখনই একটু অবকাশ পাই তখনি কুঁড়েমি ধরে, কোনোমতেই সামান্য কোনো কাজেও হাত দিতে পারি নে। এমনি করে লোকের কাছে আমার নানা সামাজিক ঋণ বেড়ে চলেছে— সে আর শোধ দেবার প্রত্যাশা রাখি নে। তোমার লেখাটি সম্বন্ধেও আমার সেই বিপত্তি ঘটেছে। আজ খুব লজ্জার সঙ্গে ফিরিয়ে দিচ্চি।

বৌমা ও সন্তোষের মা কিছুদিন এখানে নেই। বৌমা তাঁর পিতৃভবনে এবং বৌঠাকরুন তাঁর ভ্রাতৃভবনে, আর সন্তোষ তার গোষ্ঠে।

আচ্ছা, এই বোলপুরের মরুভূমিতে এক জোড়া উট পালন করলে কি রকম হয়? ওরা ত কাঁটা গাছ খেয়ে কাটায়, এখানে সে রকম উদ্ভিজ্জের অভাব নেই— তপ্ত বালিও যথেষ্ট আছে। কিছু অল্প বয়সের জন্তু যদি কেনা যায় ত কত দাম লাগে, কোথায় পাওয়া যায় এবং সবসুদ্ধ এ প্রস্তাবটা সঙ্গত কি না আমাকে লিখে দিয়ো। লাথির চোটে আমার এখানকার ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে দেবে না ত? ওরা ত গাড়িও টানে— ভারও বয়, কাজে লাগে—আবার দুধও পাওয়া যেতে পারে— কেবল দেখতে সুশ্রী নয়— কিন্তু এখানকার মনুষ্যলোকে তার জুড়ি পাওয়া যাবে। যাই হোক্ সৎপরামর্শ দেবে।

এবারকার দরবারে যদি তোমার কাজ খালি হয় তবে আমি ঐ পদের প্রার্থী রইলুম। যদি ৭৫ টাকা আমার পক্ষে অতিরিক্ত বলে গণ্য হয় তাহলে আমি ৫০ টাকাতেই সন্তুষ্ট থাকব, এমন কি আরো কমে আমার আপত্তি নেই। বেতন এখানে মনি অর্ডার করে পাঠাবার যে ব্যয় তাও আমি ঘর থেকে দিতে রাজি আছি।

তোমরা সকলেই আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি
১৩ই শ্রাবণ ১৩১৮

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১৪
৩০ মার্চ ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

সুবোধ, তুমি নিশ্চয় অধ্যাপক বকিলকে জানো। ইনি কিছুকাল থেকে বিশ্বভারতীতে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করচেন। এঁর যে পরিমাণ বিদ্যা ও যোগ্যতা ও অপরপক্ষে সাংসারিক অভাব, আমরা বিশ্বভারতী থেকে তার অনুরূপ কিছু দিতে পারি নে। অথচ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি এঁর অভাব মোচন হয়। ইনি অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট— ইংরেজি কবিতা রচনায় খ্যাতিলাভ করেছেন— বোধহয় এঁর কাব্যগ্রন্থ বিলাতে শীঘ্র প্রকাশিত হবে। জয়পুর থেকে এডুকেশন বিভাগের যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েচে সেই পদের জন্যে বকিলের

মত যোগ্য লোক পাওয়া শক্ত হবে। এ বিষয়ে তুমি তাঁকে সাহায্য করতে যদি পারো তো কোরো।

শুনেছ বোধ হয় আমি চলেছি য়ুরোপে— ইংলণ্ডে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আছে। রথী বৌমাও যাবেন।

বৃষ্টি নেই, গরম পড়েছে, চাষ বন্ধ, জলাশয় শুকনো— ভাবনা ধরিয়ে দিয়েচে।

তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জেনো। ইতি ১৭ চৈত্র ১৩৩৪

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]
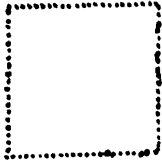
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

পশ্চিমসাগরের তীরে তীরে
দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চি।
সময় নাই, বিশ্রাম পাইনে।
এখানকার প্রকৃতির মুখচ্ছবি
সুন্দর, এখানকার জনগণের
চিত্ত আমার প্রতি
প্রসন্ন, আমার বাণী এদের হৃদয়ে
আশ্রয় পেয়েচে, এদের সুন্দর নাম-
গুলির মধ্যে আমার নামকে স্থান দান
করেচে এই আমার সৌভাগ্য।

SANTINIKETAN
27 SEP 26
7 30 A.M

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
Santiniketan
Bengal
India

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

*SANTINIKETAN
27 SEP 26
7' 30 A. M.

[জার্মেনী]

পশ্চিমসাগরের তীরে তীরে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চি। সমাদর পাই, বিশ্রাম পাই নে। এখানকার ধরিত্রীর মুখচ্ছবি সুন্দর। এখানকার জনগণের চিত্ত আমার প্রতি প্রসন্ন, আমার বাণী এদের হৃদয়ে আশ্রয় পেয়েছে, এদের স্মরণীয় নামগুলির মধ্যে আমার নামকে এরা গ্রহণ করেছে এই আমার সৌভাগ্য।

কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত

১

১০ নভেম্বর ১৯০২

বিনয়সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহাতে আমি বড় আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্তমনে কামনা করি ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ— ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে— সংযমের দ্বারা ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা শুচিতা দ্বারা একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্য্যব্রত।

ইহা ধর্ম্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিষই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে

এমন একটি জিনিষ দিতেন যাহা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এসব কার্য ফরমাসমতো চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায় গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এইজন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্য্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়— অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ-বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে— তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষাস্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা— এমনকি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব্ব করিতে

না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব— নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না— অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে। ·

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্ত্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে হেমেন্দ্রবাবুর পুত্র প্রেমানন্দের সৌখীন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে— সেটা দমন করিতে হইবে। বেশভূষা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও সৌখীনতা দূর করা চাই।

দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া লেখা স্নান আহার ও সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনপ্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোন ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড় কাচা

সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে— ও ব্যবহার্য্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সেই অংশ যেন প্রত্যহ যথাসময়ে যথানিয়মে পরিষ্কার তকতকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভালো হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনো মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোন ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোন অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার

যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। রন্ধন-শালায় বা আহারস্থানে হিন্দু আচারবিরুদ্ধ কোন অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

আহ্নিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যেভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে— তখনকার মত মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি— আমি এখন কেবলমাত্র কোন বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কি সূত্রে? কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ— যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে

ধ্যান করিব। সূর্য্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি— সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতারূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ— ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সঙ্কীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে— এইজন্যই আর্য্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্ব্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণ মেতৎ—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহাতে আমি বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। একান্তমনে কামনা করি ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ— ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্ব লাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে— সংযমের দ্বারা ভক্তি শ্রদ্ধার দ্বারা শুচিতার দ্বারা একাগ্র নিষ্ঠাদ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগসাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত।

কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত পত্র

প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্ম্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গে-সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সকলে সমস্বরে 'ওঁ পিতানোঽসি' উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ্যমাত্র কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়, সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়— সেইজন্যই ঐ মন্ত্রে আছে

"বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।"

'হে দেব, হে পিতঃ, আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর।'

ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্ম্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্ব-লাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

বক্তৃতাদিতে অনেক সময়েই চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্ম-সাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদকসেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্ব্বল্য-জনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এইসকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়— ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মত না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতিবশতঃ নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোন মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন তো ভালই হয়।

এক্ষণে, আপনার কার্য্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক।

মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দ্দেশমতে বিদ্যালয়ের কার্য্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্দ্ধারণ তাঁহারা

করিয়া দিবেন—যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

বিস্তালয়ের ভৃত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতননির্দ্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসর দান তাঁহাদের পরামর্শমত আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্ত্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিষপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিষপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনো জিনিষ নষ্ট হইলে হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমাখরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

তাহাদের জিনিষপত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্ম্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে রান্নাঘরে ও তাহার চতুর্দ্দিকে, পায়খানার কাছে কোনরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

গোশালায় গরু মহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সেজন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংশ্রব প্রার্থনীয় নহে। জিনিষপত্র ক্রয়, বাজার করা, ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে— কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।

ঠিকা লোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দ্দারকে বা মালিদিগকে, রবীন্দ্র সিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিয়োপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের যখন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমসম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে— বা সেখানকার ভৃত্যদের কোন দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্ব্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন !

মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তি-নিকেতনের অতিথি অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোন ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন— আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোনো আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দ্দিষ্টদিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোষ্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

পোষ্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব

রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

কোন বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

কোন ছাত্রের অভিভাবক কোন বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্রদিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গোরু মহিষ যে দুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনো বই পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিষপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর

অনুমতি লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

—

উপস্থিতমত এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশ আবশ্যকমত ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয় চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বতঃউৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোন অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্ম্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম্ম যেমন আমার, তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম্ম— এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকালপূর্ব্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে

পারিতাম না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্ম্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা— ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য— অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারো উপর চাপানো যায় না— এবং এসকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্ব্বাপেক্ষা হেয়।

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই— বর্ত্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি— সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্ম্মের যথেষ্ট অসঙ্গতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্ত্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধাবিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারও কাছে বেশি কিছু দাবি করি না, সর্ব্বদা আমার,

উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্ব্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না— কালের উপর, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্য্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায় কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটখাট অভ্যাসদোষ এ সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে— এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্য্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত কার্য্যে যথার্থ গৌরব আছে, অবমান নাই— এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এইসমস্ত সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাস করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকট কোন আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে— ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সঙ্গত ও সুবিধাজনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভাল হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখী মাছ ও ছোট জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখী খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্য্যের সহিত মুক্ত পাখীদিগকে বশ করানোই ভাল। শান্তিনিকেতনে

কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালীদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা এ সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোন বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোন ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেষণ করে। প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়— যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে— নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমত জল দিয়াছে কি না পর্য্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনপ্রকার সঙ্কোচ অনুভব করিবে না।

ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেষণ করিলে ভাল হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেষক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্ত্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভাল হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্বেগের মধ্যে আছি এজন্য সকল কথা ভালরূপ চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি

সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

আপনার প্রতি আমার কোন আদেশ নির্দ্দেশ নাই; আপনি সমবেদনার দ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণকামনার দ্বারা কর্ত্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

ইতি ২৭শে কার্ত্তিক ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট ১

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর পত্র

বর্তমান পরিশিষ্ট-ভাগে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারখানি পত্র এবং মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর একখানি পত্র সংকলিত হল।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয়-অংশের শেষে তাঁর আর একখানি পত্র এবং গ্রন্থপরিচয়-অংশে ধৃত প্রসঙ্গসূত্রে আরো দু-খানি পত্র ব্যবহৃত হয়েছে। পরিচয়-অংশে যে পত্রখানি মুদ্রিত, তার উত্তরে, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তাঁর তৎকালীন অন্যতম একান্তসচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী যে পত্র লিখেছিলেন, প্রাসঙ্গিক বোধে এই পরিশিষ্ট অংশের শেষে তা সংযোজিত হয়েছে।

সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষের রবীন্দ্রনাথকে লিখিত কোনো পত্র পাওয়া যায় নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত সাতখানি পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে।

ওঁ

সম্বলপুর
মহরম
বৃহস্পতিবার

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আসল চেষ্টাটা আপনার দুটো কথা শোনা। কিন্তু সম্বলপুর কারাগৃহটি এমনিতর হয়েচে যে দু একদিন ছুটি করে যে ইদিক সিদিক একটু নড়ে চড়ে আসি তার যো নেই। কাজ-কর্ম্ম বড়ই কম তার উপর উকিলের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে ২ দালাল সৃষ্টি—সুতরাং সম্বলপুরের মতন ছোট জায়গায় স্বাচ্ছন্দ্যের আশা একরকম মরুভূমে মরীচিকার মতন দুরাশায় পরিণত। ফলে হয়েচে এই যে শত ইচ্ছা সত্ত্বেও ছুটিছাটার সময় আপনার সঙ্গে একবার দেখা সাক্ষাৎ করে 'কণ্টকময় সংসার' পথের কিছু "পাথেয়" সংগ্রহ করে আনবো তার সামর্থ্য থাকে না। অনেকজন্মের পুণ্যফলে কোন অজানা জলাভূমির উৎপাটিত শুষ্ক তৃণদলের মতন ভেসে এসে পাদপ্রান্তে জড়িয়ে পড়েছিলুম। সে গৌরবের স্থানটা বুঝি রাখতেই পারি না। আজ একবার বসে বসে আপনার পুরোনো চিঠি খানকতক ওলটপালট করে দেখছিলাম। তার মধ্যে বহু পূর্ব্বের একখানা ভর্ৎসনারও চিঠি পেলুম। যে সময় সেটা পেয়েছিলাম সে সময়ে মনের অবস্থার কথা এখন মনে নাই। কিন্তু আজ সেখানা পড়ে নিজের ওপর কি যে ধিক্কার অনুভব কল্লুম তা বলতে পারি নে। মনে হল মাথাটা যেন ছিন্ন হয়ে ধূলিতে

লুটিয়ে পড়লো। তার প্রতি অক্ষর সত্য, প্রতি অক্ষর fully deserved ত বটেই। কিন্তু সেভাবে ভর্ৎসনা কর্ত্তে কেউ পারে বলে ত আমি জানি না। তার সংযম, তার উদারতা, তার হৃদয়বানতা তার natural dignityর সমুখে I felt like one overpowered,— annihilated! আপনি কি সকলের সঙ্গেই— আমার মত সকল নগণ্য অপদার্থদের সঙ্গে ব্যবহারেতেই আপনার এই সংযত উদার মহাপ্র[া]ণতার পরিচয় দিয়ে এসেচেন— না আমার সহস্র জন্মের সঞ্চিত পুণ্য আমাকে এ গৌরবের অধিকারী করে দিয়েচে?

উদার হৃদয়ের এক কোণে একটু আমার স্থান রাখবেন মহাশয়। প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হয়ে এল। জীবনে কাউকে যে বাঁধতে পেরেছি বলে মনে হয় না। যদি ধরা দিয়েছেন, আর ছাড়াবেন না। মহাপ্রাণের এক কোণে একটুখানি জায়গা ছেড়ে রাখবেন।

জানেন মনোরঞ্জন খোসামুদি জানে না। এ ভাষা তার প্রাণের mother tongue না হলে তার লেখনীতে বজ্রপাত হোতো।

ভবদীয়

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

4/6/19

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু—

মহাশয়

আজ Statesmanএ Viceroyকে প্রেরিত আপনার চিঠীর মর্ম্ম প্রকাশিত দেখিলাম। মহাকবি, ব্রাহ্মণ, আজ আপনি মরুময় ভারত মহাদেশে বলদৃপ্ত অসুর প্রবৃত্তির অন্ধ আস্ফালনের সম্মুখে তাহার সমস্ত পাশবশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণোচিত ভাষায় তাহাকে যে তিরস্কার করিয়াছেন তাহা সে পশুশক্তিকে লজ্জিত করুক আর নাই করুক, সে ভাষা আজ সুষুপ্ত দেবলোককে দীর্ঘকাল অশ্রুত যথার্থ মানবীভাষার ঐশী ঝঙ্কারে জাগাইয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। মহাশয় বহুদিন কাষ্ঠ পাষাণে ব্রহ্ম আরোপ করিয়া তাহাকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। মানুষকে কিন্তু দেবতাজ্ঞানে তাহার সকলপ্রকার অপকর্মকে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিয়া লইবার মত "discipline" বা তাহার সমস্ত "Communiqueকে" দৈববাণী বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইবার প্রবৃত্তি অন্তরাত্মা পোষণ করিতে শেখে নাই। আপনার পত্রের শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে Lord Hardinge আজ Viceroy থাকিলে নরকরাগরঞ্জিত মহাদুর্নীতির তাণ্ডব অভিনয় মানব ইতিহাসকে কলুষিত করিতে পারিত না। এমন দিনকাল পড়িয়াছে যে মানুষের দুঃখে মানুষ দুঃখ প্রকাশ করিবার অধিকারও বুঝি

হারায়। অন্ততঃ ভারতবাসীর এ বিষয় অত্যন্ত সাহসের অভাব দেখিয়া সে সে পথেও মহাশাসনের একটা আশঙ্কা করে বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে একান্ত স্বাভাবিক, হৃদয়ের এ ভাষা আপনার মুখেই প্রথম বাহির হইল তাহার কারণ কি। O Duyer এর নিমিত্ত 'farewell address' 'manufacture' করিলেই কি সত্যটা নিজেকে ভুলিয়া মিথ্যা হইয়া উঠিবে। ভারতবর্ষের কি এমনি দুর্দ্দিন আসিয়া পঁহুছিয়াছে? নাকি কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষে ভারত কর্ম্মচারীরা এমনি করিয়াই ধূলি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবে। ভগবানকেও ভুলাইবে।—

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওঁ Sambalpur, B. N. R.
Dated 8. 6. 40

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রায় দেড়মাস ভুগিয়া আজ তিন দিন হইল রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছি। আবার জীবনসংগ্রামে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে আপনার নিকট হইতে চিরবাঞ্ছিত প্রীতি ও স্নেহসংস্পর্শ প্রার্থনা করি।

সংবাদপত্রে আপনার সংবাদ মোটামুটি পাইয়া থাকি। মাংপুতে আপনার শরীর অপেক্ষাকৃত ভালই আছে সংবাদপত্রে সম্প্রতি দেখিয়াছিলাম।

আশা করি ভালই আছেন। বহুদিন আপনার সাক্ষাৎ পাই নাই। কতদিনে আবার কলকাতায় ফিরিবেন ?

আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

ভবদীয়

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওঁ Sambalpur, B. N. R.

Dated 11. 12. 40

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আগামী Xmasএর ছুটীতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা গত কয়েকমাস হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছি। ইতিমধ্যে আপনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। এ সময় আশাকরি আপনার পার্শ্বচরেরা কোনো ব্যবধান উপস্থিত করিবেন না। বহুকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। দূরে থাকি, সুবিধামত সময় করিয়া উঠিতে পারি না, আশাকরি আপনার পার্শ্বচরেরা যে Interdict কাগজেপত্রে জারি করিতেছেন তাহা আমাতে প্রযোজ্য হইবে না। আপনি যে জানিতে পারিলে নিশ্চয় সে অনুমতি দিবেন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। সেইজন্য এই সঙ্গে আপনার নিকটস্থ incharge ভদ্রলোকদিগকে সবিনয় অনুরোধ করি যে আমার ইচ্ছা

আপনাকে জ্ঞাপন করিয়া আমার পত্র আপনাকে দেখাইয়া আমাকে আপনার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

আমি আপনার অনুমতিপত্রের আশায় রহিলাম। Xmas ছুটি 22nd আরম্ভ। এর মধ্যেই যেন অনুমতি পাই, ইতি

ভবদীয়

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন

১।৭।৪১

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবিনয় নিবেদন

আপনার ২০।৬।৪১ তারিখের চিঠি পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে পড়িয়া শোনানো হইয়াছে। আজ কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা মোটেই ভালো যাইতেছে না, সে জন্য এখানে সকলেরই মনে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। স্বাস্থ্যের এরূপ অবস্থাতেও তিনি চিঠির বক্তব্য, এবং তাঁহার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা নিবেদন এই দুয়ের জন্যই আপনাকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইবার জন্য আমাকে নির্দ্দেশ দিলেন। তাঁহার ডান হাতের আঙুলে বাতজনিত বেদনা এবং দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতাহেতু স্বহস্তে কাহারো সহিত পত্র-ব্যবহার করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়াছে। এই কারণেই আপনার চিঠির জবাব স্বহস্তে দিতে পারিলেন

না বলিয়া তিনি দুঃখিত। কিন্তু তিনি আশা করেন আপনি এজন্য তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।

আজ কলিকাতার কয়েকজন চিকিৎসক তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আসিয়াছেন। অতঃপর কিভাবে তাঁহার চিকিৎসা করা হইবে সে বিষয় তাঁহারা বিবেচনা করিবেন।

আপনি আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি ১।৭।৪১

বিনীত

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

পরিশিষ্ট ২

Monoranjan Bandyopadhyay :
Santiniketan Reminiscence

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় :
আমার পরিচয়

SANTINIKETAN REMINISCENCE
A VIGNETTE

Manoranjan Bandyopadhyay

THE POET

It is always a pleasure to think and talk about great men and their ways, for in their greatness and goodness we see the sunny side of our common human nature reflected in its colourful beauty. Reading recently in the pages of Visva-Bharati News Mr. Khitibhusan [Kshitimohan] Sen's contribution regarding Dr. Tagore's personality, I seem to have caught an infection which urges me to add a word or two of mine own to enliven the portraiture.

It was years ago when I met the Poet at Santiniketan at close quarters. Before that I had often heard of him and read his poetry— and who had not— but that was my first rencontre. He required no pointing out, for his pictures were so common and so broadcast that a look showed the original of the copies which I had so often seen and known.

On my first presentation to him I don't

remember to have talked with him. The distance between us was so great and the bridging of it was not yet [done]. I saw the lion in his lair—distantly admired his personal charms and left.

Within a month or two chance brought me into closer touch with him.

One thing, I believe, is common to all really great men. It may be a fanciful standard of mine but I believe, there is a psychology behind it. On your approaching a really great man you don't feel out of place in his society. However humble you may be, one undefined look of cordiality from him makes you feel that you are welcome. His heart is too broad to lack room for a fellowman who comes to do him honour.

Rabindranath was one of those elect. Believe me when I say that I have seen men justly high in reputation for learning & intelligence but so self-conscious, narrow and self-centred that you feel scared at their proximity.

So I felt quite at home with him within the first few hours of my acquaintance with him. Though my place was one of subordination to him, I never had reason to feel the existence of the yoke. I served him almost because I loved

him. If I may be permitted to use that bold expression from the place where I stood.

They from outside talked of him in those days as a man of the fast and jolly set. His age, his wealth, his position in life, his personal charms and his sentimental leanings as reflected in his poems— the age of নৈবেদ্য had not yet come— gave a plausible colour to such gossips. In fact on my first visit to Santiniketan before I met the Poet I was told by a grown-up young man of Raipur family that on Hat-days when men and women came in large numbers to the Bolpur Hat, the Poet sat in a niche carved on the side of a hummock on the road side near the Santiniketan temple and played on his flute!

You may know a man for years but still you may know very little of him. But you live with him in intimate association day and night except the sleeping hours, in a month's or two months' time you know him through and through. That is at the root, I believe, of the English expression "No man is hero to his own valet." I had that chance and when within a short time I came back to the society of the senseless gossipers I could offer to swear with my person dipped into the Ganges to my

neck that Rabindranath in that respect was sterling gold. Vulgarity or anything vile never did or could cast even a passing shadow on him.

He was no prig but he was never risque. I remember once when talking pleasantly about his financial stringency in his new educational venture, he told us a story of an offer of a marriage in his younger days from a Madras Millionaire— was it Bobili ?—how he was introduced to his bride to be— or rather his bride not to be— and her mother somewhere I forget. He described all that passed in that meeting with such an amount of pleasant and inimitable humour that at the end of it we felt refreshed and uplifted as after a breezy walk across a moonlit world.

His power of conversation was unique in its impressiveness in matters both grave and gay. He could discuss for hours with pundits on serious topics with a charm of depth and spontaniety which was a treat to hear. He was not less at home with children hardly above eleven or twelve which was the maximum age of our alumni in those days. In fact, I have known of children shunning the society of their playmates of their own accord to hang upon his honeyed words.

Babu Akshay Sarkar was a literary man of high repute — an associate and contemporary of the great Bankim. He was far above Rabindranath in age. He used to address him as Rabi. Rabindranath had been once talking serially of the great story of the Mahabharata for the education and delectation of the school children. We used to join up to listen, so did Babu Akshay Sarkar. Some days later when I met him at Chinsurah he told me with a feeling of deep appreciation that he had heard men without number— and professional men too— talking of the Ramayana and the Mahabharata stories— but till he heard Rabindranath he never knew how charmingly these stories could be told. He said that he had been to Santiniketan for a day's stay only but the great story-teller captivated him and he could not leave the place till he finished after sixteen days.

Rabindranath was nature's gentleman, true to the culture and tradition of his family. I know of a man in sudden distress who wanted a loan of Rs 400/- for a short period. The man was poor. There was no security of repayment. He went to see the Poet all right but he could not venture to broach the subject. The kind-hearted man instinctively felt that his visitor

was not easy in mind. He heckled him for the cause in his sweet, sympathetic way till the man mumbled out what he needed. At once came the angelic assurance that there was no need to lose peace of mind over the matter and in ten minutes time four hundred rupees in currency note were thrust into his pocket by his son in the secrecy of an adjoining chamber. How many others might have been benefited in the same secret fashion the grateful hearts may know, but it can be truly said of the poet that his left hand never knew the benefactions his right hand gave. I am told this visitor paid back the loan in time.

One other incident comes uppermost to my mind at the present moment. I had been to Malda side on a private affair of mine. On my return journey I reached Bolpur early morning at about 3-30 A. M. I could not resist the temptation of seeing my old place and the tutelary deity thereof. I broke my journey and walked up to Santiniketan. It was still dark. I treaded my way to the small double-storied attic in which the poet lived in those days. I had noiseless shoes on. I looked in at the lower storey. The doors and windows were all open but the poet was not there. So I went

softly up the stairs because it was still sleeping time. I had hardly reached the first landing on the stairs when what do you think I beheld? It was a sight for the gods to see. On the small open veranda I found an old-world Rishi incarnate seated on the floor in deep meditation. I stopped there and looked on for full fifteen minutes when what looked like a trance was over. The poet's age was nearer to forty than fifty in those days.

I would not multiply instances which can be found galore in the good man's life.

I will turn now to another side of the picture. With all his greatness the poet was not a god. He had his failings and one of them I would mention. With all his intelligence he at times, yielded to secret insinuations of tell-tale sneaks. He invariably cast off the obsession and asserted his normal self in a short time, but for the time being, to use his own expression, he acted as one possessed.

A certain individual once happened to speak against me to him in private. He was deeply annoyed but would not tell me why. Every morning at prayer time we met before we dispersed to our classes. His sweet, smiling greetings were our encouragement and asset for

the day. I missed them. The poet somehow avoided me. The same was repeated in the evening too. I felt upset. With my helpless poverty, however, there was a modicum of pride in me. My heart declined to stay on such condition. When on the next morning too, I found the shadows still lowering on his countenance, I made up my mind to make up or break away from the place which was no longer a place for me. After the morning classes were over I packed up my little belongings and prepared to leave the place by the afternoon train if matters did not improve in the meanwhile. At about 2 P. M. I sought him out in his study where he was alone, writing. My manners at the time were abrupt and unceremonious; because I was desperate. He looked up at me from his papers and waited for me to begin. I began with vehemence demanding the reason for the change in him. I do not remember what I said. The clouds seemed to lift a little. He gave me the cause. The report was all false and I at once demanded to be confronted with the man, the reporter. The downright honesty of my challenge seemed to have a palliative effect on him. There was a returning flicker of cordiality in his looks,

the tension was relaxed. He would not confront me with that man but he assured me that he believed me. It took some time before he returned to normal.

Any other man in similar circumstances would have dealt with me differently. But here the heart was sound and though at times it got warped, it was not dead and never damaged. After all he was a man and what man is there without his failings. But in spite of his failings of this nature, which bore the guinea stamp of truly greatman's failings,.... never led him to do a wrong to his fellow-man. His nature was supremely adorable and I, for one, small and insignificant as I am, have ventured to nurse the memory of my association with him as the greatest gift and noblest asset of my life.

Sambalpur
August 15, 1939.

আমার পরিচয়

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

...দূর পল্লীগ্রামে ছাত্রজীবনে যখন আমি তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যার্থী, তখন কোন সুযোগে কবিবরের নিকট হইতে আমি মাসিক কিছু বৃত্তি পাইয়াছিলাম। আমি দরিদ্রের সন্তান, সুতরাং এই বৃত্তি তখন আমাকে যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ ও কত আশা দিয়াছিল, তাহা অনুমানেরই বিষয়, বলিবার কথা নয়। আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, এই বৃত্তিই তাহার মূল দৃঢ় করিয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা কিছু বিদ্যালাভ করিয়াছি, এই বৃত্তিই তাহার ভিত্তি।

কলেজে তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করিতে করিতে, আমার ছাত্রজীবনের শেষ ও সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনের সূত্রপাত হয়। আমি দরিদ্র, সুতরাং সহায় সম্পত্তির বলে কার্য্য জুটাইয়া লওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। নিজের যাহা কিছু বিদ্যা ছিল, তাহারই বিনিময়ে পল্লীগ্রামে ও পরে কলিকাতার বিদ্যালয়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া আমি সেই সময়ে পিতার দুর্ভর সংসারভার-বহনের ক্লেশ কিঞ্চিৎ উপশমিত করিতে লাগিলাম। আমার দাদা (পিতৃষ্বসার পুত্র) শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাটীতে সদর বিভাগে খাজাঞ্চির কার্য্য করিতেন। সেই সূত্রে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার অফিসে যাইতাম এবং তাঁহার মুখে কবীন্দ্রের

বিদ্যোৎসাহিতা ও বিদ্যানুরাগিতার কথা এবং কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা তন্ময় হইয়া শুনিতাম। একদিন জোড়াসাঁকোর বাটীতেই দাদার মুখেই কথায় কথায় শান্তিনিকেতনের ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রমের কথা শুনিলাম। ছাত্রজীবনে আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আমি যেখানেই যে কার্য্যেই থাকি না কেন, বিদ্যালোচনা— বিশেষত সংস্কৃতের চর্চ্চা— আমি কখনও ত্যাগ করিব না। এইজন্যই আমি সর্ব্বদাই শিক্ষাবিভাগের কার্য্যেরই পক্ষপাতী ছিলাম। দাদা বলিলেন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপকেরা পরম সুখে অধ্যাপনা করেন— প্রভুর সমদর্শিতায় তাঁহাদের সেবাবৃত্তি শ্ববৃত্তি বলিয়াই বোধ হয় না, অধ্যাপনাদি সকল কার্য্যেই তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আহারের বিষয়ে পরাধীনতা থাকিলেও, তাহা সুখকর ও স্পৃহণীয়, কারণ শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের মনস্বিনী জননী প্রত্যহই নিয়মিতভাবে সুখভোগ্য অন্নব্যঞ্জনাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। শিক্ষকতায় পরাধীনতার তীব্র আস্বাদের সহিত আমি পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত ছিলাম, সুতরাং ঐরূপ স্পৃহণীয় বিষয়ের বিবরণ শুনিবামাত্রই, আমার মনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপনার স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু আমার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প, আমি 'হংসমধ্যে বকো যথা', সুতরাং, আমার সে আশা উদ্‌বাহু বামনের প্রাংশুলভ্য ফলপ্রাপ্তির আশার ন্যায় নিতান্ত উপহাসাস্পদ, ইত্যাদি নানা প্রকারে, নিজ বিদ্যার অযোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়া আমি মনকে অতিকষ্টে নিবৃত্ত করিলাম— তখন জানিতে পারি নাই যে, আমার ভাগ্যবিধাতা আমার অলক্ষ্যে 'তথাস্তু'

বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় আমার সেই অলীক আশা সফল করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরে, আমার দাদা একদিন কবিবরের নিকটে তাঁহার পূর্ব্ব প্রদত্ত বৃত্তির উল্লেখপূর্ব্বক আমার পরিচয় দিয়া, মফস্বলে আমার জন্য একটি কার্য্যের প্রার্থনা জানাইলে, কবিবর তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করেন এবং তদানীন্তন সদর নাএব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া, আমাকে মফস্বলে কোন একটি কার্য্যে নিযুক্ত করার অনুমতি দেন। ইহার কিছুদিন পরেই আমি কার্য্য পাইলাম— আমি কালীগ্রাম পরগণার সদর কাছারি পতিসরে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হইলাম। তখন শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার কালীগ্রামের ম্যানেজার ছিলেন। ১৩০৯ সালে শ্রাবণের প্রথমে আমি সুপারিন্‌-টেণ্ডেণ্টরূপে সদর কাছারি পতিসরে উপস্থিত হইলাম। তখন ভয়ানক বর্ষা। পতিসরের চারিদিকে দিগন্তব্যাপী প্রান্তর বর্ষার প্লাবনে একাকার হইয়া গিয়াছে— কোথায়ও কিছুই দেখা যায় না, কেবল বহুদূরব্যাপী নিমগ্নপ্রায় হরিৎ ধান্যশীর্ষ-সমূহ, আর সেই সবুজ সাগরের মধ্যে দূরে দূরে দূর হইতে পুঞ্জীভূতরূপে প্রতীয়মান তৃণাচ্ছাদিত গ্রাম্য গৃহসমূহের পঞ্জরনিকর। এইরূপ ভীষণ বর্ষায় ম্যানেজারবাবু আমাকে মফস্বলে যাইতে দিলেন না— আমি কাছারিতে থাকিয়াই কিছু কিছু কার্য্য করিতে ও শিখিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। কবিবর সেই সময় জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। একদিন কর্ম্মচারীদের নিকটে শুনিলাম শ্রীযুত বাবুমশায় (অর্থাৎ

কবিবর) শিলাইদহে আসিয়াছেন, দুই এক দিনের মধ্যেই জলপথে এখানে আসিবেন। প্রভুর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎকার হইবে ভাবিয়া, আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম। পরদিন শুনিলাম, শ্রীযুত বাবুমশায় আসিয়াছেন, অদূরে বোটের মাস্তুল ধান্যশীর্ষ ভেদ করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে, অবিলম্বেই বোট ঘাটে আসিয়া লাগিবে। সকলেই দেখা করিবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন, আমিও দেখাদেখি প্রস্তুত হইলাম। এদিকে যথাকালে বোট পতিসরের ঘাটে আসিয়া লাগিল। কর্ম্মচারীরা পদগৌরবানুসারে অগ্রপশ্চাদভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বোটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—আমিও গতানুগতিকের ন্যায় তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। সকলেই ক্রমে ক্রমে বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যথারীতি প্রভুর পাদবন্দনাদি করিলেন, আমিও সামাজিক নিয়মে সবিনয়ে ভক্তিভাবে নমস্কার করিলাম। আমি নূতন কর্ম্মচারী, সুতরাং, প্রথম সাক্ষাৎকারে আমার সহিত বিশেষ কথোপকথনের সম্ভাবনা নাই—দুই একটি কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর, আমি বিদায় লইয়া আমার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন—'বাবুমশায় আপনাকে ডাকিতেছেন, আসুন।' আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে বোটে গিয়া বাবুমশায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি স্বাভাবিক সস্নেহে মধুর বাক্যে আমাকে বসিতে অনুমতি দিলেন, আমি বসিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এখানে কি কর?' আমি বলিলাম, 'আমিনের সেরেস্তায় কাজ করি।' ইহার পরে তিনি বলিলেন, 'দিনে

সেরেস্তায় কার্য্য কর, রাত্রিতে কি কর?' আমি বলিলাম, 'সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ সংস্কৃতের আলোচনা করি ও কিছুক্ষণ এক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া press-copy প্রস্তুত করি।' পাণ্ডুলিপির কথা শুনিয়া বাবুমশায় উহা দেখিতে চাহিলেন। আমি ঘরে আসিয়া উহা লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। কিছুক্ষণ বইখানি দেখিয়া, কবিবর আমাকে ফিরাইয়া দিলেন, কিছুই বলিলেন না। আমি বিদায় লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

এইরূপে পতিসরের কাছারিতে আমার শ্রাবণ মাস অতীত হইল। ভাদ্রের প্রথমে একদিন ম্যানেজারবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবুমশায় আপনার নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, 'শৈলেশ! তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্ম্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও।' এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?" বলা বাহুল্য, আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমার স্বভাবের অনুরূপ হয় নাই, সুতরাং ম্যানেজারবাবুর নিকটে ঐরূপ অচিন্তিত সুসংবাদ শুনিয়াই আমি আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলাম, ভাবিলাম আমার আন্তরিক প্রার্থনা বুঝি পূর্ণ হইতে চলিল। আমি প্রস্থানের জন্য সজ্জিত হইয়া, বিদায় লইয়া, নৌকায় আত্রাই ষ্টেশনে পঁহুছিলাম এবং রাত্রি (বোধহয়) দশটার মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কার্য্য থাকিলে, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমি কলিকাতায় অপেক্ষা করিলাম না, পরদিনই প্রাতঃকালের ট্রেনেই শান্তিনিকেতনে আসিয়া

গুরুদেবের সহিত দেখা করিলাম। ডাক্তার কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী তখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ম্যানেজার ছিলেন। গুরুদেবের সঙ্গে আমি তাঁহার কাছে আসিলাম, গুরুদেব পরিচয় করাইয়া দিলেন। এতদিনে আমার আশার ফল ফলিল— আমি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক হইলাম। কিছুদিন অধ্যাপনার পরে, একদিন গুরুদেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরিচরণ! তুমি কি এই স্থানেই অধ্যাপনা করিবে, না পতিসরে ফিরিয়া যাইবে?' আমি উত্তর করিলাম, 'এই আশ্রমের কার্য্য আমার ভালই লাগিতেছে— আমি পতিসরে যাইব না।' গুরুদেব সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন, 'বেশ! তবে এইখানেই থাক।' আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তদবধি আমি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

আমি যখন কলেজের বিদ্যার্থী ছিলাম, সেই সময়ে পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট কাব্যাংশ ভিন্ন অন্য সংস্কৃত কাব্যের সহিত আমার পরিচয় হয় নাই। কোন সংস্কৃত কোষের বা পাণিনির পূর্ণ মূর্ত্তি আমি কখন দেখি নাই— মল্লিনাথের টীকায়ই খণ্ডিতরূপ কোষাংশ, সূত্রাংশ দেখিয়াছিলাম মাত্র। সুতরাং, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুস্তকালয়ে সম্পূর্ণমূর্ত্তি সংস্কৃত কাব্য কোষ ও পাণিনি দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। আমি উৎসাহের সহিত ঐ সকল পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম এবং ক্রমশঃ অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টার ফলে নূতন নূতন বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এই সময় গুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে বালকগণের অধ্যাপনার্থ

আমি 'সংস্কৃতপ্রবেশ' রচনা করিতে আরম্ভ করি। এই পুস্তক রচনার সময়ে, একদিন কবিবর কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বাঙ্‌লা-ভাষার অভিধান রচনার কথা বলেন। 'সংস্কৃতপ্রবেশ'-এর তিন খণ্ডের রচনা শেষ করিয়া, আমি গুরুদেবের কথানুসারে ১৩১২ সালে অভিধানের কার্য্য আরম্ভ করি। অভিধানের কার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, ১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে আর্থিক অসঙ্গতির জন্য আমাকে কলিকাতায় কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। এই সময়ে সঙ্কল্পিত অভিধানের কার্য্য একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। অভীষ্ট বিষয়ের ব্যাঘাত জন্য বেদনা সুতীব্র ও মর্ম্মস্পর্শী হইলেও আমার এই দুঃখ-নিবেদনের স্থান আর কোথাও ছিল না— কেবল, অবসরক্রমে মধ্যে মধ্যে যোড়াসাঁকোর বাটীতে গিয়া গুরুদেবের নিকটে মনের বেদনা জানাইয়া গুরুভার কিঞ্চিৎ লঘু করিয়া আসিতাম। সহৃদয় মহাত্মার নিকটে কোন সদ্বিষয়ের নিবেদন ব্যর্থ হয় না,— আমার দুঃখের নিবেদন সার্থক হইল— গুরুদেবের মন টলিল— তিনি কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অভিধানের বিষয় জানাইয়া, বৃত্তির কথা বলিলেন— মহারাজও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিবেন, স্বীকার করিলেন। এইরূপে আমার অর্থসমস্যার মীমাংসা হইলে, গুরুদেব দেখা করিবার জন্য আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার নিকটে বৃত্তির ব্যবস্থার কথা শুনিলাম। আমি সর্ব্ব-প্রকারেই নগণ্য, আমার জন্যই কবিবর ভিক্ষুবেশে অর্থ প্রার্থনা করিয়াছেন, এই চিন্তা করিতে করিতে আমি তাঁহার

চরিত্রের মহত্ত্বে ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম— আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদনের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বাষ্পকলুষকণ্ঠে ভাষা ফুটিল না— কেবল অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম— বিগলিত অশ্রুধারা মনের ভাব ব্যক্ত করিল, আমি নত হইয়া পদরজ মস্তকে ধারণ করিলাম। আমার হৃদয়গত ভাব কবিবর বুঝিতে পারিলেন— ধীর সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন, 'স্থির হও, আমি কর্ত্তব্যই করিয়াছি।' আমি আর কিছুই বলিলাম না, ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েকদিন পরেই, গুরুদেবের অনুমতি লইয়া, আমি পুনর্ব্বার শান্তিনিকেতনে আসিয়া কার্য্য গ্রহণ করিলাম এবং মহারাজের বৃত্তিলাভে উৎসাহিত হইয়া, বহুদিনের পরে, অভিধানের কার্য্যে পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে থাকিলাম। এই সময়ে গুরুদেব একদিন অভিধানের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'মহারাজের বৃত্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, ইহার সমাপ্তির পূর্ব্বে তোমার মৃত্যু নাই।' কবিগুরুর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে— ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া, ১৩৩০ সালে এই বৃহৎ গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছি।...

গ্রন্থপরিচয়

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭১-১৯৫০) হুগলি জেলার চুঁচুড়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জ্ঞাতিভ্রাতা। ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের সহায়তাকল্পে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রহ্মবান্ধব মাঝে মাঝেই শান্তিনিকেতনে আসতেন। সেই সময় একবার, সম্ভবত সে বছরের পৌষ বা মাঘমাসে, তাঁর সঙ্গে এসে মনোরঞ্জনও কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে বাস করে যান— তখনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি সে-সময় সদ্য ওকালতি পরীক্ষা দিয়েছেন। এর অল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "মনোরঞ্জনবাবুকে আমার বিদ্যালয়ে বদ্ধ করিতে পারিলে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিব। তিনি আইনে পাস হউন্ বা না হউন্ এক বৎসর এখানে কাজ করিয়া যান্ তাহাতে আমার অনেক সাহায্য হইবে। কারণ, তিনি অভিজ্ঞ শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যাপারে তাঁহার কাছ হইতে আমি অনেক তথ্য লাভ করিতে পারিব। প্রথম হইতেই আমি তাঁহার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিলাম— সেইজন্যই আশঙ্কা হইতেছে তিনি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।"

মনোরঞ্জন আইন পরীক্ষায় সেবার অকৃতকার্য হয়েছিলেন। এর পর রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সম্ভবত ১৩০৮ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০২), ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি কৃতবিদ্য শিক্ষক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে যোগ দেবার আগে মনোরঞ্জন একাধিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে তিনি স্থায়ী হতে পারেন নি, বৎসর-খানেক মাত্র এখানে অধ্যাপনা করে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০৩) মনোরঞ্জন অস্বাস্থ্যের কারণে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান।

অধ্যাপনাবিষয়ে নৈপুণ্য ও নিষ্ঠার ফলে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আস্থাভাজন হয়েছিলেন। তাঁর বিদায়গ্রহণকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের

ক্ষতিরূপেই মনে করেছিলেন।[1] ত্রিপুরার কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ১৯ চৈত্র এ-বিষয়ে লিখছেন, "আমাদের বিদ্যালয়ের যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই রথীকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বোলপুরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকাতে তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য অধ্যাপক পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইবে।"

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দেবার পর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অল্পকাল কুষ্টিয়ায় প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করার সময় পুনরায় আইনের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কুষ্টিয়ার কর্ম ত্যাগ করে চুঁচুড়ায় ফিরে হুগলির আদালতে ওকালতি ব্যবসায় শুরু করেন। এখানে বছর দুই সফলতা লাভের ব্যর্থ চেষ্টার পর ১৯০৭ খৃস্টাব্দে ওড়িশার সম্বলপুরে গিয়ে ওকালতি আরম্ভ করেন। সম্বলপুরেই তাঁর জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত হয়।

শান্তিনিকেতনে কর্মসূত্রে স্বল্পকালীন সান্নিধ্যেই মনোরঞ্জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের একটি ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ সুহৃদরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। ২ বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখছেন, "এই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের সঙ্গে আপনার জীবনের

১. মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথও এই ঘটনাকে বিশেষ ক্ষতি বলে মনে করেছিলেন। মনোরঞ্জনকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি চিঠির অংশ—"আপনি ছাড়িয়া পলাইলেন? আপনি প্রধান একটা ভরসা ছিলেন— the right man in the right plac— আপনার পরিত্যক্ত স্থান পূরণ করে এমন একটা লোকও দেখিতেছি না।... একটা রসগ্রাহী মধুমক্ষিকা জাল কাটিয়া পলায়ন করিল।..." —'স্মৃতি' গ্রন্থ, পৃ. ৪-৫

একটি গভীর মঙ্গলসম্বন্ধ যে চিরন্তন হয়ে উঠেছে এই কথাটির পরিচয় আমার কাছে বহুমূল্য বলে জানবেন।" আর-একটি চিঠিতে লিখছেন, "আমাকে হিতৈষী বন্ধুভাবেই চিন্তা করিবেন।"

মনোরঞ্জন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের হিতৈষণা যে কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখবার ও প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও প্রয়াসে। মনোরঞ্জনকে লেখা অনেক পত্রই রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াসের সাক্ষ্য দেয়। মনোরঞ্জন যখন হুগলিতে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভে ব্যর্থ ও অভাব-অনটনে বিব্রত হয়ে ব্যবসায়ের অনুকূল অন্য কোনো ক্ষেত্র অথবা জীবিকার বিকল্প বৃত্তি অন্বেষণের চিন্তায় ব্যাকুল, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অধ্যাপনাকর্মে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার আশ্বাস দিয়েছেন, নূতন বৃত্তিতে প্রস্তুতির জন্য উৎসাহিত করেছেন, কখনো কোনো কাজের সন্ধান দিয়েছেন, কখনো বা কোনো কর্ম থেকে নিবৃত্ত হবার পরামর্শ দিয়েছেন এবং ওকালতি-ব্যবসায়ের অনুকূল কোনো ক্ষেত্রের সন্ধানও দিয়েছেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র করুণাকিরণের কাছ থেকে জানা যায়, সম্বলপুরে ওকালতি ব্যবসায়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে সন্ধান দিয়েছিলেন। উপরন্তু, তৎকালে সম্বলপুরের অধিবাসী কবি বিজয়রত্ন মজুমদারকে মনোরঞ্জনের একখানি পরিচয়পত্রও লিখে দিয়েছিলেন। কর্মক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের সন্তোষ ৪ বৈশাখ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে লিখিত পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশে সুস্পষ্ট: "আপনি যে পর্য্যন্ত নানা দ্বিধায় কর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া না বসিতেছিলেন সে পর্য্যন্ত আপনার জন্য বিশেষ উদ্বেগ অনুভব করিতেছিলাম। এখন যে এক জায়গায় স্থিতিলাভ করিয়া বসিয়াছেন ইহাতে বড়ই তৃপ্তি বোধ করিতেছি।"

সঙ্গলাভের অভিলাষে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে, কলকাতায়

ও শিলাইদহে আসার জন্ম বার বার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সুযোগ করতে পারলে মনোরঞ্জনও জোড়াসাঁকোয় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছেন কিংবা শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে দু-চারদিন কাটিয়ে গিয়েছেন। ১৯৩৭-৩৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর শান্তিনিকেতনে আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যন্তকাল পর্যন্ত তাঁদের পত্রালাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র দেড় মাস আগে তাঁকে লেখা মনোরঞ্জনের পত্রে উভয়ের সম্বন্ধ যে কত গভীর ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হল—

ওঁ

Sambalpur, B N.R.

20. 6. 41

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, ক'দিন থেকে কেন যেন ঘুরতে ফিরতে বারবার আপনার কথাই মনে হচ্ছিল। মাঝখানকার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ডিঙ্গিয়ে গিয়ে শান্তিনিকেতনে সেই আপনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের দিনের কথা। সহসা বহুদূর অতীতের আকস্মিক পুনরাবৃত্তি মনটাকে চঞ্চল কোরে তুলছিল, কেন জানি না। তার মাঝে আজ সন্ধ্যার সময় একজন একখানা gramaphoneএ[১] আপনার recitation দেয়া দুখানা record নিয়ে আমাকে শোনাতে এলো। অত কাছে থেকে আপনার ভাষা আজ কত বর্ষ যে শুনিনি তা মনে নাই। একে মনটা কেমন ঘুলিয়েই ছিল তাতে এত কাছে থেকে ঘরে ব'সে আপনার ভাষা যেন মনটার ভিতরে একটা বেদনার সৃষ্টি করছিল। তাই আপনাকে চিঠী একখানা না লিখে থাকতে পারলুম না। মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে

১. Gramophone

সাক্ষাতের সৌভাগ্য বুঝি আমার আর হবে না। বয়স আমার যথেষ্ট হয়েছে, দৌড়ঝাঁপ ক'রে দূর দেশে যাওয়া আসার সামর্থ্যও আমার নাই। তাই মনে মনে লুপ্ত অতীতের স্বপ্নরাজ্য সৃজন ক'রে সেকালের ভাবে, সেকালের ভাষায় আপনাকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ সাদর অভিবাদন প্রেরণ করিতেছি। জানি না হয়ত বা এই আমার আপনাকে শেষ অভিবাদন। তা' না হ'লে এতদিনের পর হঠাৎ পূর্ব্বস্মৃতি জেগেই উঠবে কেন, আর মনের মধ্যে এ অকারণ ব্যাকুলতাই বা ঘনিয়ে উঠবে কেন?

আজকাল আবার শুনি আপনি নাকি নিজে চিঠি পড়তে পারেন না, পড়ে শোনাতে হয়। সেও এক জঞ্জাল। তাই ভাবি ওরা আপনাকে আমার এ চিঠিখানা প'ড়ে শোনাবে কি না। না শোনালেও আমার বিশ্বাস আমার মনের কথা তাদের পুরোনো দিনের অভ্যস্ত পথের লুপ্ত চিহ্ন ধ'রে স্বস্থানে উপনীত হবেই হবে। সেই আমার ভরসা। চললুম

ইতি

বিদায়প্রার্থী

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরসময়ে যথাসাধ্য সাহিত্যচর্চা করেছেন। নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, প্রবাসী প্রভৃতি সাময়িকপত্রে তাঁর কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত রবীন্দ্র-আলেখ্য **Santiniketan Reminiscence—A Vignette** এই সংকলনের পরিশিষ্ট অংশে (পৃ. ১৯৩-২০১) মুদ্রিত হল।

রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে বন্ধু ও আত্মীয়পরিজনদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু'খানি পত্র মনোরঞ্জন 'স্মৃতি' (প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৪৮) নামক গ্রন্থে সংকলন করেছিলেন।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

পত্র ১। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ [১৩০৯]। পত্রশেষে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বঙ্গাব্দ ১৩০২ স্থলে ১৩০৯ হবে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ৭ পৌষ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ। বিদ্যালয়-সম্পর্কিত এই চিঠি স্পষ্টতই পরবর্তীকালে লেখা। এখানে বঙ্গাব্দ ও খৃস্টাব্দ রবীন্দ্রনাথ ভ্রমক্রমে মিশিয়ে ফেলেছেন।

রথী। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১)। তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর' সংকলনগ্রন্থে (প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৮) বিস্তারিত আলোচনা আছে।

পত্র ২। "যে যে magazines বিলাত হইতে আনাইবার কথা ছিল ..."

রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের সূচনাকাল থেকেই নিজে পড়ার জন্য এবং শিক্ষকদের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্ন সাময়িকপত্র ও গ্রন্থাদি আনিয়ে দিতেন। বিলাত থেকে যে-সমস্ত পত্রিকা আনাবার প্রসঙ্গ এই চিঠিতে আছে, তার সুস্পষ্ট তালিকা দেওয়া সম্ভব হল না। পরবর্তী নানা সময়ে যে-সমস্ত পত্রিকা বিদ্যালয়ে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন, বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একাধিক চিঠিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯ বৈশাখ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে লেখা একটি চিঠিতে (প্রকাশ : দেশ, ১৮ কার্তিক ১৩৬২, পৃ. ১৩) তৎকালে আমেরিকায় পাঠরত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— "...এবারে ৪০ টাকা বেশি পাঠাচ্ছি। নিম্নলিখিত কাগজগুলি subscribe করে আমাকে পাঠাতে হবে—

The Hibbert Journal

$ 2·50

The Open Court

$ 1·00

The Living Age

$ 6·00

···তোমরা আমাকে April সংখ্যা পর্যন্ত Open Court পাঠাইয়া দিয়াছ— অতএব তারপর থেকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে দিয়ো। যদি ইচ্ছা কর আগে তোমরা পড়ে তার পরসপ্তাহে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো।"

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ (তারিখহীন, প্রকাশ: দেশ, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, বর্ষ ২২ সংখ্যা ১৫) এরূপ অনেক পত্রিকার উল্লেখ করেছেন, এগুলি প্রধানত 'প্রবাসী' পত্রের 'সঙ্কলন' বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রেখে লেখা। চিঠিটির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল—

"মাসিক কাগজ গত বৎসরে যতগুলো পেয়েছি তার মধ্যে থেকে কেবল Broda-র International Review (ঠিক নামটা লিখলুম কি না জানিনে) Humanitarian Review, Literary Digest এবং ঐ রকমের আর একটা American Weekly (নামটা ভুলে যাচ্ছি) Twentieth Century থেকে সঙ্কলন করা গেছে।··· Hibbert Journal থেকেও অজিত অনেকগুলো সঙ্কলন করেছে।··· The Quest নামক একখানি Theological Magazine subscribe করা ভাল হবে। এবং Nation কাগজের বদলে The Public opinion কাগজটা নিলে হয়ত ব্যবহারে লাগতে পারে— কারণ এই কাগজে নানা লোকের নানা মত ও নূতন বিখ্যাত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়ে থাকে।···

Chambers, Strand, Pearson, Windsor, Pall Mall এগুলো এখনি বন্ধ করে দিয়ো। Nation'ও কাজ নেই। The Quest যদি আনাও তাহলে গত October মাসের সংখ্যা থেকে আনিয়ো— কারণ তার মধ্যে আলোচ্য জিনিষ আছে।"

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নানা ধরনের বই পাঠিয়ে উদ্‌বুদ্ধ করার যে চেষ্টা করতেন, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল :

বর্তমান গ্রন্থের ৫ সংখ্যক পত্রে (পৃ. ৭) মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু'খানি বই পাঠিয়ে লিখেছেন, "এ গ্রন্থ পড়িতে আপনার ঔৎসুক্য হইবে জানিয়াই কিনিয়াছি। পড়িবার সময় যে-সকল ঘটনা স্বতন্ত্রভাবে কাব্যে নাটকে বা উপাখ্যানে লিখিবার যোগ্য বোধ করিবেন দাগ দিয়া রাখিবেন।"

জগদানন্দ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশও উদ্‌ধৃত হল—

"তোমাকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক চটি বই পাঠাবো বলে কিনে রেখেছি। এগুলি খুব ভাল। শিশুপাঠ্য নয়, অথচ সহজবোধ্য। এগুলি অবলম্বন করে তোমরা যদি ছেলেদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি লিখিত বক্তৃতা দিতে পার তাহলে ভাল হয়। এর পরে পাঠ্যপুস্তকরূপে সে-সমস্ত ছাপাও হতে পারে।"—১০ ভাদ্র ১৩১৯

"বৈজ্ঞানিক পুস্তকগুলি এতদিনে নিশ্চয় তোমাদের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে।···পেলে যেন তোমাদের বিদ্যালয়ের কাজে লাগাতে পার,— এবং তত্ত্ববোধিনীতে কিছু কিছু করে লেখা দিয়ো।"—২ কার্তিক ১৩১৯

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষককে রবীন্দ্রনাথের এই রকম উৎসাহদানের দৃষ্টান্ত আরো আছে।

পত্র ২। সুবোধ। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক

সুবোধচন্দ্র মজুমদার (? ১৮৭৮ - ৬ জানুয়ারি ১৯৩০)। বর্তমান গ্রন্থের অন্যত্র তাঁর বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

পত্র ৩। তারিখহীন। পত্রে 'পয়লা অগস্ট' উল্লেখ আছে এবং পত্রশেষে রবিবার থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ অগস্টের পূর্বের রবিবার, ২৭ জুলাই ১৯০২, এই পত্র রচনার কাল।

রেবাচাঁদ। সিন্ধুদেশবাসী রেবাচাঁদ, (?—৮জানুয়ারি ১৯৪৫) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের খৃস্টধর্মাবলম্বী শিষ্য। পরে খৃস্টান সন্ন্যাসীরূপে তিনি 'অণিমানন্দ' নাম নিয়েছিলেন। কলকাতার সিমলাবাজার স্ট্রীটে তাঁর সহযোগিতায় ব্রহ্মবান্ধব ১৯০১ খৃস্টাব্দে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যখন ব্রহ্মবান্ধবের সহযোগিতায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন রেবাচাঁদও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে থেকে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষে সম্ভব হয় নি, রেবাচাঁদই কার্যত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব এবং রেবাচাঁদ রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অল্পকালই যুক্ত ছিলেন। নানাকারণে অল্প কয়েকমাসের মধ্যে তাঁরা এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করেন। পরবর্তীকালে রেবাচাঁদ কলকাতায় 'Boys own Home' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধে (প্রকাশ : প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪০, পরবর্তীকালে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থভুক্ত) বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বে ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদের সহায়তার বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউমা মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' (১৯৬১) গ্রন্থের 'বোলপুর

ব্রহ্মবিদ্যালয় গঠনে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব' অধ্যায়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে রেবাচাঁদের যোগ বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য সংকলিত হয়েছে। এ-ছাড়া, শ্রীদীপ্তিময় রায়-লিখিত 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ ও গৌরগোবিন্দ গুপ্ত' (প্রকাশ ১৩৯৩) গ্রন্থেও প্রাসঙ্গিক অনেক তথ্য আছে।

"আমাকে আজ রাত্রেই পুরী যাইতে হইবে। সেখানে আমার জমি আছে তাহা লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ গোল করিতেছে···।"
এই প্রসঙ্গে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নববর্ষ দৈনিক বসুমতী (১৩৬৭) পত্রে প্রকাশিত 'বিপিনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ বোর্ড-অব-রেভেনিউ-এর কাছ থেকে পুরীর বালুখণ্ড গভর্নমেণ্ট এস্টেটে জমি ইজারা নিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে পুরীর কালেক্টর মিঃ গ্যারেট রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানান যে, বালুখণ্ড এস্টেটকে সরকার য়ুরোপীয় ও ভারতীয়— এই দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জমি য়ুরোপীয় অংশে পড়েছে। সুতরাং তিনি যেন ঐ জমির ইজারা ত্যাগ করেন; তাঁকে ভারতীয় অঞ্চলে অনুরূপ একটি ভালো জমির লীজ দেওয়া হবে। চিঠিটি[১] এই—

To

Babu Rabindranath Tagore

Dear Sir,

I am to inform you that the Board of Revenue have made allocation of sites in Balukhanda Govt.

১. A. Garrett -লিখিত উল্লিখিত পত্র বিপিনচন্দ্র পাল-সম্পাদিত 'New India' পত্রের ৩১ জুলাই ১৯০২ সংখ্যায় প্রকাশিত।

Estate, Puri for European and Native quarters and that separate places drawn out distinguish one from the other. The site you have in the Estate consequently falls in the European quarters. So the Board desire to take it back from you, giving you, equally good site in exchange in the Native quarters. I request you to be so good as to waive your claims to the land leased out to you and engage somebody here on your behalf to select sites with me for you in the Native quarters. An early reply is solicited.

Yours truly
Sd. A. Garrett
Collector

রবীন্দ্রনাথ মিঃ গ্যারেটকে কী জবাব দিয়েছিলেন এবং এই ব্যাপারের কী পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না।···

তিনি [বিপিনচন্দ্র] এই চিঠির কথা জানতে পেরে 'নিউ ইণ্ডিয়া'র এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তীব্র ভাষায় সরকারের বর্ণবিদ্বেষসৃষ্টির প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রথমেই লিখলেন,

'When first we saw this letter, we could not exactly understand whether we were in India or America.'"

অনুমান করা হয়, পুরীর ঐ জমি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অধিকারেই ছিল, পরবর্তীকালে এখানে একটি ছোটো বাংলোবাড়ি

নির্মাণ করান। এই বাড়িটি সম্পর্কে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল।"

পুরীর এই বাড়ি ১৯০৫ খৃস্টাব্দে তিন হাজার টাকা মূল্যে বিক্রি করা হয়, এই তথ্য শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ঠাকুর পরিবারের হিসাবের খাতা থেকে জানা যায়।[১]

হোরি। Yoshinari Hori। জাপানি মনীষী ওকাকুরার মধ্যস্থতায় হোরি সান রবীন্দ্রনাথের নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। আশ্রম-বিদ্যালয়ে তিনি অল্পকালই ছিলেন। পাঞ্জাবে ভ্রমণ করতে গিয়ে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে ১৩ শ্রাবণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে লেখা একটি চিঠিতে[২] জানাচ্ছেন—

"আমার এখানে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃতশিক্ষা করিবার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম হোরি— নিজেকে সে চিদানন্দ নাম দিয়াছে। বড় নম্র শান্ত প্রকৃতি— তাহার অধ্যবসায় দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্বদেশ ও স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া এই দূরদেশের প্রান্তে মাঠের মধ্যে একাকী সংস্কৃতভাষা অধ্যয়নের কঠোর চেষ্টা বড় বিস্ময়কর। তাহার সৌম্যমূর্তি ও বিনীত ব্যবহারে এখানকার ভৃত্যেরাও মুগ্ধ হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মূল সংস্কৃত গ্রন্থে অধ্যয়ন করাই তাহার উদ্দেশ্য। সংস্কৃত শিখিতে তাহার সুদীর্ঘকাল লাগিবে। কারণ

১. শ্রীসমীর রায়চৌধুরী এই তথ্যটি আমাদের জানিয়েছেন।

২. প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮, পৃ. ১০

সুহৃদ ও আশ্রমিক -সহ রবীন্দ্রনাথ: রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মনোমোহন চক্রবর্তী,
অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায়, শিবধন বিদ্যার্ণব, কুঞ্জলাল ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সংস্কৃত শব্দ সে উচ্চারণই করিতে পারে না— বার বার বিফল হইয়াও সে হতোদ্যম হয় না। মধ্যে তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল কিন্তু তাহার উৎসাহ হ্রাস হয় নাই।"

কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা চিঠিতে (দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্ঠা) হোরির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যায়।

পত্র ৪। তারিখহীন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরুতর অসুস্থ সহধর্মিনীর চিকিৎসা উপলক্ষে ঐ সময় কলকাতায় ছিলেন। পরবর্তী ৫-সংখ্যক চিঠি কালীপুজোর আগে লেখা। আলোচ্য চিঠির শেষে বৃহস্পতিবারের উল্লেখ আছে। ঐ বছর কালীপুজোর আগের বৃহস্পতিবার ৬ কার্তিক ১৩০৯।

জগদানন্দ। জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩)। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনাপর্ব থেকে আরম্ভ করে ১৯৩২ খৃস্টাব্দে অবসর গ্রহণের কাল পর্যন্ত অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিদ্যালয়ের পরিচালন-দায়িত্বও নিষ্ঠা এবং কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন।

বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনার অন্যতম পথিকৃৎ জগদানন্দ সম্বন্ধে বিশদ পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য, শান্তিনিকেতন পুস্তক-প্রকাশ সমিতি-প্রকাশিত পুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত 'জগদানন্দ রায়' (প্রকাশ ১৩৭৬) গ্রন্থ, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত সাহিত্যসাধক চরিতমালার অন্তর্গত শ্রীনিরঞ্জন সরকার-লিখিত 'জগদানন্দ রায়' গ্রন্থ (প্রকাশ ১৩৮৩)। বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ সংখ্যায় তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

পণ্ডিতমহাশয়। শিবধন বিদ্যার্ণব। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে কলকাতায়

ঠাকুর-পরিবারে সংস্কৃত পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত করেন। পরে, তাঁকে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের সংস্কৃত শিক্ষা দেবার জন্য নিয়োগ করা হয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগপর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এখানে নিয়ে আসেন। এখানকার বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা বিষয় শিক্ষা দিতেন। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে তাঁর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। বাংলা আর সংস্কৃত শেখানো ছিল তাঁর কাজ, আর তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করতেন।"

অল্প কয়েকমাস শিক্ষকতার পর, বিদ্যালয়ের প্রথম বছরেই শিবধন শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান।

'কবিপ্রণাম' (১৩৪৮) গ্রন্থে শিবধন বিদ্যার্ণবের পুত্র রাধানন্দ ভট্টাচার্য -লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও শিবধন বিদ্যার্ণব' রচনায় উভয়ের যোগাযোগের বিবরণ পাওয়া যায়।

"পণ্ডিতমহাশয় নানা অনুনয় করিয়া স্বদেশ হইতে তাঁহার পরিজনদের কলিকাতায় আনিতে গেছেন।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৭৭) এই পত্রে উল্লিখিত পণ্ডিতমহাশয় সম্বন্ধে লিখেছেন (পৃ. ৫৬), "হরিচরণ পণ্ডিতমহাশয় অনুপস্থিত।" কিন্তু উল্লিখিত পণ্ডিতমহাশয় শিবধন বিদ্যার্ণব বলেই আমাদের অনুমান। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের কথা— গুণস্মৃতি' প্রবন্ধে (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫০) লিখেছেন, "...আশ্রমে আসিয়া [শ্রাবণ/ভাদ্র ১৩০৯]...পণ্ডিত শিবধনকে তখন অধ্যাপনা করিতে দেখি নাই, আমি আসার পূর্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।" আমাদের অনুমান, বিদ্যালয়ে শিবধন অনুপস্থিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এই পত্ররচনায়

সময়ে (৬ কার্তিক ১৩০৯) তিনি বিদ্যালয়ের কাজ চূড়ান্তভাবে ছাড়েন নি। রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে মনে হয়, গ্রীষ্মের ছুটির পর বিদ্যালয়ে যোগ দিতে দেরি হওয়ায় শিবধন কুণ্ঠিত; দেশ (পূর্ববঙ্গ) থেকে পরিজনবর্গকে কলকাতায় আনার জন্য আরো সপ্তাহখানেক সময় তিনি প্রার্থনা করেন। কিন্তু শিবধন আশ্রমবিদ্যালয়ের কাজে আর যোগ দিতে পারেন নি।

আলোচ্য পত্রে উল্লিখিত 'পণ্ডিতমহাশয়' হরিচরণ হতে পারেন না— এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কখনো এভাবে উল্লেখ করেছেন এরকম দেখা যায় না, তাঁকে সর্বত্রই 'হরিচরণ' বলে উল্লেখ করতেই দেখা যায়।

"বাড়ীতে ব্যামো লইয়া আমি নড়িতে পারিতেছি না।"

এইসময় পত্নী মৃণালিনী দেবীর গুরুতর অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আবদ্ধ ছিলেন। ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ঘটে।

নরেন্দ্র। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। চন্দননগরের অধিবাসী নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের পূর্বপরিচিত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। নরেন্দ্রনাথ ১৩১১ বঙ্গাব্দে বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে চলে যান, পুনরায় এই বছরের শেষভাগে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে অল্প কিছুকাল শিক্ষকতা করেন।

প্রেম। প্রেমানন্দ সিংহ, রায়পুরের সিংহ-পরিবার থেকে আগত বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র। পরবর্তীকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়েছিলেন।

পত্র ৫। তারিখহীন। ৪-সংখ্যক পত্রের সংযোগে ও পত্রশেষে সোম-বারের উল্লেখসূত্রে রচনাকাল নির্ধারণ করা করেছে।

সিংহ। রবীন্দ্রনাথ সিংহ, রায়পুরের অধিবাসী।

"Grant Duff's Mahrattas এবং Letters from a Mahratta Camp বই…"

Captain James Cunningham Grant Duff, *History of the Marathas.* (1826). Longman and Company, London.

Thomas Duer Broughton, *Letters from a Mahratta Camp.* (1813). John Murray, London.

অচ্যুত। অচ্যুতচন্দ্র সরকার। সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৪টি চিঠি সংকলিত হয়েছে 'রবীন্দ্রবীক্ষা' পত্রের ১১ সংখ্যক সংকলনে (শ্রাবণ ১৩৯১) এবং অক্ষয়চন্দ্রকে লেখা ৮ খানি সংগ্রথিত এই পত্রের পৌষ ১৩৯০, দশম সংকলনে।

সন্তোষ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৬-১৯২৬)। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে আমেরিকা থেকে উচ্চশিক্ষান্তে আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪১, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৪৯, শারদীয় দেশ ১৩১০, ১৩৫৩ ইত্যাদি সংখ্যায় প্রকাশিত। সন্তোষচন্দ্রের অকাল-মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে বেদনা পেয়েছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা এবং 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থে মুদ্রিত পত্রে।

রেণুকা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা রেণুকা দেবী (১৮৯১-১৯০৩)।
মীরা। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী (১৮৯৪-১৯৬৯)।
শমী। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯৬-১৯০৭)।

"হরিচরণ যে সংস্কৃত পাঠ লিখিতেছিলেন…"
'সংস্কৃত প্রবেশ' (১-৩ ভাগ)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের কথা' (১৩৫৩ ?) গ্রন্থে এ-বিষয়ে লিখেছেন, "…কয়েক পৃষ্ঠা সংস্কৃত পাঠের পাণ্ডুলিপি গুরুদেব আমাদের দিয়ে বলেছিলেন, এটা দেখে এখন পড়াও, আর এই পদ্ধতি-অনুসারে একটা সংস্কৃত পাঠ্য লিখতে আরম্ভ কর। সেই পাণ্ডুলিপির প্রণালী-অনুসারে আমি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ [?] সংস্কৃত প্রবেশ লিখেছিলাম।"

'সংস্কৃত প্রবেশ' প্রথম ভাগের প্রথম প্রকাশকালে সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ যা নিবেদন করেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে সংকলিত হল—

"বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইলে পর, সেখানকার ছাত্রদের যখন সংস্কৃত শিক্ষার সুপ্রণালী অনুসরণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম, তখন আদর্শস্বরূপ সংস্কৃত প্রবেশ প্রথম কিয়দংশ লিখিয়া, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে উহা শেষ করিবার জন্য সমর্পণ করিয়া দিলাম।"

এই গ্রন্থ এককালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পত্র ৬। তারিখহীন। এই পত্রে বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক কুঞ্জলাল ঘোষকে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বিস্তারিতভাবে লেখার কথা বলেছেন, বর্তমান গ্রন্থে সেই পত্রখানি সংকলিত। ঐ পত্রের তারিখ ২৭ কার্তিক ১৩০৯,— এই সূত্র থেকে

আলোচ্য পত্রের রচনাকাল অনুমান করা হয়েছে।

"বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার আমি আপনাদের তিন জনের উপর দিলাম— আপনি জগদানন্দ ও সুবোধ।"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যে পত্নী ও কন্যার গুরুতর পীড়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ বৎসর দুই বিদ্যালয় থেকে প্রায়ই দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। জমিদারি তত্ত্বাবধান উপলক্ষেও কখনো কখনো তাঁকে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, এ-ছাড়া স্বদেশের নানা কর্মের আমন্ত্রণে যোগদান তো ছিলই। ১৯১৩ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে অস্ত্রোপচারের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন অর্শরোগে কষ্ট পেয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্যেও অনেক সময় তাঁকে বিদ্যালয়ের কর্মভার থেকে মুক্তি নিতে হয়েছে।

এই-সমস্ত কারণে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের পরিচালন-দায়িত্ব বিশেষ কোনো শিক্ষক বা শিক্ষকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। ঐ সময়ে এবং পরবর্তীকালেও বিদ্যালয়-পরিচালন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের একটি বিবরণ এখানে দেওয়া গেল—

১৩০৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উপর অর্পণ করেন। ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে থাকা সম্ভব হত না বলে রেবার্চাদই সমস্ত তত্ত্বাবধান করতেন, ব্রহ্মবান্ধব মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে এসে কিছুদিন থেকে পরামর্শ বা নির্দেশ দিয়ে যেতেন। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতান্তরের ফলেই ব্রহ্মবান্ধব কয়েকমাসের মধ্যেই বিদ্যালয়ের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেন, এবং রেবার্চাদও ১৩০৯ বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের পর আর বিদ্যালয়ে ফিরলেন না। এর পর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ-অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

এইসময় পত্নীর গুরুতর পীড়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল কলকাতায় আবদ্ধ থাকতে হয়। দূর থেকে নির্দেশ দিয়ে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মের যথাযথ ও সুশৃঙ্খল চালনায় অসুবিধা বুঝে ১৩০৯ সালের পুজোর ছুটির পর রবীন্দ্রনাথ তিনজন শিক্ষকের এক 'অধ্যক্ষসভা' গঠন করে তাঁদের উপর বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার অর্পণ করেন।

এই ব্যবস্থা কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। অচিরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে, বিশেষত, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষের মধ্যে মতান্তর ও মনান্তর হওয়ায় 'অধ্যক্ষসভা' প্রায় অচল হয়ে পড়ে। তখন, ১৩০৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের শেষের দিকে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যম জামাতা, বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপর পরিচালনার সম্পূর্ণ ও একক দায়িত্ব দিলেন।

এই ব্যবস্থাও যথেষ্ট কার্যকর হল না। অপরকে চালনা করার স্বাভাবিক ক্ষমতা সত্যেন্দ্রনাথের তেমন ছিল না। শিক্ষক ছাত্র সেবক —সকলকে পরিচালনা করে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাবিধানে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যর্থ হলেন। সেই পর্বে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পীড়িতা মধ্যমা কন্যা রেণুকার আরোগ্যচেষ্টায়, প্রথমে হাজারিবাগ, পরে আলমোড়ায় অধিকাংশ সময় থাকায়, বিদ্যালয়ের কাজকর্মের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করতে পারছিলেন না। সেজন্য আলমোড়ায় থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেনের উপর বিদ্যালয়ের অধ্যাপনবিধি-নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, মোহিতচন্দ্র সেন ও ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্তকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে তার উপর বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত করবেন ঠিক করলেন (দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ১৮-সংখ্যক পত্র, পৃ. ২৯)। কিন্তু দুর্গাদাস এই ভার গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় তাঁর জায়গায় রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় কমিটির অন্তর্ভুক্ত হলেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১৫ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে

একটি চিঠিতে লিখছেন, "বিদ্যালয়ের জন্য আমার উদ্বেগের সীমা নাই।... তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিদ্যালয়কে দাঁড় করাইয়া দাও।"

এর অল্পকাল পর, ১৩১০ বঙ্গাব্দের শীতের ছুটিতে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের বসন্তরোগে বিদ্যালয় গৃহেই মৃত্যু ঘটে। এই সময় সাময়িকভাবে বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে প্রধান শিক্ষকরূপে মোহিতচন্দ্র সেন যোগ দেন। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "মোহিতবাবু আসিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।"

১৩১১ সনের গ্রীষ্মাবকাশের পর পুনরায় বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে। মোহিতচন্দ্র ছাত্রসংখ্যাবৃদ্ধি, পাঠ্যসূচী এবং পাঠনব্যবস্থার বিধিবদ্ধ রূপদানে মনোনিবেশ করলেও শারীরিক কারণে তাঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আরো কয়েকমাস মোহিতচন্দ্র প্রধান শিক্ষকের পদে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথকেই এই সময় বিদ্যালয়-পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থার কথা মোহিতচন্দ্রকে লেখা একাধিক চিঠিতে জানা যায়। এই সময় পূজাবকাশের মধ্যে ২১ আশ্বিন ১৩১১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের উপর বিদ্যালয় পরিচালনার ভার দিলেন। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের সঙ্গে মোহিতচন্দ্রের কর্মসূত্র-যোগ এখানেই ছিন্ন হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ সম্ভবত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের শেষের দিকে অসুস্থতার জন্য সাময়িকভাবে বিদ্যালয় থেকে চলে যান। সুস্থ হয়ে উঠেও, পরে আর তিনি কাজে যোগ দেন নি। সুতরাং আবার রবীন্দ্রনাথকেই পরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিতে হল।

অবশেষে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়

পরিচালনায় নির্বাচনপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বিদ্যালয়ের পরিচালক-রূপে সর্বাধ্যক্ষ পদের সৃষ্টি হল, শিক্ষণব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রকে আদ্য মধ্য ও শিশু— এই তিন ভাগে ভাগ করা হল। প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন; তাঁরা শিক্ষণবিষয়ে সর্বাধ্যক্ষকে সাহায্য করতেন। সর্বাধ্যক্ষ এবং বিভাগীয় অধ্যক্ষ সকলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং এক বৎসরের জন্য অধ্যাপকসভা-দ্বারা নির্বাচিত। পরবর্তীকালে নির্বাচিত শিক্ষক-প্রতিনিধির সহায়তায় বিদ্যালয় পরিচালনার এই ব্যবস্থা আরো প্রসারিত হয়। তৎকালীন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'শান্তিনিকেতন' পত্রে বিদ্যালয় সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য জানা যায়।

"রমাকান্তবাবুর ছেলে গেছেন আমি জানি। কুঞ্জবাবুর সঙ্গেও দুই একটি ছেলে যাইবে— ইহারাও বেতন দিবে।"
শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনায় গুরুশিষ্যের প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হত না। বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বিবৃত করেছেন, তার মধ্যে দুটি সংকলিত হল—

"...এটি আমার মনে ছিল যে যারা আসবে তাদের সঙ্গে আমার দেনা পাওনার সম্পর্ক না থাকে— বিদ্যাদানকে ব্যবসায় করে তুললে শিষ্যদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে অন্তরায় ঘটে; ছাত্র মনে করে, আমি কিছু দিচ্ছি তার পরিবর্তে কিছু পাচ্ছি।..."[১]

"ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না; ছেলেদের অন্নবস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই জোগাতে হত,

১. প্রবাসী, ২৭ বৈশাখ ১৩৪৩। 'প্রাক্তনী'-গ্রন্থভুক্ত।

অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত। বৎসরের পর বৎসর যায়, অর্থাভাব সমানই রইল, বিদ্যালয় বাড়তে লাগল। দেখা গেল, বেতন না নিলে বিদ্যালয় রক্ষা করা যায় না। বেতনের প্রবর্তন হল ; কিন্তু অভাব দূর হল না। আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু কিছু করে বিক্রয় করতে হল। এ দিকে ও দিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলুম— নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল।…"[১]

এই পত্র রচনাকালে বিদ্যালয়ে বেতন গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত হলেও শিক্ষক ও কর্মীদের পুত্রকন্যা ও নিকট আত্মীয়েরা বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ পেত, এ-ছাড়া স্বল্প-সংখ্যক ছাত্রকে অবৈতনিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হত।

অক্ষয়বাবু। অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগী সাহিত্যিক। 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'র অন্যতম সংকলক ; 'সাধারণী', 'নবজীবন' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর পুত্র অচ্যুত আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক যোগের কথা জানা যায়। বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২ অংশে (পৃ. ১৯৭), মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় অক্ষয়চন্দ্রের শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ক্লাসে যোগ দেওয়ার বিবরণটি উল্লেখযোগ্য।

"অক্ষয়বাবু বোধহয় বিরক্ত হইয়াছেন।"

অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পাঠানোর পর থেকেই

১. 'যাত্রার পূর্বকথা' নামে ১৩৩১ কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রে মুদ্রিত। 'বিশ্বভারতী' (১৩৫৮) গ্রন্থের ১১ সংখ্যক রচনা।

নানা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের মতবিরোধ ঘটে। বিদ্যালয়ে প্রদেয় বেতনবিষয়ে, অচ্যুতের শিক্ষালাভবিষয়ে নানা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়; শেষ পর্যন্ত অচ্যুত বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্পূর্ণ করেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের মধ্যে ('রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ১০, পৌষ ১৩৯০) এর পরিচয় পাওয়া যায়।

"রথীদের কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিবেন।"
তৎকালে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার্থীদের ইন্‌স্‌পেক্টর অব স্কুল্‌স-এর টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হত। বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক জগদানন্দ রায় কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন বলে, নানারকম সুবিধার কথা বিবেচনা করে রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবার প্রস্তাব হয়— এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ তা অনুমোদন করছেন। এই প্রসঙ্গে ৯-সংখ্যক পত্রের শেষাংশ (পৃ. ১৪) দ্রষ্টব্য।

"আপনার Reader অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া বড়ই খুশি হইলাম। কপি করিয়া আমাকে পাঠাইলে আমার মন্তব্য জানাইতে চেষ্টা করিব। ঐতিহাসিক পাঠও আপনাকে লিখিতে হইবে।"
এই সময় বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থের বিশেষ অভাব থাকায়[১] রবীন্দ্রনাথ

গিরিডিবাসী সুধাংশুবিকাশ রায় সেকালে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক-তালিকা রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রার্থনা করায়, উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ২৭ ফাল্গুন ১৩১৩ বঙ্গাব্দে লিখছেন, "পাঠ্যপুস্তকের তালিকা কেন চাহিতেছেন? পাঠ্যপুস্তক আছে কোথায় যে তালিকা দিব? ছেলেদের পড়াইতে পড়াইতে প্রত্যহ পাঠ্যপুস্তক তৈরি হইয়া উঠিতেছে।..."—'রবীন্দ্রবীক্ষা', সংকলন ৯, শ্রাবণ ১৩৯০

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই অভাব পূরণে নূতন ধারায় পাঠ্যগ্রন্থ রচনার জন্য প্রথমাবধি বিশেষ উৎসাহ দান করেছেন। এ ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে কিশোরপাঠ্য বই লেখার জন্যও শিক্ষকদের বিভিন্ন সময়ে উৎসাহিত করেছেন। এ-রকম কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে—

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংস্কৃত প্রবেশ', জগদানন্দ রায়, 'গ্রহনক্ষত্র', 'পোকামাকড়', 'বিজ্ঞানের গল্প', 'গাছপালা' প্রভৃতি; সতীশচন্দ্র রায়, 'গুরুদক্ষিণা'; অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'খ্রীষ্ট'; শরৎকুমার রায়, 'শিখগুরু ও শিখজাতি', 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি', 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' ইত্যাদি; সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, 'হজরত মহম্মদের জীবনী ও শিক্ষা'।

এই চিঠিতে মনোরঞ্জনকে রবীন্দ্রনাথ যে-যে বই লেখার বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন, সেগুলি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নি বা মুদ্রিত হয় নি।

"British India নামক একটি চটি বই পাইয়াছি…"।
W. H. Davenport Adams -লিখিত *The Makers of British India* গ্রন্থ।

কুঞ্জঠাকুর। আশ্রম-বিদ্যালয়ের পাকশালার তৎকালীন পাচক।

পত্র ৭। "প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না।"
ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের সূচনাকালে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় শিক্ষার্থী ও ব্রহ্মচারীদের আদর্শে জীবন যাপন করতে হত। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই প্রাচীন হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্মের আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করে চলতেন। শিক্ষার্থীরা সকালসন্ধ্যা কাষায় বস্ত্র পরে

উপাসনায় বসত, গায়ত্রীমন্ত্র ধ্যান করত, উপাসনা শেষে সমবেত হয়ে বেদমন্ত্র পাঠ করত। প্রাতঃকালে উপাসনার পর ছাত্ররা শিক্ষকদের পদধূলি নিয়ে প্রণাম করে গাছের তলায় নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পাঠ-গ্রহণের জন্য বসত। রান্নাঘরে খাবার সময় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ছাত্র শিক্ষক আলাদা পঙ্‌ক্তিতে বসতেন। ব্রাহ্মণ-পাচক ও ব্রাহ্মণ-কর্মী আহারার্থীদের পরিবেশন করত।

অব্রাহ্মণ কুঞ্জলাল ঘোষ শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ায় সমস্যার উদ্‌ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু বর্ণাশ্রম-সমাজের এই সংকীর্ণ আচার ও আচরণবিধি অন্তরের মধ্যে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৯ ও ১৬ কার্তিক, তৎকালীন সর্বাধ্যক্ষ নেপালচন্দ্র রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশদুটি[১] তাঁর মনোভাব পরিবর্তনের পরিচয় দেয়—

"...একজন মুসলমান-অভিভাবক ছাত্র দিতে চান। আমিও লইতে ইচ্ছা করি। ছেলেটির বয়স অল্পই, আমি লিখিয়াছিলাম তাহার জন্য চাকর ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দরকার, তাহার যে উত্তর পাইয়াছি তাহা পাঠাই। এ ছেলেটিকে যদি আপনারা লওয়া স্থির করেন তবে অভিভাবককে জানাইতে বিলম্ব করিবেন না— যদি সুবিধা বোধ না করেন তাহাও লিখিবেন।"

"মুসলমান ছাত্রটির সঙ্গে একটি চাকর দিতে তাঁহার পিতা রাজি অতএব এমন কি অসুবিধা, ছাত্রদের মধ্যে এবং অধ্যাপকদের মধ্যেও যাঁহাদের আপত্তি নাই তাঁহারা তাহার সঙ্গে একত্র খাইবেন। শুধু তাই নয়— সেই সকল ছাত্রের সঙ্গেই ঐ বালকটিকে এক ঘরে রাখিলে সে নিজেকে নিতান্ত যূথভ্রষ্ট বলিয়া অনুভব করিবে না। একটি ছেলে লইয়া পরীক্ষা শুরু করা ভাল অনেকগুলি ছাত্র লইয়া তখন যদি-

১. দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬, পৃ. ৩৩৬-৩৭

পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, সহজ হইবে না। আপাতত শালবাগানের দুই ঘরে নগেন আইচের তত্ত্বাবধানে আরো গুটিকয়েক ছাত্রের সঙ্গে একত্রে রাখিলে কেন অসুবিধা হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্য্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল? একসঙ্গে হিন্দু মুসলমান কি এক শ্রেণীতে পড়িতে বা একই ক্ষেত্রে খেলা করিতে পারে না? চাকর রান্নাঘর হইতে কয়েকজনের খাওয়া আনাইয়া শালবাগানে খাওয়াইয়া যাইবে। যে কয়জন তাহার সঙ্গে একত্রে খাইতে সম্মত তাহারা নিজের বাসন নিজে মাজিবে। ছেলেদের পক্ষে এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত সাধনা উপকারজনক। প্রাচীন তপোবনে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, আধুনিক তপোবনে যদি হিন্দু-মুসলমানে একত্রে জল না খায় তবে আমাদের সমস্ত তপস্যাই মিথ্যা। আবার একবার বিবেচনা করিবেন ও চেষ্টা করিবেন যে আপনাদের আশ্রমদ্বারে আসিয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন না— যিনি সর্ব্বজনের একমাত্র ভগবান তাঁহার নাম করিয়া প্রসন্নমনে নিশ্চিন্তচিত্তে এই বালককে গ্রহণ করুন; আপাতত যদি বা কিছু অসুবিধা ঘটে সমস্ত কাটিয়া গিয়া মঙ্গল হইবে।…"

পত্র ৮। তারিখহীন। কুঞ্জলাল ঘোষকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ে যে-সব সমস্যা ও অশান্তি দেখা দিয়েছিল, এই চিঠিতে সেই ঘটনাজনিত ক্ষোভ লক্ষ করা যায়। ৯-সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতার ভার তাঁর জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপর ন্যস্ত করার কথা মনোরঞ্জনকে ২০ পৌষ ১৩০৯ তারিখে জানাচ্ছেন। ৭-সংখ্যক চিঠিতে (১৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৯) রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জনকে লিখছেন, "আগামী সোমবারে প্রাতের ট্রেনে বোলপুরে যাইব।" এর থেকে অনুমিত হয়, বর্তমান পত্র সত্যেন্দ্রনাথের উপর বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার দেওয়ার আগে লেখা। সম্ভবত

শান্তিনিকেতন থেকে এই পত্র কৃষ্ণনগরের ঠিকানায় প্রেরিত হয়। ডিসেম্বরের শেষভাগে পত্রটি রচিত, অনুমান করা চলে।

"যেভাবে সর্ব্বপ্রকার ক্ষোভ প্রশান্ত করিয়া কার্য্যপ্রণালীকে পুনর্ব্বার নিষ্কণ্টক শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা ছিল অতিথি থাকাকালে তাহার অবসর পাওয়া অসম্ভব।"

এই পত্ররচনার কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে নিয়ে 'অধ্যক্ষসমিতি' গঠন করেন, মনোরঞ্জনকে সভাপতি ও কুঞ্জলাল ঘোষকে 'কর্মসম্পাদকে'র পদে মনোনয়ন করেন। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিস্তারিত নিয়মাবলী লিখে পাঠান, এই গ্রন্থের ৬-সংখ্যক পত্রে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যাশা নিয়ে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, তা সফল হয় নি। বিদ্যালয়ের কর্মী ও অধ্যাপকগণের মধ্যে বিরোধ ও অশান্তি দেখা দেয়। বর্তমান পত্রে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ এই কারণেই।

পত্রে যে অতিথিপ্রসঙ্গ আছে, সেই অতিথি জগদীশচন্দ্র বসু ও হেমচন্দ্র মল্লিক। জগদীশচন্দ্রের শান্তিনিকেতনে আসার খবর তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়, হেমচন্দ্রের আগমন-সংবাদের সূত্র ক্যাশবহির হিসাব। সম্ভবত পৌষ-উৎসবের কিছুদিন পরই তাঁরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

পত্র ৯। সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা রেণুকার স্বামী। সত্যেন্দ্রনাথ L.M.S. ডিগ্রিপ্রাপ্ত অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক ছিলেন। রেণুকার সঙ্গে বিবাহের পরই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ডে পাঠান। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বে বিভিন্ন সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ

শিক্ষকতা করেন। রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল তাঁকে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতার দায়িত্বও দিয়েছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্র-রেণুকার বিবাহ-প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কথা লিখেছেন (চিঠিপত্র ৬, পত্র-সংখ্যা ১৬)। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী সত্যেন্দ্রপ্রসঙ্গে 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে (প্রকাশ ১৩৭৫, পৃ. ১৩-১৫) লিখেছেন—"আমাদের ভগিনীপতি সত্যবাবু অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থপরিবারে মানুষ হয়েছিলেন, তাই বিদেশ গিয়ে তাদের আদব কায়দা তাঁর ভালো লাগল না। বাবা যখন সত্যবাবুর কাছে তাঁর চলে আসার কারণ শুনলেন তখন তাঁর জন্য বিরক্ত হন নি; বরং সত্যবাবুর জন্য একটা মায়া হল, সফল হয়ে আসতে পারলেন না বলে। পরে বাবা তাঁকে শান্তিনিকেতনে কাজ দিয়েছিলেন। সেখানে সত্যবাবু বেশ খুশিতে ছিলেন। রানীদি তখন বেঁচে নেই, তা হলেও আমাদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার বন্ধন কখনো ছিন্ন হয় নি। দুঃখের বিষয়, তিনিও বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর ছাত্রদের বাসের জন্য 'সত্যকুটির' নামে একটি বাসগৃহ তৈরি হল।"

"আমি শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথকে সকল বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি—"

নানা সময়ে বিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থা বিষয়ে ৬-সংখ্যক পত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে (দ্র. পৃ. ২৩১) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

"পূবদিকে যে ভিত পত্তন করা হইয়াছে…।"

পূর্ববর্তী বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের, বর্তমান পাঠভবন-দপ্তরের পূর্ব-দিকের ঘরটির (বর্তমানে ঐ বাড়ির দোতলায় ওঠার বাঁ দিকের ঘর) ভিত্তিস্থাপনার প্রসঙ্গ।

"আপনারা কৃষ্ণনগরে স্বাস্থ্যকর স্থান পাইয়াছেন…।"
এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ৬-সংখ্যক পত্রের টীকা 'রথীদের কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিবেন।' (পৃ. ২৩৫)।

পত্র ১০। "গত সোমবারে রথী ইনস্পেক্টার আপিসে গিয়া তাহার দরখাস্ত সহি করিয়া আসিয়াছে।"

দ্রষ্টব্য, ৬ সংখ্যক পত্রের পরিচয় (পৃ. ২৩৫)।

বিদ্যার্ণব। শিবধন বিদ্যার্ণব। আশ্রমবিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক। দ্রষ্টব্য ৪ সংখ্যক পত্রের পরিচয় (পৃ. ২২৫-২৭)।

পত্র ১০। লরেন্সসাহেব। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের গৃহবিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, "এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না।…"[১]

শিলাইদহের বসবাস উঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপনার পূর্বেই লরেন্সকে বিদায় দিয়েছিলেন। কিন্তু লরেন্স যাতে অন্যত্র উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হতে পারেন তার জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ত্রিপুরার রাজকর্মচারী কর্নেল মহিম ঠাকুরকে ১৮ ভাদ্র ১৩০৮ বঙ্গাব্দে লেখা এক চিঠিতে[২] রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমাদের শান্তিনিকেতন বোর্ডিং বিদ্যালয়ে রথীকে পড়াইব, সেইজন্য লরেন্সকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিদায় দিতে হইতেছে। যদি তোমাদের আগরতলায় ঠাকুরদের স্কুলে তাহাকে ইংরাজি অধ্যাপক নিযুক্ত কর তবে তোমাদেরও উপকার, তাহারও উপকার। এরূপ সুযোগ

১. 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লরেন্সের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

২. 'রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্বাশা' [১৩৪৮], পৃ. ১০৮।

আর পাইবে না। লরেন্স পড়াইবার বিদ্যা যেমন জানে এমন অল্প লোককেই দেখিয়াছি। ও আমাকে এখন ছাড়িতে চায় না কিন্তু উপায় দেখি না।"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষেই রবীন্দ্রনাথ লরেন্সকে বিদ্যালয়ের ইংরাজি শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেন। ৮ মাঘ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন, "লরেন্সসাহেব আগামী মার্চ্চ মাসে বোলপুরে যাইবে।" এর অল্প কিছুকাল পরে, ১৯ চৈত্র ১৩০৯ হাজারিবাগ থেকে দীনেশচন্দ্র সেনকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "সেখানে [শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে] ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্ম একজন ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়াছি কিন্তু তাহার কাজ দেখিয়া আসিতে পারি নাই সেইজন্ম মন উদ্বিগ্ন আছে।"

লরেন্স শান্তিনিকেতনে বেশিদিন থাকেন নি। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৩১৮) গ্রন্থের পরিশেষে আশ্রমের ভূতপূর্ব অধ্যাপকদের যে তালিকা দিয়েছেন সেখানে ১৩০৯ থেকে ১৩১১ বঙ্গাব্দকাল পর্যন্ত যে-সমস্ত অধ্যাপক এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন তাঁদের সঙ্গে লরেন্সের নামও অন্তর্ভুক্ত আছে।

মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা ২০ আষাঢ় ১৩১১ (৪ জুলাই ১৯০৪) এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "লরেন্সকে জিজ্ঞাসা করবেন বোলপুরেই যদি আবদ্ধ রাখি তাহলে কত টাকা বেতনে সে থাকতে রাজি হয়। তার যাতায়াতেই অনেক টাকা মাশুল খরচ পড়ে যাবে— তার উপর বেতন যা দাবী করবে সেটা সবসুদ্ধ জড়িয়ে মন্দ হবে না। জর্মান উচ্চারণটা আপনারা ভাল করে দোরস্ত করে নেবেন।"

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে ২৩ কার্তিক ১৩১১ (৮ নভেম্বর ১৯০৪) তারিখে দেখা যায়

নরেন্দ্রকে দেওয়া কিছু অর্থের হিসাব ('নরেন্দ্র সাহেবকে দেওয়া ২৲')। সম্ভবত, নরেন্দ্র ১৩১১ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে কোনো সময়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় থেকে চলে যান।

"আমি মাঘের শেষ সপ্তাহে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িব—"
মধ্যমা কন্যা রেণুকার অসুস্থতার সূত্রপাত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এইসময় ভ্রমণে বের হওয়া সম্ভবপর হয় নি।

পত্র ১১। তারিখহীন। ৮ মাঘ ১৩০৯ তারিখ লেখা পত্রে (১০ সংখ্যক) 'সত্যেন্দ্রের প্রতি অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি' এবং বর্তমান পত্রের 'আপনার আবেদনপত্রখানি আমি সত্যর নিকট পাঠাইয়া দিলাম...' প্রধানত এই দুই বিবরণের বিচারে এই পত্র ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ১২ মাঘের অব্যবহিত পূর্বে লেখা বলে অনুমান করা যায়।

"আমি পণ্ডিতমহাশয় ও সতীশকে গুটিকয়েক গল্পের প্লট দিয়া গল্প লিখাইয়াছি।"

সতীশ। সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪)। বরিশাল জেলার উজিরপুর গ্রামের জমিদারবংশীয় অখিলচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্র বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে এফ.এ. পাস করার পর কলকাতায় বি.এ. পাঠরত অবস্থায় তাঁর সুহৃদ অজিতকুমার চক্রবর্তীর সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। এর অনতিকালের মধ্যেই সতীশচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। এখানে আসার এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই অকালপ্রয়াত প্রতিভাবান তরুণ শিক্ষকের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার স্মরণ করেছেন।

সতীশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পুলিনবিহারী সেনের তত্ত্বাবধানে সংকলিত, প্রকাশিতব্য 'সতীশচন্দ্র রায়' গ্রন্থে তাঁর বিস্তারিত

পরিচয় পাওয়া যাবে।

বর্তমান পত্রে পণ্ডিতমহাশয় ও সতীশকে রবীন্দ্রনাথ যে গুটিকয়েক গল্পের প্লট দেবার কথা লিখেছেন, সেরূপ গল্প কোথাও মুদ্রিত হয়েছে বলে জানা নেই। পণ্ডিতমহাশয় অর্থাৎ শিবধন বিদ্যার্ণবের লেখা প্রবন্ধাদির সন্ধান পাওয়া যায়। সতীশচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই সংকলিত হয়েছে অজিতকুমার চক্রবর্তী -সংকলিত 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' (১৩১৯) গ্রন্থে। রচনাবলীতে অসংকলিত, সাময়িকপত্রে প্রকীর্ণ রচনাগুলির মধ্যেও প্রকৃত গল্পের সন্ধান পাওয়া গেল না।

"রেণুকা কলিকাতায় আসিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা রেণুকা (রানী) (১৮৯০-১৯০৩) অসুস্থ হওয়ায় এইসময় সম্ভবত তাঁকে মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ফেরার প্রসঙ্গ এই চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে। ইন্দিরা দেবী তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৩৬৭) গ্রন্থে লিখেছেন, "ক্রমশ যখন রানীর অসুখ ধরা পড়ল তখন শুনেছি নাটোরের মহারাজা তাঁকে মধুপুরে নিয়ে যান। অমলা দাসের পরিচর্যা আর হাওয়াবদলের গুণে তার বেশ উপকার হয়েছিল।"

"আমার সঙ্গে কয়েকটি ছাত্র যাইবে। তাহার মধ্যে A.M. Bose-এর ছেলে একটি।"

A.M. Bose, প্রখ্যাত আইনজীবী ও দেশনেতা আনন্দমোহন বসু। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র, জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগিনেয়, অরবিন্দমোহন বসু (১৮৯৫-১৯৭৭) ছাত্ররূপে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইসময় আসেন নি। কয়েকদিন পরে, ২৩ মাঘ শুক্রবার, ৬ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন।

অরবিন্দমোহন পরবর্তীকালে রবীন্দ্ররচনার অন্যতম প্রধান ইংরেজি অনুবাদকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর পরিচয় পাওয়া যাবে,

রবীন্দ্রনাথের পত্র ও প্রবন্ধ-সংকলন 'শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ' (১৩৮৮) গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২ অংশে (পৃ. ১৫০-৫৬)।

পত্র ১৩। "এখানে আসিয়া অবধি আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।"
পীড়িত কন্যা রেণুকাকে নিয়ে, বায়ুপরিবর্তনে পীড়া উপশমের আশায় রবীন্দ্রনাথ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে হাজারিবাগে গিয়েছিলেন।

নগেন্দ্রের স্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সহধর্মিনী নির্মলনলিনী (নলিনীবালা) দেবী।

পিসিমা। রাজলক্ষ্মী দেবী, মৃণালিনী দেবীর দূর সম্পর্কিত পিসিমা।

"পথটি এমন যে ইচ্ছা বা আবশ্যক হইবামাত্রই যে দৌড় দেওয়া যায় এমন জো টি নাই।"
এই পত্ররচনাকালে, গিরিডি পর্যন্ত রেলযোগে যাওয়া সম্ভব ছিল। সেখান থেকে পুস্‌পুস্‌ বা মানুষে-টানা গাড়িতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে হাজারিবাগে পৌঁছানো যেত।

পত্র ১৪। "আমি ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি।"
হাজারিবাগে রেণুকার পীড়ার উপশম না হওয়ায় চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কলকাতায় আসেন, সঙ্গে মীরা দেবী ও শমীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসেন। মীরা দেবীকে কলকাতায় রেখে শমীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে যান, সেখানে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে কলকাতা ফিরে আসেন।

"আপনি কুষ্টিয়া গেছেন শুনিয়া খুসি হইলাম—"
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় থেকে চলে যাবার পর

বেশ কিছু কাল কোনো স্থায়ী কর্মে নিযুক্ত হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিরূপ উদ্‌গ্রীব ছিলেন, তা তাঁর লেখা বিভিন্ন চিঠিতে জানা যায়। কুষ্টিয়াতে মনোরঞ্জন কিছুকাল ওকালতি-কর্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করার চেষ্টা করেন। এইসময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নানাভাবে আনুকূল্য করতে সচেষ্ট ছিলেন, পরবর্তী কয়েকখানি চিঠির মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পত্র ১৫। অসুস্থ কন্যা রেণুকাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে হাজারিবাগ যান। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি না হওয়ায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে, বৈশাখের শেষভাগে রেণুকাকে নিয়ে আলমোড়া যাত্রা করেন। বর্তমান পত্র রচনার কাল ১৩১০— এই হিসেবে স্থির হয়েছে।

"আপনাদের Trinity-র মধ্যে কেবল জগদানন্দ অবশিষ্ট রহিলেন—" শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের তিনজন শিক্ষক জগদানন্দ রায়, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার।

নরেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পৌষ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বৈদ্যবাটিতে কাজ পেয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। এইসময় তিনি পুনরায় আশ্রম বিদ্যালয়ে ফিরে আসতে উৎসুক ছিলেন।

পত্র ১৬। "রেণুকাকে লইয়া আলমোড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পথের কষ্ট যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে।"
রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসুস্থ কন্যাকে নিয়ে আলমোড়া যাত্রাকালে, পথে কষ্টভোগের যে বিবরণ গিরিডি-নিবাসী সুধাংশুবিকাশ রায়কে ২৭ বৈশাখ [১৩১০] তারিখে লেখা চিঠিতে দিয়েছিলেন, এখানে তা উদ্ধৃত হল—

"সুদীর্ঘ পথে বিচিত্র রকমের দুঃখভোগ করা গেছে। প্রথমত মধুপুর ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম ষ্টেশনমাষ্টার আশ্বাস দিলেন বম্বাইমেলের সঙ্গে আমাদের গাড়ি জুড়িতেও পারেন। অবশেষে টেলিগ্রাফ করিয়া জানিলেন এত অল্প সময়ের চেষ্টায় তাহা সম্ভবপর হইবে না।

মোগলসরাই যখন পৌঁছানো গেল ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন আমাদের গাড়ি মেলে যাইবে না, প্যাসেঞ্জারে জুড়িয়া দিবেন। আমি বলিলাম, কেন এমন শাস্তি? ষ্টেশনমাষ্টার কহিলেন তিনি কোনপ্রকার টেলিগ্রাফ পান নাই। আপনার গিরিধি ষ্টেশনের বাঙ্গালীপ্রভু, হয়, কোন কর্ম্মের নয়, নয় তাহাকে কেহই আমল দেয় না— একে ত সেখানেই তিন দিন গাড়ির অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম তাহার পরে পথে শুনিলাম কেহ কোনপ্রকার খবর পায় নাই। যে সময় বেরিলি পৌঁছিবার কথা তাহার বারো ঘণ্টা পরে পৌঁছিলাম। সেখানে একদিনও অপেক্ষা না করিয়া সেইদিনই কাঠগোদামে আসিতে হইল— সেখানে না পাইলাম থাকিবার জায়গা, না পাইলাম আলমোড়া যাইবার কুলি— সেই দ্বিপ্রহরে রৌদ্রে অনাহারে রেণুকাকে লইয়া এক্কায় চড়িয়া রাণীবাগ নামক এক জায়গায় ডাক বাংলায় গিয়া কোনমতে অপরাহ্ণে আহারাদি করা গেল। যাহা হউক্‌ পথের সমস্ত কষ্ট বর্ণনা করিয়া কি হইবে? কোন প্রকারে গম্যস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি—"

সমালোচনী। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস, ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা মজুমদার লাইব্রেরি থেকে এই মাসিক পত্রটি শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের এবং শান্তিনেকেতন বিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষকের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৭। "সুবোধ ত চলিয়া গেছেন— আপাতত শান্তিনিকেতনের

বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক আছেন। আরও তিনজনের আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি।"

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আত্মীয় সুবোধচন্দ্র মজুমদার ১৯০২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকহিসেবে যোগ দেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকর্মে ধৈর্যসহকারে তিনি থাকতে পারেন নি। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যে চারজন শিক্ষকের কথা লিখেছেন, তাঁরা হলেন— জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায় ও কুঞ্জলাল ঘোষ। বিদ্যালয়ে আরো তিনজন শিক্ষক আনাবার যে প্রসঙ্গ আছে, তাঁরা সম্ভবত বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত, নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও গোপালচন্দ্র কবিকুসুম। রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্র সেনের পত্রাবলীর মধ্যে এই সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়।

মোহিতবাবু। মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০-১৯০৬)। শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ। রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী ন'টি খণ্ডে কাব্য-গ্রন্থ নামে সম্পাদনা করেন। মোহিতচন্দ্রের স্মরণে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯১৭) গ্রন্থের 'বন্ধুস্মৃতি' অধ্যায়ে এবং অন্যত্র তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মোহিতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগের বিবরণ দিয়েছেন পুলিনবিহারী সেন 'সম্পাদক ও কবি' নিবন্ধে (দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৮)।

পত্র ১৮। পত্ররচনার তারিখ নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে অনুমিত— মোহিতচন্দ্র আলমোড়া ত্যাগের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ তারিখে এক পত্রে তাঁকে লিখেছেন, "আপনি তো আমাদের ঝরনার জলের রাজ্য হইতে কলের জলে[র] দেশে গেলেন…"।

মোহিতচন্দ্র আলমোড়ায় ১৩১০ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২০ জ্যৈষ্ঠ

কাটিয়ে আসেন। বর্তমান পত্রের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "কাল মোহিতবাবু যাইবেন…"। পত্রের শেষে রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলবারের উল্লেখ করেছেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১৯ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ছিল।

"কুঞ্জবাবুর প্রতি আপনার চিত্ত যেরূপ একান্ত বিমুখ হইয়াছে …।" কুঞ্জলাল ঘোষের সঙ্গে বিরোধই মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শান্তিনিকেতন ত্যাগের প্রধান কারণ। মনোরঞ্জনের মনে এ রকম ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ কুঞ্জলালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন। এই ধারণা তাঁর মনে কীভাবে হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মনোরঞ্জনের লেখা 'Santiniketan Reminisences|A vignette'[১] শীর্ষক পুস্তিকায় (প্রকাশ ১৫ অগস্ট ১৯৩৯) এই মন্তব্যে অনেকখানি পরিস্ফুট হবে—"A certain individual once happened to speak against me to him [Rabindranath] in private. He was deeply annoyed but would not tell me why."

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকরুণাকিরণ তাঁর পরলোকগত পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী আমাদের লিখে পাঠিয়েছেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল—

"বাবা শান্তিনিকেতনে যোগদানের কিছু পর কুঞ্জলাল ঘোষ আসেন। তিনি ছাত্রদের ও রবীন্দ্রনাথের কাছে বাবাকে ব্রাহ্মধর্মবিরোধী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। গুরুদেবের আচরণেও বাবা কিছু শীতলতার আভাস পান।… বেদনাহত হয়ে তিনি শান্তিনিকেতন পরিত্যাগের চিন্তা শুরু করেন। কবির কাছে কুঞ্জলাল আরো অভিযোগ করেন যে, সতীশচন্দ্রের

১. বঙ্গানুবাদ শ্রীনিরঞ্জন সরকার-কৃত "শান্তিনিকেতন-স্মৃতি। একটি চরিত্রচিত্র: কবি", *Visva-Bharati News*-এর May-June 1981 সংখ্যায় প্রকাশিত। মূল রচনাটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে।

সাহিত্যচর্চায় বাধা দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর উপর কাজের ভার অতিরিক্ত করে দিয়েছেন।…"

কিন্তু এই পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে মনোরঞ্জনের ধারণা যে অমূলক, তাঁকে লেখা এই গ্রন্থের ১৩-সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

পত্র ১৯। পত্রশেষে রবীন্দ্রনাথ রেণুকার মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন। আলমোড়া থেকে ফিরে রেণুকার মৃত্যু ঘটে ২৮ ভাদ্র ১৩১০ তারিখে। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির শেষে ১৩১১ বঙ্গাব্দ উল্লেখ করেছেন, যা স্পষ্টতই লিপিপ্রমাদ। ১৩১১ স্থলে ১৩১০ ধরতে হবে।

"…আপনি লিখিয়াছেন আমারই অন্যায় ও দুর্বলতা আপনার কর্ম্মপরিত্যাগের কারণ।"

১৮-সংখ্যক পত্রপরিচয়ে এই বিষয়টি আলোচিত।

"…সমস্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় নবতর প্রাণ ও প্রবলতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।"

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা নিতান্তই ক্ষুদ্র আকারে —জন ছয় ছাত্র সম্বল করে। বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। দেশবাসী এই বিদ্যালয় বিষয়ে হয় বিরূপ অথবা উদাসীন ছিলেন। সেই সময়ের বিদ্যালয়ে যে-সমস্ত ছাত্র এসেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "যে-সব ছেলে এসেছিল তারাও যে সব রত্ন তা নয়; কোথাও যাদের গতি নেই, বাপ-মা ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে তারাই প্রথমে এসেছিল এখানে। একজন অভিভাবক আমাকে বলেছিলেন তাঁর ছেলের সম্বন্ধে, 'এ অত্যন্ত অবাধ্য, এ'কে যথাসাধ্য মারবেন, আমি খাটের খুরোতে বেঁধে এ'কে মেরেও কোনো ফল পাইনি তাই আপনার হাতে দিচ্ছি।' কোনো কোনো ছাত্র এমন দুর্দান্ত ছিল যে

তারা সাপ দেখলেই ধরতে চাইত, কেউ তালগাছের চূড়ায় উঠে বসে থাকত— সেখান থেকে পড়েও মরে নি।"[১]

বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কর্মরত শিক্ষকগণের অধিকাংশও অন্তরে সংশয় পোষণ করতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে এই বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর আশা জাগ্রত ছিল ; সেই আশার পরিচয় বর্তমান পত্রে পরিস্ফুট।

পত্র ২১। "···তাহাদিগকে সুসংবাদ জানাইলাম।"
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ।

পত্র ২২। "দীনেশবাবুর প্রবন্ধ অত্যন্ত অযোগ্য হইয়াছে।···"
রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রের তৃতীয় বর্ষ, মাঘ ১৩১০ সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'সাহিত্যের আদর্শ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের প্রসঙ্গ। দীনেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসমাজে মানবপ্রকৃতির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ও বৈপরীত্য কল্পনা করেছেন। প্রবন্ধের পরিশেষে তাঁর মন্তব্য, "তাঁহার [সেক্সপীয়রের] কবিতা উন্নত কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগাইয়া তোলে না। কতক পরিমাণে বর্ব্বরযুগের দম্ভ, তেজ ও অহঙ্কারের ছায়া পড়িয়া তাঁহার কাব্য ও নাটকগুলিকে রাজসিক গুণের আধার করিয়াছে। উহাতে চূড়ান্ত প্রতিভা আছে, কিন্তু উদ্দাম প্রতিভার শাসন নাই— উহাতে মানবপ্রকৃতির অবাধ স্বাধীনতা ও অদম্য লীলা দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা শীলতা ও স্বভাবনম্রতায় ভূষিত হইয়া লোকহিতকর হয় নাই।··· আমাদের মহাকাব্যগুলির ভিত্তি সংযম, উহারা সাত্ত্বিকগুণের শুভ্রদীপ্তিতে সমস্ত অদ্ভুত ঘটনাকে কল্যাণের

১, প্রাক্তনী, পুনর্মুদ্রণ ৭ পৌষ ১৩৮৬, পৃ. ১৮

মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দেখাইতেছে। মনে হয়, সেই সকল কাব্য সমাজের যে স্তর উদ্ঘাটন করিয়াছে— শেক্সপীয়র-বর্ণিত সমাজের স্তর তাহার বহু নিম্নে।…”

এই ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথের কাছে 'অত্যন্ত অযোগ্য' বলে মনে হয়েছিল।

“এখানে বিদ্যালয় তুলিয়া আনিয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া আছি।” ১৩১০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে বিদ্যালয়ের শীতের ছুটির মধ্যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং বিদ্যালয় গৃহেই তাঁর মৃত্যু হয় (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪)। রোগ সংক্রমণের আশঙ্কায়, মাঘ মাসের শেষের দিকে, শীতকালীন ছুটির শেষে বিদ্যালয় সাময়িকভাবে শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়। গ্রীষ্মাবকাশের পর, ১৩১১ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি, বিদ্যালয় পুনরায় শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হয়।

“মোহিতবাবু কাজে যোগ দিয়াছেন।”
বিদ্যালয় শিলাইদহে সাময়িকভাবে নিয়ে যাওয়ার পর মোহিতচন্দ্র সেন প্রধান শিক্ষকরূপে কাজে যোগ দেন (১৩ ? ফেব্রুয়ারি ১৯০৪)। পরে, বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনলে মোহিতচন্দ্রও সেখানে আসেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য মাস দুইয়ের মধ্যেই তাঁকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় ফিরে যেতে হয়। এর পর কিছুকাল প্রধান শিক্ষকরূপে তাঁর নাম থাকলেও কোনো প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

১৩১১ বঙ্গাব্দে পূজাবকাশের মধ্যে, আশ্বিন মাসে, মোহিতচন্দ্রের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের উপর বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেন। এই প্রসঙ্গে ৬-সংখ্যক পত্রপরিচয় দ্রষ্টব্য।

পত্র ২৩। "আমাদের বিদ্যালয় হইতে পত্রিকা বাহির করিতে সতীশের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল··· "
সতীশচন্দ্র রায় ছাত্রদের নানাভাবে সাহিত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন; রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর রচনায় তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। সতীশচন্দ্রের মনে বিদ্যালয় থেকে একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশের ইচ্ছা অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু ঐ সময় তা সম্ভবপর হয় নি; পরবর্তীকালে সেই ইচ্ছা সার্থক হয়। যতদূর জানা যায়, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্পাদিত 'শান্তি'ই প্রথম হাতে-লেখা পত্রিকা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩১৪। এই ধরনের আরো কয়েকটি ছাত্র-সম্পাদিত পত্রিকার উল্লেখ করা গেল— প্রভাত (১৩১৬), বাগান (১৩১৭), আশ্রম (১৩১৭), কুটির (১৩১৭), The Ashram (১৩২০) ইত্যাদি।

"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং···
কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত শ্লোক। পত্রে উদ্ধৃত 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্' অংশ পরবর্তী শ্লোকের দ্বিতীয় পাদ।

পত্র ২৫। শরৎ। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার স্বামী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।

পত্র ২৬। "আমি ইতিমধ্যে বুদ্ধগয়ায় ভ্রমণ করিয়া··· ।"
বুদ্ধগয়ায় এই ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁরা সহযাত্রী ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর পত্নী অবলাদেবী, ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য যদুনাথ সরকার। রথীন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদারও তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে 'আচার্য জগদীশচন্দ্র' অধ্যায়ের প্রথমাংশে এই ভ্রমণের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন।

"বড় ছেলেদের একেবারে বিদায় করা গেল।"
মোহিতচন্দ্র সেন প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন বিদ্যালয়ে কিছু নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক বয়স্ক ছাত্র নিয়েছিলেন। এই ছাত্ররা বিদ্যালয়ে অনেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। মোহিতচন্দ্র বিদ্যালয় থেকে যাওয়ার পরই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে ভবিষ্যতে বয়স্ক ছাত্র আর না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় থেকেই বারো বছরের অনধিক বয়সের ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি না করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

নগেন্দ্র। নগেন্দ্রনারায়ণ রায়, বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক।

পত্র ২৭। "ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি আপনার কাছে সম্প্রতি কিছু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে—"
রবীন্দ্রনাথ 'পাগল' নামে যে প্রবন্ধ রচনা করেন (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১১, 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থভুক্ত), সে সম্বন্ধে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রে কোনো আলোচনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই পত্র।

"সুখং বা যদি বা দুঃখং···"
'মহাভারত' শান্তিপর্বের (১৭৪.৩৯) অন্তর্গত শ্লোক।

পত্র ২৮। "মোহিতবাবু ত বোলপুরে যাচ্চেন না। দীনেশবাবুকে নিচ্চি।"
মোহিতচন্দ্র সেন ১৩১১ বঙ্গাব্দের আষাঢ়মাসে শারীরিক কারণে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা চলে আসেন। বর্তমান গ্রন্থের ২২-সংখ্যক পত্র-পরিচয়ে মোহিতচন্দ্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

মোহিতচন্দ্রের পক্ষে নানাকারণে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আর যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি, এই সময় রবীন্দ্রনাথকে পরিচালন-দায়িত্ব নিতে

হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই দায়িত্বভার দীর্ঘকাল বহন করা তাঁর শারীরিক ও অন্যান্য কারণে সম্ভব ছিল না। তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে এইজন্যই বিদ্যালয়ে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু, ১ অগ্রহায়ণ ১৩১১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লিখছেন, "সম্প্রতি বিদ্যালয়ে আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক বেশি শিক্ষক সঞ্চিত হয়েছে। অতএব এখন আপনি এখানে আসবার জন্যে প্রস্তুত হবেন না। আমি একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে পরে আপনাকে জানাব।"

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে দীনেশচন্দ্রকে পেতে বিশেষ আগ্রহী থাকলেও দীনেশচন্দ্রের পক্ষে সেখানে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

পত্র ২৯। ৩০-সংখ্যক পত্রে অধ্যাপকগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য-আলোচনা-সভার বিবরণ আছে। বর্তমান পত্রে এই সভার যে প্রসঙ্গ আছে, তা পরবর্তী পত্রের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণের পূর্বে লিখিত, এই অনুমানে পত্রের কাল নির্ধারণ করা হয়েছে।

"আজকাল আমাদের সভা বেশ জমজমাট—"

এই সায়ংকালীন সভা প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৩১৮) গ্রন্থে লিখেছেন, "[রবীন্দ্রনাথ] অধ্যাপকদিগের প্রত্যেককে অধ্যয়নে অনুশীলনে ও রচনাকার্যে উৎসাহ দিলেন, যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ তাহাকে সেই বিষয়ে পুস্তক আনাইয়া দিয়া পরামর্শ দিয়া আলোচনা করিয়া সেই অনুরাগকে পুরাপুরি কাজে লাগাইয়া দিলেন। অধ্যাপকগণকে লইয়া একটি সায়ংসভা গঠিত করিলেন— তাহাতে নানাবিষয়ে আলোচনা এবং পাঠ হইত। সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্রধর্ম সকল বিষয়ে পাঠ এবং কথাবার্তা হইত··· ।"

জগদানন্দ রায় 'স্মৃতি' প্রবন্ধে ('শান্তিনিকেতন পত্র', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)

লিখেছেন, "...মোহিতবাবু আসিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মধ্যে সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনে পড়ে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ এই সভায় পড়িয়াছিলাম। গুরুদেব এই সভায় আসিয়া বসিতেন। সতীশবাবু যখন আশ্রমে ছিলেন, তখন তিনি সাহিত্যের আসরখানিকে রচনাপাঠে মশগুল রাখিতেন। গুরুদেব যে সকল প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন তাহার প্রথম প্রসাদ এখনকারই মতো আমাদেরই ভাগ্যে জুটিত।... তার পরে পূজনীয় বড়বাবু মহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া অধ্যাপকদিগকে লইয়া বৈঠক করিতেন। তাহাতে সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইত, তাহা অধ্যাপকদিগকে কম উপকৃত করে নাই।..."

এই ধরনের সভায় রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু আলোচনা পরবর্তীকালে কেউ কেউ অনুলিখন করেছেন।

পত্র ৩০। "আমার স্কন্ধে 'ভাণ্ডার' বলিয়া এক কাগজ পড়িয়াছে দেখিয়াছেন ত?"

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেছেন। এ ছাড়া, প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদনা-দায়িত্ব না নিলেও অনেকগুলি সাময়িকপত্র-সম্পাদনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বৈশাখ ১৩১২ বঙ্গাব্দ থেকে তিনি 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদন-দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১] এইকালে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রেরও তিনি সম্পাদক ছিলেন।

বৈশাখ ১৩১২ বঙ্গাব্দ থেকে চৈত্র ১৩১৩, দু বছর রবীন্দ্রনাথের াদকতায় 'ভাণ্ডার' নিয়মিত বের হয়। তৃতীয় বর্ষের দুটি সংখ্যাও (বৈশাখ ১৩১৪, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৪) রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় বের হয়েছিল। কার্তিক ১৩১৪ থেকে ভাণ্ডারের নবপর্যায় ও চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত পত্রিকাগুলির মধ্যে 'ভাণ্ডার' পত্র একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। এই পত্রিকায় বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত হয়েছে। প্রথম বছর (বৈশাখ ১৩১২) রবীন্দ্রনাথ একাই সম্পাদনার দায়িত্বভার বহন করেছেন। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় সহকারী সম্পাদকরূপে প্রমথনাথ চৌধুরী যোগ দেন।

কেদারনাথ দাশগুপ্তের উদ্‌যোগে ও অনুপ্রাণনায় রবীন্দ্রনাথ, ভাণ্ডারের সম্পাদন-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সজনীকান্ত দাস তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থে, 'ভাণ্ডারের কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে এই পত্রিকা প্রকাশে কেদারনাথের লক্ষ্য সম্বন্ধে লিখেছেন—

"বিলাতী-বর্জন, স্বদেশীদ্রব্যনির্মাণ ও প্রচার তাঁহার [কেদারনাথের] তদানীন্তন জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। এই সদুদ্দেশ্যে ৭নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' স্থাপনা করা হইয়াছিল। তিনি অচিরাৎ উপলব্ধি করিলেন শুধু দেশী পণ্যের বিপণী খুলিলেই চলিবে না; দেশের লোককে স্বদেশীভাবাপন্ন করিবার জন্য সাহিত্য ও শিক্ষার মধ্য দিয়া উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিতে হইবে।

"এই কাজে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি তিনি দেশে দেখিতে পাইলেন না…"

কাব্যগ্রন্থাবলী। মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত, নয় খণ্ডে প্রকাশিত কাব্য-সংগ্রহ। প্রকাশকাল, ১৯০৩-৪ খৃস্টাব্দ।

পত্র ৩১। "…কাল টৌনহলে এক প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়েছিল।" কলকাতা টাউন হলে ৯ ভাদ্র ১৩১২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, এই চিঠিতে তার উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আশ্বিন ১৩১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ও

পরবর্তীকালে 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পত্র ৩৩। "আমি যে কিরূপ আবর্তের পাকে পড়িয়াছিলাম..."
বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে দেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথ একসময় তাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন, এই চিঠিতে উল্লিখিত আবর্ত, তাঁর তৎকালীন কর্মব্যস্ততা।

প্রসঙ্গত, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন এইরকম কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে—

১১ আশ্বিন ১৩১২ তারিখ কলকাতায় সাবিত্রী লাইব্রেরিতে সভাপতিত্ব, দেওঘরে সরলা দেবীর বিবাহ-অনুষ্ঠানে (১৮ আশ্বিন) যোগদান, বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিজয়াসম্মিলনে (২৩ আশ্বিন সোমবার) গিরিডি থেকে যোগ দিতে আসেন।

"...কলিকাতা হইতে আজ দূত আসিয়াছে আজই আমাকে সেখানে যাইতে হইবে।"
২৩ আশ্বিন সোমবার অনুষ্ঠিত বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসুর প্রাসাদে বিজয়া সম্মিলন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে 'দূত' পাঠিয়ে আহ্বান করা হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার ১২ অক্টোবর ১৯০৫ সংখ্যায় এই অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত।

'আত্মশক্তি এবং বাউল'।
'আত্মশক্তি': প্রবন্ধগ্রন্থ, প্রকাশ, আশ্বিন ১৩১২। 'বাউল': গীত-সংকলন, প্রকাশ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫।

শৈলেশচন্দ্র। মজুমদার কোম্পানী
শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা। ঠাকুর এস্টেটের পতিসর কাছারিতে কিছুকাল ম্যানেজার ছিলেন। রবীন্দ্রগ্রন্থের প্রথম যুগের প্রকাশক মজুমদার লাইব্রেরির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নবপর্যায়

'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনাকর্মে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী, পরবর্তীকালে সম্পাদক।

পত্র ৩৪। "কিছুদিনের জন্য সভাসমিতি হইতে পলায়ন করিয়া বোলপুরে আশ্রয় লইয়াছি।"
স্বদেশী অন্দোলন পরবর্তীকালে যে রূপ নেয় তা রবীন্দ্রনাথের মনঃপুত হয় নি। তিনি এই আন্দোলন থেকে সরে এসে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩১২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে এক পত্রে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডের (১৯৫৭) গ্রন্থপরিচয়ে, পত্র ২৩ টীকা-প্রসঙ্গে (পৃ. ২১৭-১৮) উদ্‌ধৃত।

"এখানে জাপান হইতে এক জুজুৎসু শিক্ষক আসিয়াছেন—"
সানো জিরোসুকে। সম্ভবত নভেম্বর ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বিদ্যালয়ে যোগ দেন। বিদ্যালয়ে তিনি অল্পকালই ছিলেন। সানো সান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, সুবোধচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৮-সংখ্যক পত্রপ্রসঙ্গ।

পত্র ৩৫। সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে ১৮ মাঘ ১৩১২ বঙ্গাব্দে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, "আমি মীরাকে এক ঘণ্টা পড়াইবার জন্য মনোরঞ্জনবাবুকে লিখিয়া দিয়াছি।" বর্তমান পত্রটি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা সুবোধচন্দ্রকে বর্ণিত পত্র। পত্রশেষে রবিবারের উল্লেখ আছে। সুবোধচন্দ্রকে ১৮ মাঘ ১৩১২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন সেদিন বুধবার, তার পূর্ববর্তী রবিবার, ১৫ মাঘ এই পত্র-রচনার কাল— এই অনুমান।

পত্র ৩৬। সুবোধচন্দ্রকে শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ বঙ্গাব্দের

১৮ মাঘ লিখছেন, "রথীরা মার্চ্চমাসের মাঝামাঝি যাত্রা করিবে।" এই সংকলনগ্রন্থের ৩৫-সংখ্যক পত্র এবং বর্তমান পত্রে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রের বিদেশ যাত্রার প্রসঙ্গ আছে। রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র উচ্চশিক্ষার্থে ২০ চৈত্র ১৩১২ (৩ এপ্রিল ১৯০৬) আমেরিকা যাত্রা করেন। এই তিনখানি চিঠিই অল্পকালের ব্যবধানে লেখা। আলোচ্য ৩৬ সংখ্যক চিঠি ১৩১২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুনের আরম্ভে লেখা, এরূপ অনুমান করা চলে।

পত্র ৩৭। "সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়া গেছে। বরিশালে যাইতে হইবে। তাহার পর চাটগাঁয়ে যাইবার কথা…"
ত্রিপুরা রাজপরিবারের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের সুদীর্ঘকাল ধরে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ও তাঁর পুত্র রাধাকিশোরমাণিক্য বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য, ত্রিপুররাজ্যের অকৃত্রিম হিতৈষীজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনেক সময়েই রাজ্যপরিচালনসংক্রান্ত নানা বিষয়ে পরামর্শ চাইতেন, রবীন্দ্রনাথও অসংকোচে তাঁর মতামত দিতেন। এরূপ একটি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুররাজকে ১৬ শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গাব্দে লিখছেন—

"স্থানীয় দলাদলির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, নিঃস্বার্থ, সুশিক্ষিত, সুদক্ষ লোক মহারাজের সম্প্রতি একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।" এর অব্যবহিত পর (কার্তিক ১৩১২), দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা, কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ উচ্চপদস্থ কর্মচারী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের মনোনয়নক্রমে ত্রিপুরার রাজমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। রমণীমোহন ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে রাজ্যের বাজেটের যে খসড়া পেশ করেন, মহারাজ সে-বিষয়ে আলোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরায় আহ্বান করেন।

এই সময়েই বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রস্তাবিত সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হন। বরিশালে যাবার পথে রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় যান। ত্রিপুররাজ্যের বাজেট প্রণয়নে তৎকালে অনুসৃত মূলনীতি রবীন্দ্রনাথের সংগত মনে না হওয়ায়, তিনি সে-বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মত মহারাজের কাছে লিখিতভাবে নিবেদন করেন, সেই নিবেদনের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্‌ধৃত হল—

"রাজ্যের মধ্যে দুইটি স্বাভাবিক ভাগ আছে। একটি মহারাজের স্বকীয়, আর একটি রাষ্ট্রগত। উভয়কে জড়ীভূত করিয়া রাখিলে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে— এই উপলক্ষ্যে প্রভূত অনিষ্ট উৎপন্ন হয়— এই দুই বিভাগের সন্ধিস্থলে নানাপ্রকার দুষ্ট চক্রান্তের অবকাশ থাকিয়া যায়।

"যাহা মহারাজের স্বকীয়— অর্থাৎ সংসারবিভাগ, নিজ তহবিল, পরিচরবর্গ এবং মহারাজের ভ্রমণাদি ব্যাপার যাহার অন্তর্গত— তাহার উপরে মন্ত্রী বা আর কাহারো হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দেওয়া চলে না। এইজন্য মহারাজার স্বকীয় বিভাগকে মন্ত্রীর অধিকার হইতে, স্বতন্ত্র করিয়া মন্ত্রীর প্রতি রাষ্ট্রবিভাগের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করা আবশ্যক হইবে।[১]"

বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন পুলিসের জুলুমে পরিত্যক্ত হওয়ায় প্রস্তাবিত সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নি, রবীন্দ্রনাথ বরিশাল থেকে ফিরে আসেন। আলোচ্য পত্রে রবীন্দ্রনাথের চট্টগ্রামে যাওয়ার যে পরিকল্পনা ছিল ঐ সময় তা সম্ভবপর হয় নি ; ১৩১৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে তা কার্যকর হয়।

১. 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' সংকলনগ্রন্থে (প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৮) সম্পূর্ণ পত্রখানি মুদ্রিত।

পত্র ৩৯। "জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিয়া আপনি বড়দাদাকে বিপদে ফেলিয়াছিলেন···
দ্বিজেন্দ্রনাথও অনুরূপভাবে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন, "আমি তাহার প্রত্যুত্তর লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম ; কিন্তু লিখিতে লিখিতে এত details আসিয়া পড়িল যে, তাহা শেষ করিতে অনেক সময় এবং পুঁথির পাতা ব্যয় করিতে হয়।··· আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বলিয়াছি, তিনি তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ এর পর সংক্ষেপে তাঁর মতামত জানান। 'স্মৃতি' [১৯৪১] গ্রন্থের প্রথমে এই পত্রটি মুদ্রিত।

কতকটা প্রতিশ্রুতি দিলেও রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ লিখতে পারেন নি, কিন্তু অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে চতুরাশ্রমের বর্তমানকালে উপযোগিতার কথা আলোচনা করেছেন।

পত্র ৩৯। "চট্টগ্রাম এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে মনস্থির করিতে হইবে—"
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসংস্থানের জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা এখানে জানা যাচ্ছে।

পত্র ৪০। "ছাত্র কয়টির মধ্যে দু'জনকে মনের মতন পাইবেন— বাকি তিনটিকে কোনোমতে লগি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে···"
উল্লিখিত ছাত্রকয়টি সম্ভবত অরুণচন্দ্র সেন, উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুজিতকুমার চক্রবর্তী, অরবিন্দমোহন বসু ও যোগেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল 'রবিজীবনী', পঞ্চম খণ্ডে (বৈশাখ ১৩৯৭), পৃ. ৩৫১-৫২।

"যত্নে কৃতে ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ—"
ঘটকর্পর-রচিত 'নীতিসার' ১৩-সংখ্যক শ্লোকের (উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ-

মূপৈতি…) শেষ ছত্র। এই শ্লোকের রবীন্দ্রনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ পাঠান্তর-সহ মুদ্রিত হয়েছে 'রূপান্তর' (১৯৬৫) গ্রন্থে।

পত্র ৪১। "এখন যে এক জায়গায় স্থিতিলাভ করিয়া বসিয়াছেন…"
ওড়িশার সম্বলপুরে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় (১৯০৭) থেকে স্থায়ীভাবে ওকালতি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন।

"ল্যাবরেটরি ঘরের উপরে একটি দোতলা হইয়াছে—"
উল্লিখিত দোতলা 'বলভী' কুটির, ইঁটের দেয়ালের উপরে খড়ের ছাউনি দেওয়া চালাঘর। বর্তমান পাঠভবন-দপ্তরের সামনের অংশের দোতলায় এই ছাত্রাবাসটি ছিল। ১৯০৭ সালে নির্মিত এই ছাত্রাবাস ১৯২২ সালে ভেঙে তার জায়গায় পাকা ছাদের দোতলা ঘর তৈরি করা হয়।

পত্র ৪২। "বুকপোষ্টে গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড পাঠাই।"
মজুমদার লাইব্রেরি-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা সংগ্রহ 'গদ্য গ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ড (বৈশাখ ১৩১৪)।

"আমরা কি, দেশের যথার্থ অবস্থা কি তাহার সত্য পরিচয় পাওয়া দরকার…"
এই কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতার দিকে লক্ষ রেখে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য।

এইসময়ে নানাকারণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। মুসলমান সমাজ ইসলামধর্মের মূলতত্ত্ব ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠেন, তাঁরা নিজেদের হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক ভাবতে শুরু করেন। বাংলাদেশের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলন, মূলত হিন্দুসমাজের আন্দোলন— এরূপ ধারণা মুসলমানদের মনে বদ্ধমূল

হতে থাকে। বিদেশী দ্রব্যবর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারচেষ্টাকে মুসলমানসমাজ, উৎকৃষ্ট দ্রব্যের পরিবর্তে নিকৃষ্ট মানের দেশীয় দ্রব্যগ্রহণে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন— এ রকম ধারণা করতে আরম্ভ করেন। এই সমস্ত অসন্তোষের কারণে বাংলাদেশের নানা জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়।

ব্রিটিশ সরকারও নানা উপায়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে বিরোধ সঞ্চারিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তার চেষ্টা করতে থাকেন। মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ট ও অনগ্রসর, প্রধানত এই যুক্তিতে মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কারে রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Assembly) তাঁদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

স্বদেশের এই জটিল রাজনৈতিক অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ গভীর উদ্‌বিগ্ন হন। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে (প্রকাশ : প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪, 'সমূহ' গ্রন্থভুক্ত) এই সমস্যার প্রকৃতি ও প্রতিকার বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পত্র ৪৩। "দেশের কথা লিখিতে গেলে পুঁথি বড় হইয়া উঠিবে। যদি কোনো প্রবন্ধ আকারে কোনো কাগজে লিখি তবে দেখিতে পাইবেন…"

'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে দেশের সমস্যা ও সমাধানের পথনির্দেশ আছে।

"নগেন্দ্রকে বিবাহের পরে আমেরিকায় রথীদের কাছে কৃষিবিদ্যা শিখিতেই পাঠাইব। ফিরিয়া আসিলে রথীদের সঙ্গে একসঙ্গে এক কাজে যোগ দিতে পারিবে।"

১৯০৭ খৃস্টাব্দের ৬ জুন রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়, এর অব্যবহিত পরই

(২৮ জুন) রবীন্দ্রনাথ জামাতাকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠান। আমেরিকা থেকে ফিরে নগেন্দ্রনাথ কিছুকাল শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে কৃষিকর্মে যোগ দেন।

"…জগদানন্দের বড় মেয়েটির বিবাহ…"

জগদানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা দুর্গেশনন্দিনী দেবীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিবাহ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।

" শ্রীশবাবুর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ…"

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয়া কন্যা অরুণা দেবীর সঙ্গে প্রভাতকুমার সেনের বিবাহ হয়।

পত্র ৪৪। "বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ৮০ জন ছাত্র হইয়াছে—"

এই সময়ে রাজনৈতিক কারণে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশের শাসকবর্গের দমননীতির ফলে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে অনেক অভিভাবক অধিক সংখ্যায় ছাত্র পাঠাতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহও এর সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭ জুলাই ১৯০৭ তারিখে রথীন্দ্রনাথকে লেখা পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর চিঠিতেও—"ছেলে প্রায় ৮০টি হয়ে দাঁড়িয়েছে— বৃহৎ কাণ্ড…। প্রায় প্রতিদিনই দু-একজন ক'রে নতুন ছেলে আস্‌চে— আর তাদের রাখবার স্থান নেই।…" এই সময়ের ছাত্রদের কয়েকজনের নাম— মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী, সরোজরঞ্জন রায়চৌধুরী, সত্যরঞ্জন বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমর বড়াল, জ্যোতির্ময় হালদার, সিদ্ধার্থ রায়, বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, সরোজচন্দ্র মজুমদার, ত্রিগুণানন্দ রায়, রামরেণু গঙ্গোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ, প্রমোদনাথ রায়, প্রণবদেব

মুখোপাধ্যায়, গৌরগোপাল ঘোষ, অপূর্বকুমার চন্দ প্রমুখ।

বলা বাহুল্য, তালিকাবদ্ধ ছাত্রদের সকলেই যে একই কালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তা বলা যায় না।

পত্র ৪৫। 'মনুষ্য না পক্ষী!'

এই সময় নানা ধরনের কাজে, কলকাতা শান্তিনিকেতন শিলাইদহ অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ যাতায়াত করেছেন, সম্ভবত নিজের দ্রুত স্থান পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রেখেই এই মন্তব্য। রবি-জীবনীকার ঐ সময়ে তাঁর যাতায়াতের যে প্রমাণ দিয়েছেন, সংক্ষেপে দেখানো হল—

২ ভাদ্র ১৩১৪, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন। ৩ ভাদ্র থ্যাকার কোম্পানি গিয়েছেন; ৪ ভাদ্র সুকিয়া স্ট্রীট, পার্শিবাগান ইত্যাদি অঞ্চল; ৫ ভাদ্র বালিগঞ্জ এবং ঐ দিনই কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন। ২২ ভাদ্র সপরিবারে কলকাতা গিয়েছেন। ২৬ ভাদ্র শিলাইদহে রওনা হয়েছেন।

তুলনীয়, 'কড়ি ও কোমল' (প্রথম সং ১২৯৩)-ভুক্ত, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে রচিত 'পত্র' শীর্ষক কবিতার প্রথম কয়েকটি ছত্র—

মা গো আমার লক্ষ্মী,
মনিষ্যি না পক্ষী!
এই ছিলেম তরীতে,
কোথায় এনু ত্বরিতে!
কাল ছিলেম খুলনায়,
তাতে তো আর ভুল নাই,
কলকাতায় এসেছি সদ্য,
বসে বসে লিখছি পদ্য।

অপিচ দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ২ (১৩৯৫), পৃ ২১৩-১৬।

"আপনার প্রস্তাবটি উত্তম। কিন্তু ভাল ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়াটা কি শ্রেয়?"
রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে ছাত্রদের লেখাপড়া খেলাধূলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারদর্শিতার জন্য পুরস্কার দানের প্রথা প্রবর্তন করেন নি। এমনকি, ছাত্রদের কৃতিত্ব-অনুযায়ী শ্রেণীর মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি প্রকারে চিহ্নিত করার পদ্ধতিও বর্জন করেছিলেন।

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'বাড়ির আবহাওয়া' অধ্যায়ে তাঁর ছাত্রাবস্থার একটি ঘটনাকে উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, এখানে তা উদ্ধৃত হল—

"...ইস্কুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বলিয়া একখানা ছন্দোমালা বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোনো-একবার পরীক্ষায় ভালোরূপ পাস করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়া ছিলেন। আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, 'গুণদাদা, সত্য প্রাইজ পাইয়াছে।' তিনি হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি প্রাইজ পাও নাই?' আমি কহিলাম, 'না, আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে।' ইহাতে গুণদাদা ভারি খুশি হইলেন। আমি নিজে প্রাইজ না পাওয়া সত্বেও সত্যর প্রাইজ পাওয়া লইয়া এত উৎসাহ করিতেছি, ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ একটা সদ্‌গুণের পরিচয় বলিয়া মনে হইল। তিনি আমার সামনেই সে-কথাটা অন্য লোকের কাছে

বলিলেন। এই ব্যাপারের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরবের কথা আছে, তাহা আমার মনেও ছিল না; হঠাৎ তাঁহার কাছে প্রশংসা পাইয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। এইরূপে আমি প্রাইজ না পাওয়ার প্রাইজ পাইলাম, কিন্তু সেটা ভালো হইল না। আমার তো মনে হয়, ছেলেদের দান করা ভালো কিন্তু পুরস্কার দান করা ভালো নহে; ছেলেরা বাহিরের দিকে তাকাইবে, আপনার দিকে তাকাইবে না, ইহাই তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।"

পত্র ৪৭। "যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল— তাহার পরে আর ফিরিল না।"
রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র সরোজচন্দ্র মজুমদার (ভোলা) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শমীন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। মুঙ্গেরে শ্রীশচন্দ্রের আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে শমীন্দ্রনাথ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন, সেখানেই ৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই প্রসঙ্গ এবং মৃত্যুশোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে পুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডের (প্রকাশ মে ১৯৫৭) 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে (পৃ. ২১৮-২৪)।

"আমি আগামী কল্য শিলাইদহে পদ্মায় বাস করিতে যাইব।"
একই তারিখে (১৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৪), বিদ্যালয়ের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখেছেন, "আগামীকল্য আমি একলা শিলাইদহে যাইতেছি। সেখানে গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া বেলা মীরাকে ডাকিয়া পাঠাইব।"

শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা ও কনিষ্ঠা মীরাকে নিয়ে শিলাইদহে প্রায় চার মাস কাটিয়ে আসেন।

পত্র ৪৮। "আমাকে পাবনার শান্তিপ্রিয় লোক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি করিয়াছেন।"
উল্লিখিত 'কনফারেন্স' বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর পাবনায় অনুষ্ঠিত ১৯০৮ ফেব্রুয়ারির অধিবেশন। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণ বাংলায় দিয়েছিলেন।[১]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর কাজ যাতে বাংলাভাষায় সম্পন্ন হয়, তার জন্য রবীন্দ্রনাথ আগে থেকেই চেষ্টা করে আসছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "রাজসাহি সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন।... পর বৎসরে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা কন্‌ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।"

পাবনায় অনুষ্ঠিত সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রকৃত উন্নতির একমাত্র উপায় যে পল্লীর সার্বিক উন্নতি বিধান, সে কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করেন, এবং পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা দেশবাসীর কাছে উপস্থাপিত করেন।

'সভাপতির অভিভাষণ' নামে পুস্তিকাকারে সভাস্থলে বিতরিত। পরে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত। পরবর্তীকালে 'সমূহ' [২৫ জুলাই ১৯০৮] গ্রন্থভুক্ত।

"যাহা হউক সভাপতি হইয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারিব কি না সন্দেহ।"
১৯০৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুরাটে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেসের বিপরীত মতাবলম্বী দু'দলের মধ্যে তুমুল বিশৃঙ্খলা ঘটে ও শেষ পর্যন্ত সম্মেলন পণ্ড হয়, তার পরও এই বিবাদ দীর্ঘপ্রসারী হয়।

বর্তমান পত্রের আলোচ্য অংশে সেই ঘটনার ইঙ্গিত আছে। এই সময়েই, ১২ ফাল্গুন ১৩১৪ বঙ্গাব্দে, রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে একটি চিঠিতে লিখছেন, "কন্‌ফারেন্স আমাকে সভাপতিপদে আহ্বান করার সংবাদ পাইবামাত্র গালিসংযুক্ত এত বেনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি কোন্ দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল।"

"বিজয়বাবুর সংবাদ কি? কিছু লিখিতেছেন?"
সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার ওকালতি ব্যবসায় উপলক্ষে এই সময় সম্বলপুরে ছিলেন।

পত্র ৪৭। "দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাঁকে কিছু বলে নিয়েছি—"
'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাঘ ১৩১৪ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যের সম্ভোগ' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্যের বিরূপ সমালোচনা করায়, ঐ একই সংখ্যায় 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য' নামে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয়। পরে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাহিত্য' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ সংখ্যায় 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধে পুনরায় রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচনা লেখেন, সম্ভবত বর্তমান পত্রে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গেই মন্তব্য করছেন।

"প্রেমদাস সুন্দর মূরখ হ্যায়..."
সন্তকবি প্রেমদাস গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের কবীরপন্থী সন্ত ভান সাহেবের (১৭০০-১৭৫৫) অনুবর্তী জীবনদাসের শিষ্য ছিলেন। এঁর রচিত কবিতার সঙ্গে কোন্ সূত্রে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন জানা যায় না। জগদীশচন্দ্র বসুকে ২৪ জুন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লেখা একটি চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ প্রেমদাসের একটি পদের কয়েকছত্র ব্যবহার করেছেন (দ্র. চিঠিপত্র ৬, পত্র ৩)। ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' (প্রকাশ ১৯৩০) গ্রন্থে প্রেমদাসের উল্লেখ করেছেন। শ্রীমতী পম্পা মজুমদার 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' (১৯৭২) গ্রন্থে এবং শ্রীরামেশ্বর মিশ্রের 'মধ্যযুগীন হিন্দি সন্ত-সাহিত্য ঔর রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৯) গ্রন্থে প্রেমদাসের সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের কথা জানা যায়।

পত্র ৫০। "আমাদের জমিদারীর মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি।..."
স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ প্রথম দিকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ থাকলেও অল্পকালের মধ্যেই তিনি আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসেন; দেশের প্রকৃত উন্নতির পন্থাবিষয়ে আন্দোলনে অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে মতপার্থক্যই এর কারণ। আমাদের দেশের মুমূর্ষু পল্লীসমাজের উজ্জীবনই দেশের প্রকৃত উন্নতির একমাত্র উপায়, এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে অন্তরে পোষণ করতেন, তাঁর নানা সমকালীন রচনায় এই আদর্শ সুস্পষ্ট।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনে (ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে তাঁর চিন্তা দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করেন। সমসাময়িককালে প্রচারিত পল্লীসমাজ

সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাবসূচী[1] এখানে পুনর্মুদ্রিত হল—

পল্লীসমাজ

প্রতি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম, পল্লী বা পল্লীসমষ্টি লইয়া এক বা ততোধিক পল্লী-সমাজ সংস্থাপন করিতে হইবে। সহর, গ্রাম কি পল্লীনিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লীসমাজভুক্ত হইবেন। গ্রাম কি পল্লীবাসীর অভিপ্রায় মত অন্যূন পাঁচজনের উপর প্রতি পল্লী-সমাজের কার্য্যনির্বাহের ভার থাকিবে। তাঁহারা পল্লীবাসীদিগের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লী-সমাজের কার্য্য করিবেন। পল্লী-সমাজের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বিবৃত হইল। প্রতি পল্লী-সমাজ সাধ্যমতে এই উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান্ হইবেন।

উদ্দেশ্য

১. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব সংবর্দ্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।

২. সর্ব্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ সালিসের দ্বারা মীমাংসা।

৩. স্বদেশ-শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।

৪. উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লী-সমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যকমত নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা-সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫. বিজ্ঞান, ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্ব্বধর্ম্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের

১. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-রচিত 'কংগ্রেস' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, অপিচ দ্রষ্টব্য 'পল্লীপ্রকৃতি' (১৯৬২), গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২২২-২৪।

মধ্যে প্রচার ও সর্ব্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি, ধর্ম্মভাব, একতা, স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৬. প্রতি পল্লীতে একটি চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ, অনাথ ও অসহায় ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ঔষধ, পথ্য, সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৭. পানীয় জল, নদী, নালা, পথ, ঘাট, সৎকারস্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা।

৮. আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য্য বা গো মহিষাদি পালন-দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

৯. দুর্ভিক্ষনিবারণার্থে ধর্ম্মগোলা-স্থাপন।

১০. গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয়বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং অসহায় হইলে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।

১১. সুরাপান বা অনুরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার হইতে লোককে নিবৃত্ত করা।

১২. মিলনমন্দির club-স্থাপন করা ও তথায় সমবেত হইয়া পল্লীর এবং স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।

১৩. পল্লীর তত্ত্ব[তথ্যের]-সংগ্রহ— অর্থাৎ, জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসায়ের উন্নতি, অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্র ও ছাত্রী-সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর), ওলাউঠা, বসন্ত ও অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐ সব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিকরূপে

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪. জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সদ্‌ভাব সংস্থাপন ও ঐক্য-সংবর্দ্ধন।

১৫. জেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যের ও কার্য্যের সহায়তা করা।

অর্থের ব্যবস্থা

পল্লী-সমাজের কার্য্য স্বেচ্ছাদান ও ঈশ্বরবৃত্তি দ্বারা চলিবে। যাঁহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ সালিসিতে মেটানো হইবে, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাপূর্বক সমাজের মঙ্গলার্থ কিছু অর্থ-সাহায্য করিবেন। বিবাহাদি শুভকার্য্যেও সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ বৃত্তি দিবেন। পল্লীবাসীমাত্রেই সপ্তাহে সপ্তাহে কি মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য যথাসাধ্য দান করিবেন। পল্লী-সমাজের অন্তর্গত সমস্ত হাট-বাজার হইতেও ঈশ্বরবৃত্তি সংগৃহীত হইতে পারিবে। প্রতি বৎসর গ্রামে গ্রামে বারোয়ারি পুজার নাচ-তামাসায় যে অর্থ বৃথা নষ্ট হয়, ঐ সমস্ত অপব্যয় সঙ্কোচ করিলে সেই অর্থ-দ্বারা পল্লী-সমাজের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। পল্লীসমাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অর্থের অভাব হইবে না।"

অনুমান করা যেতে পারে, এই কর্মসূচীটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে রূপায়িত করার প্রচেষ্টার কথা বর্তমান পত্রে আলোচনা করেছেন।

বিরাহিমপুর পরগনাকে পাঁচটি মণ্ডলে ভাগ করে বিভিন্ন মণ্ডলে যে অধ্যক্ষগণকে রবীন্দ্রনাথ কর্মভার অর্পণ করেন, তাঁরা— কালীমোহন ঘোষ, ভূপেশচন্দ্র রায়, অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ও অক্ষয়চন্দ্র সেন (রায় ?)।

নিজ জমিদারিতে পল্লীউন্নয়ন-কর্মসূচী রূপায়ণের এই প্রথম প্রচেষ্টা নানা কারণে স্থায়ী হয় নি।

পল্লীউন্নয়ন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও তা বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টার বিস্তারিত তথ্য 'পল্লীপ্রকৃতি' (১৯৮২) সংকলনগ্রন্থের গ্রন্থ-পরিচয় অংশে (পৃ. ২২১-৭৪) সংকলিত।

পত্র ৫১। "হঠাৎ হৃদ্‌রোগে সন্তোষের বাবা মারা গেছেন…"
সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের পিতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৪০ বৎসর বয়সে, ৮ নভেম্বর ১৯০৮ খৃস্টাব্দে মারা যান। এই সময় তিনি সাঁওতাল পরগনার দুম্‌কা জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কর্মরত ছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর সমগ্র পরিবারটির অভিভাবকরূপে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন।

শ্রীশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতা তাঁরই আগ্রহ ও সনির্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে ও বিশ্বভারতী পত্রিকায় শ্রীশচন্দ্রকে লেখা তাঁর কয়েকখানি পত্র সংকলিত, এগুলির মধ্যে উভয়ের নিবিড় বন্ধুতার পরিচয় আছে।

"সত্যেন্দ্র রেণুকার মৃত্যুর পর এতদিন বোলপুরেই কাজ করিতেছিল— অল্প মাস পাঁচ ছয় হইল আমিই চেষ্টা করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম।"
রবীন্দ্রনাথের মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৩০৯ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। তাঁর পত্নী রেণুকার মৃত্যু হয় ভাদ্র ১৩১০ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ উদ্‌যোগী হয়ে আষাঢ় ১৩১৫ বঙ্গাব্দে পাথুরিয়াঘাটায় সতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা ছায়ার সঙ্গে পুনরায় তাঁর বিবাহ দেন।

পত্র ৫৩। "…সন্তোষের কথা পড়িয়া দুঃখিত হইলাম।"
আমেরিকায় অধ্যায়নরত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের লেখা কোনো চিঠি পড়ে তাঁর এককালীন শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুণ্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর মনোভাব জানিয়েছিলেন।

পত্র ৫৪। যোগেন্দ্রবাবু। চন্দননগরের অধিবাসী যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পুত্র ধীরেন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম দিকে কিছুকাল ছাত্র ছিলেন। যোগেন্দ্রকুমার 'বিশ্বভারতীর অঙ্কুর" প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬), বিদ্যালয়ের সূচনাকালের একটি আকর্ষণীয় পরিচয় দিয়েছেন।

"…ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে…"

শান্তিনিকেতন আশ্রমের এই বালিকা-বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রী হেমলতা গুপ্ত (১৮৯৭-১৯৮৮) এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমাদের কাছে এই বিবরণ দিয়েছেন—

১৩১৫ বঙ্গাব্দের পূজাবকাশের পর ঢাকার প্রসন্নকুমার সেনের দুই কন্যা কিরণবালা ও ইন্দুলেখাকে নিয়ে বালিকা-বিদ্যালয়ের সূচনা। হেমলতা গুপ্ত আসেন সে-বছর পৌষ-উৎসবের পর। পরে গয়া-প্রবাসী তারকচন্দ্র রায়ের কন্যা প্রতিভা ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র রায়ের কন্যা সুধা আসেন। এই কয়জনই ছিলেন বালিকা-বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী। দেহলী বাড়ির একতলা ছিল ছাত্রীনিবাস।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তাঁদের দিদিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর তত্ত্বাবধানে দেহলী-সংলগ্ন 'নতুন বাড়ি'তে থাকতেন। মীরা দেবী ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ে যোগ দেন।

আর-একজন অনাবাসিক ছাত্রী ছিলেন ঢাকার রাধাকান্ত গুহঠাকুরতার বালবিধবা কন্যা লাবণ্যলেখা দেবী। তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের পরিবারেরই একজন, তাঁর কন্যাস্থানীয়া। অল্প কিছুকাল এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সাগরিকা। তিনি নিচু বাংলায় তাঁর জ্যাঠাইমা হেমলতা দেবীর কাছে থাকতেন। মোহিতচন্দ্র সেনের বিধবা পত্নী সুশীলা দেবী যখন বিদ্যালয়ের বালিকাদের তত্ত্বাবধান-ভার নিলেন তখন তাঁর দুটি কন্যাও বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি চলে গেলে সেই স্থানে আসেন 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জননী গিরিবালা দেবী। তাঁর দুই কন্যা, কাত্যায়নী ও কল্যাণী এই বালিকাবিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন।

বালিকা-বিদ্যালয়ে তাঁদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাকে সহশিক্ষা বলা যায় না। ছাত্রীনিবাসের বাইরে ইচ্ছামত তাঁরা চলাফেরা করতে পারতেন না, ক্লাসও হ'ত ছাত্রীনিবাস সংলগ্ন কোনো ঘরে। সেখানে অবশ্য সেই শ্রেণীর ছাত্ররাও এসে পড়ে যেত। ছাত্রীদের আহার্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের সাধারণ পাকশালা থেকে আসত।

বালিকা-বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী বিষয়ে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ৯ অক্টোবর ১৯০৯ খৃস্টাব্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্‌ধৃত হল—

"স্ত্রীবিদ্যালয় সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম স্থির করা কর্তব্য। নতুবা ওখানকার বালকবিদ্যালয়ের সঙ্গে হয়ত তার সুর না মেলবার আশঙ্কা আছে। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও অনেকের মন বোধহয় এ সম্বন্ধে পীড়িত হচ্ছে— সেটা ঠিক কল্যাণকর নয়। অবশ্য যেখানে কোনো অন্যায় নেই সেখানে কারো সংস্কারের দিকে তাকাবার দরকার নেই— কিন্তু সংস্কারকে একেবারেই অশ্রাব্য করারও প্রয়োজন দেখিনে। তার

মানে, কাজ থাকলে কাজ চালাতে হবে, কিন্তু যেখানে কাজ নেই সেখানে সতর্ক হওয়া উচিত। মেয়েরা শান্তিনিকেতনে, জগদানন্দের বাড়িতে, বা নীচের বাংলায় অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত স্বেচ্ছামত যাতায়াত করতে পারবে না এই নিয়ম করে দিয়ো— এবং ক্লাসের প্রয়োজনের বাইরে অধ্যাপকদের সঙ্গেও তাদের যোগ থাকবে না। তাদের ওঠা খাওয়া প্রভৃতির সময় সুনির্দিষ্ট থাকবে এবং তারা বাইরে বেড়াতে যাবার সময় তাদের কর্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে এইরকম নিয়ম থাকা ভাল।"

বালিকাবিদ্যালয় নিয়ে নানারকম সমস্যা দেখা দেওয়ায় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে পূজাবকাশের পর উঠে যায়।

'গদ্য-গ্রন্থাবলী', 'শান্তিনিকেতন'।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গদ্যগ্রন্থ 'গদ্যগ্রন্থাবলী' নামে ১৬টি খণ্ডে বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় মজুমদার লাইব্রেরি, কলকাতা থেকে, বৈশাখ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে।

শান্তিনিকেতন মন্দিরে এবং অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষণাদির সংকলন 'শান্তিনিকেতন' নামে ১৭টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খৃস্টাব্দে।

পত্র ৫৫। "সে [রথীন্দ্রনাথ] একবার ফ্রান্স ও জর্মনিতে তার শিক্ষা সমাধা করে আসুক।"

রথীন্দ্রনাথ আমেরিকায় তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফেরার পথে অল্প কিছুকাল ইংলণ্ডে ফ্রান্সে ও জার্মানিতে কাটিয়ে আসেন। তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের 'স্বদেশ অভিমুখে' অধ্যায় থেকে জানা যায় "জার্মানির গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এক পর্বকাল নিয়মিত বক্তৃতা শুনেছি।" এই সমস্ত দেশে, রথীন্দ্রনাথের পক্ষে নিয়মিত কোনো শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয় নি।

"ও [সন্তোষচন্দ্র] সেখানে আরো দু'বছর থেকে উপার্জন করে…"
সন্তোষচন্দ্রের পক্ষে, শিক্ষান্তে, এই পরিকল্পনা-অনুযায়ী আমেরিকায় থেকে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তিনি আমেরিকা থেকে ১৯০৯ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে দেশে ফিরে আসেন।

পত্র ৫৮। এই চিঠির শেষ অংশে রথীন্দ্রনাথের দেশে ফেরার আনুমানিক সময়ের উল্লেখ আছে। রথীন্দ্রনাথ ১৯০৯ খৃস্টাব্দের আগস্ট-মাসের শেষদিকে ফ্রান্স থেকে দেশের দিকে যাত্রা করেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে এই পত্ররচনার কাল অনুমান করা হয়েছে।

জগদীশ বোস। জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭)। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উভয়ের মধ্যে যোগের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ড।

"… একটা নতুন দোতলাঘর তৈরি হচ্চে…"
বিশ্বভারতীর সূচনাপর্বে গ্রন্থাগারের (বর্তমানে পাঠভবন-দপ্তর) উপরে এই দোতলাঘর তৈরি হয়। ইটের দেয়াল, উপরে খড়ের চাল-দেওয়া এই নতুন ছাত্রাবাসটির নাম দেওয়া হয় 'বলভীকুটির'।

পত্র ৫৯। "ইতিমধ্যে চয়নিকা প্রভৃতি যে দুই একখানা বই বেরচ্চে—"
রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথম নির্বাচিত সংকলন 'চয়নিকা' ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -কর্তৃক ১৯০৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত 'চয়নিকা' গ্রন্থে নন্দলাল বসু -অঙ্কিত সাতখানি রঙিন ও একরঙা চিত্র মুদ্রিত হয়। এ ছাড়া গ্রন্থারম্ভে 'মুখপত্রে' রবীন্দ্রনাথের একখানি পূর্ণাবয়ব আলোকচিত্র ছিল। নন্দলাল বসু -অঙ্কিত চিত্রগুলির নাম : ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে; কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া, বাহির হনু তিমির-রাতে; যদি মরণ

লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দেও সলিলমাঝে; ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর; হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ; ভূমির 'পরে জানু পাতি তুলি ধনুঃশর···, আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

এই অতি দুষ্প্রাপ্য সংকলনগ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ আছে জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা-প্রকাশিত শ্রীস্বপন মজুমদারের 'রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি' প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্বে (প্রকাশ ১৩৭৫)।

"রথীকে শিলাইদহে রেখে এসেছি। সেইখানেই তার কর্ম্মের রথ তাকে চালাতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্রকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁদের বিদেশযাত্রার পূর্বেই, ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তাঁদের কৃষিব্যাবসাতে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তাভাবনা আরম্ভ করেন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে ১৯০৪ খৃস্টাব্দে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন—

"জমির সন্ধান কোরো। ভবিষ্যতে বিশেষ কাজে লাগবে। সন্তোষ ও রথীকে agricultureএর জন্যই তৈরি করা স্থির করেছি— ওরা দুইজনে মিলে চাষবাস করবে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করে জীবন কাটাবে। চাষের জন্য স্বাস্থ্যকর জায়গা থাকা দরকার— নইলে কালিগ্রামে যথেষ্ট জমি আছে।···"

শ্রীশচন্দ্রকে এই অনুরোধের কারণ, এইসময় তিনি Land Acquisition officer ছিলেন। পশ্চিমগামী নূতন রেলপথ (Grand chord) নির্মাণকল্পে বিহার ছোটনাগপুর অঞ্চলে যে-সমস্ত জমি তৎকালীন ভারত সরকার অধিগ্রহণ করেছিলেন, সেই জমির অধিকারীদিগকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করার দায়িত্ব শ্রীশচন্দ্রকে

দেওয়া হয়েছিল। কর্মোপলক্ষে ছোটনাগপুরের ভূমি ও ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের পরিচয় ও যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল, অনুমান করা চলে।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, সম্ভব হলে কৃষিকর্মের উপযোগী একত্র সংলগ্ন ১০০০ বিঘা পরিমাণ জমি এই অঞ্চলে সংগ্রহ করবেন। এই উদ্দেশ্যে শ্রীশচন্দ্রকে তিনি দু-তিন বছর ধরে ক্রমাগত তাগিদ দিয়েছেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৮ কার্তিক রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"রথীদের গত সপ্তাহের পত্রে তাহারা এইবেলা জমীসংগ্রহের কথা বলিয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা, যেখানে তাহাদিগকে চাষ করিতে হইবে সেখানকার মাটির নমুনা লইয়া তাহাদের কলেজে **Laboratory**তে **analyse** করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং সেখানকার সমস্ত প্রাকৃতিক বিবরণ জানিয়া অধ্যাপকদের সহিত পরামর্শ করিয়া আসে। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থানে জমী সন্ধানের চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু ছোটনাগপুরে কর্ডলাইনের ধারে কি আর জমী পাইবার কোনো আশা নাই?... তোমার মুখ হইতে একটা শেষ জবাব পাইবার প্রত্যাশায় আছি—যদি জবাব দাও তবে আমার যথোচিত সাধ্যমত অন্যত্র কোথাও চেষ্টা দেখিতে পারি— যখন এত খরচ করিয়া একটা বিদ্যা শিখাইতে পাঠানই গেল তখন তাহার একটা ক্ষেত্র তাহাদিগকে দিতেই হইবে। যদি স্বাস্থ্যকর স্থানে নিতান্তই না পাওয়া যায় তবে অগত্যা অন্য কোথাও অনুসন্ধান করিব।..."

পর বৎসর ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২২ কার্তিকে লেখা আর একখানি চিঠির অংশ—

"ছোটনাগপুরের দিকে জমি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হইতেছে না কারণ সেদিন একজনের কাছে শুনিলাম 'গোমো'র জমি আর বড় বাকি নাই। অগত্যা ময়ূরভঞ্জে জমির জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। সেখানে জমি আছে কিন্তু স্বাস্থ্যকর হইবে না। কি

করা যাইবে— এত খরচ করিয়া কৃষি শিখাইয়া শেষকালে জমি অভাবে সমস্ত ব্যর্থ করা ত যায় না।…”

এই বৎসরেই, ১৯ পৌষ ১৩১৪ তারিখে শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে লিখছেন—

“এখানে জমির খবর লইয়া দেখিলাম কোথাও একত্র সংলগ্ন পঞ্চাশ বিঘা জমি পাওয়াও অসম্ভব।… বাংলার এ অঞ্চলে কোথাও জমি পাইব না, ওখানেও যদি না পাওয়া যায় তবে ছেলেদের পক্ষে স্বাধীন কৃষিব্যবসায় করা একেবারে অসম্ভব হইবে।”

কয়েকদিন পর, ২ মাঘ ১৩১৪ তারিখে আবার লিখছেন—

“চাষের জমি যা হয় হবে, ‘গুমো’য় বাসের জমি অন্তত বিঘা দশ পনেরো একটু রমণীয় জায়গায় পাওয়া যায় কি না খবর নিয়ো। সেইসঙ্গে চাষের জমি ১০০০ বিঘা না হোক ২০০/৩০০ বিঘার চেষ্টা দেখা যাক— একটু উর্ব্বরা দেখে জমি বেছে নেওয়া চাই।”

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ চিঠিতে শ্রীশচন্দ্রকে ২৮ চৈত্র ১৩১৪ বঙ্গাব্দে জানাচ্ছেন—

“জমির সম্বন্ধে আমি ক্রমশই হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছি। ছেলেরা ফিরিয়া আসিলে কোথায় যে কাজ ফাঁদিবে তাহা ত জানি না। বাংলাদেশে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় জমি পাওয়া অসম্ভব বলিয়াই জানিয়াছি। অন্যত্র ততোধিক। যদি জমি না পাওয়া যায় তবে রথীকে আমাদের জমিদারীতে প্রজাদের উন্নতিসাধনের কাজে নিযুক্ত করিয়া দিব।”

উপযুক্ত কৃষিযোগ্য জমি সংগ্রহ করতে না পেরে শেষে রথীন্দ্রনাথকে স্বাধীন কৃষিব্যবসায়ে নিযুক্ত করার আশা রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন দিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শিলাইদহেই কর্মক্ষেত্র

প্রস্তুত করে দেন। এ-বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের 'আবার শিলাইদহ' অধ্যায়ে লিখেছেন—

"১৯০৯ সালের শেষ দিকে আমি দেশে ফিরলাম। এসে দেখি শিলাইদহের কুঠিবাড়ি আমার জন্য প্রস্তুত— জমিদারির কাজকর্ম তদারক করার ফাঁকে ফাঁকে আমি আমার খেতখামার গড়ে তুলব, কৃষি নিয়ে পরীক্ষা গবেষণা করব— এই ছিল বাবার অভিপ্রায়।··· ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরেই বাবা আমায় নিয়ে বেরোলেন জমিদারি অঞ্চলে— উদ্দেশ্য, প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হবে ও সেইসঙ্গে জমিদারির কাজকর্ম আমি তাঁর কাছ থেকে বুঝে নেব।···

শিলাইদহে আমার নূতন জীবন শুরু হল— আমি যেন ইংলণ্ড-আমেরিকার পল্লী-অঞ্চলের একজন সম্পন্ন-কৃষাণ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে খেত তৈরী হল, আমেরিকা থেকে আমদানি হয়ে এল ভুট্টার বীজ ও গৃহপালিত পশুর জাব খাবার মতো নানাবিধ ঘাসের বীজ। এ-দেশের উপযোগী করে নানারকম লাঙল, ফলা ও কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরী করা হল— এমন কি, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য ছোটোখাটো একটি গবেষণাগারের পত্তন হল।"

শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ কর্মের যে রথ চালাবার জন্য রেখে এসেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি; রথীন্দ্রনাথের 'সম্পন্ন কৃষাণ'-জীবন সেখানে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

পত্র ৬০। "আপনি যদি মেয়ো হাসপাতালে থাকতে ইচ্ছা করেন তবে এইসঙ্গে সেখানকার অধ্যক্ষ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে যে পত্রখানি দিলুম···"

কলকাতার মেয়ো হাসপাতালের তৎকালীন রেসিডেন্ট সুপারিন-

টেনডেন্ট ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁর হাসপাতালস্থ বাসভবনের প্রশস্ত ছাদে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কখনো কখনো বন্ধু-সম্মিলন হত। মেয়ো হাসপাতালে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথকে যে চিঠিখানি লিখে দিয়েছিলেন তা 'স্মৃতি' [১৯৪১] গ্রন্থ থেকে (পৃ. ১০১) উদ্ধৃত হল—

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন,

জোড়াসাঁকো

কলিকাতা

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পায়ে অকস্মাৎ ক্ষত হইয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে এইজন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আপনার চিকিৎসাধীনে থাকিলে তাঁহার উপকার হইবে এবং যত্ন ও শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে না নিশ্চয় জানি এই কারণে তাঁহাকে মেয়ো হাঁসপাতালে আশ্রয় লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। পূর্ব্বেও আপনার সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছি এইজন্য পুনশ্চ আপনাকে আমার বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিলাম। ইনি অল্পেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন বিশেষত এই পা লইয়া ইঁহাকে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ করিতে হইল বলিয়া ইনি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার নিকট হইতে যত্ন ও আশ্বাস পাইলে ইঁহার মনে বলসঞ্চার হইতে পারিবে এবং আরোগ্যও সহজ হইয়া উঠিবে এই আশা করিয়া আপনার হস্তে ইঁহাকে সমর্পণ করিতেছি— ইঁহার ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়ো হাসপাতালে চিকিৎসা লাভ করেছিলেন

কি না জানা যায় না, তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে ফাল্গুন ১৩২০ বঙ্গাব্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে জানা যায় "একবার মনোরঞ্জন-বাবুকে দেখিতে জেনেরাল হাঁসপাতালে যাইতে হইয়াছিল…।"

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের নয়খানি চিঠি সংকলিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকায় শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫ সংখ্যায়।

পত্র ৬১। রথীন্দ্রনাথের বিবাহের তারিখ ১৪ মাঘ ১৩১৬, বৃহস্পতিবার। বর্তমান পত্রখানি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে আসার আগে ২৬ মাঘ লিখেছিলেন, এইরকম অনুমান করা যায়।

"রথীর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল…"

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী বিনয়িনী দেবী ও শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে ১৪ মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়।

পত্র ৬২। "সন্তোষ পাঁচটি গাভী সংগ্রহ করিয়া এখানে গোষ্ঠলীলা আরম্ভ করিয়াছে।"

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতন' আশ্রমের সীমানার মধ্যে আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেন, সেইজন্য বিদ্যালয়ের ভোজনশালায় দীর্ঘকাল নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা ছিল। বালকদের খাদ্যপদার্থের তালিকায় পুষ্টির জন্য দুধকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হত; অথচ বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ সংগ্রহ করা সেকালে বিশেষ সমস্যা ছিল। সেইজন্য প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের নিজস্ব গো-শালার কথা চিন্তা করেছিলেন, দু-চারটি গো-পালনের ব্যবস্থাও করেন। হাজারিবাগ থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে ২১ চৈত্র ১৩০৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ

এই প্রসঙ্গে লেখেন—

"বোলপুরে দুগ্ধের বড়ই টানাটানি। এখান হইতে একটা গাভী ও একটা মহিষ সেখানকার ছাত্রদের জন্য কিনিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি। পথের খরচ অনেক লাগিবে— প্রায় প্রত্যেকটা জন্তুটাতে কুড়ি টাকা— কিন্তু সেও স্বীকার করিতে হইতেছে— বোলপুরে বহু চেষ্টায় পয়স্বিনী গাভী জুটাইতে পারি নাই। আশ্রম আছে অথচ ধেনুর অভাব ইহা অসঙ্গত।"

চেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের গো-শালার পরিকল্পনা সফল হয় নি। সেজন্য বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র যখন আমেরিকা থেকে গো-পালন বিদ্যা শিখে দেশে ফিরলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্রম-বিদ্যালয়ের কাছেই গো-শালা তৈরি করে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আশা ছিল, এই ব্যবসায়ে সন্তোষচন্দ্র যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে সচ্ছলভাবে পরিবার প্রতিপালন করতে পারবেন, অন্য দিকে বিদ্যালয়ের দুগ্ধ-সমস্যারও সমাধান হবে।

সন্তোষচন্দ্রের গো-শালা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এতদূর উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, তাঁর জন্য এলাহাবাদ থেকে উৎকৃষ্ট জাতের ছাগল আনাবার চেষ্টাও করেছিলেন।[১]

সন্তোষচন্দ্র কিন্তু এই ব্যবসায়ে কৃতকার্য হতে পারেন নি, তিনি অবশেষে বিদ্যালয়ের কর্মে যোগ দেন। বোলপুরের অনুর্বর জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে এবং সুলভে পশুখাদ্য উৎপাদনের অসামর্থ্যই সাফল্যের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পত্র ৬৩। "হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অবস্থা খুব ভাল বলিয়াই

১. দ্রষ্টব্য, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৩-সংখ্যক চিঠি, 'দেশ' ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ১৪।

জানি। সুরেন তাহার সেক্রেটারি।"

পাটনার অধ্যাপক অম্বিকাচরণ উকিলের অনুপ্রেরণায় সমবায়নীতিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯০৭ খৃস্টাব্দে কলকাতায় ১৪ নম্বর হেয়ার স্ট্রীটে রেজিস্টার্ড অফিস করে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্‌ ইন্‌সুরেন্স সোসাইটি নামে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সুরেন্দ্রনাথ এই বীমা-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও প্রধান কার্য-নির্বাহক (Chief Executive Officer), ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অর্থসচিব (Treasurer), এবং অম্বিকাচরণ উকিল সংগঠক (Organizer) মনোনীত হন।

এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম-শতবার্ষিক সমিতি-প্রকাশিত, শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুভাষ চৌধুরী -সম্পাদিত 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলনগ্রন্থে' (প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৭৯) ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী -লিখিত 'সুরেন্দ্রনাথ-স্মৃতি' প্রবন্ধ (পৃ. ১২৫-১২৯)।

পত্র ৬৫। "অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ"

ঘটকর্পর-রচিত 'নীতিসার' কাব্যগ্রন্থভুক্ত শ্লোকের অংশ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বিলাতযাত্রার আগে আমেদাবাদে থাকাকালীন (১৮৭৮ খৃস্টাব্দ) 'ডাক্তর যোহন হেবরলিন -কর্তৃক সমাহৃত' কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হন। অধিকাংশ সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের মূলে পূর্ব-উল্লিখিত গ্রন্থ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত 'নবরত্নমালা' (প্রকাশ ১৯০৭) গ্রন্থেও এই শ্লোক বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত।

পত্র ৬৭। "আমি এখন শিলাইদহে ছুটিটা রথীর আতিথ্যে যাপন

করিতেছি।"

এই সময় রথীন্দ্রনাথ শিলাইদহে কৃষিকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। এ-বিষয়ে ৫৯-সংখ্যক পত্র-পরিচয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও এইসময় রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে কৃষিকর্মে যোগ দিয়ে সপরিবারে শিলাইদহে বসবাস করছিলেন।

পত্র ৬৮।..."বিদ্যালয়ের জন্য তিন হাজার টাকা শতকরা বারো টাকা সুদে ধার লইয়াছি..."

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে রবীন্দ্রনাথকেই প্রধানত এর আর্থিকভার বহন করতে হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো বন্ধু ও হিতৈষীর কাছ থেকে কখনো কখনো তিনি আনুকূল্য লাভ করেছেন। ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য কিছুকাল প্রতি বছর এক হাজার টাকা রাজ্যের সরকারি তহবিল থেকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রথম যুগের অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন এক হাজার টাকা বিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তার জন্য দান করেন, সে-কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের অর্থ-সংকট প্রথমাবধিই ছিল। এই বিদ্যালয়ের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন না নেওয়ার যে-নীতি অবলম্বন করেন, এই আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যই শেষপর্যন্ত তা বিসর্জন দিতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অভাব মোচনের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা তাঁর রচনার একটি অংশ উদ্ধৃত করলে অনেকখানি স্পষ্ট হবে—"ছেলেদের অন্নবস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই জোগাতে হত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত।... আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু কিছু করে বিক্রয় করতে হল। এ-দিকে ও-দিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল

তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলুম— নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল।"[১]

পত্র ৬৯। "আমাদের য়ুরোপ যাওয়া স্থির হয়ে গেছে।"
এইসময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে দীর্ঘকালের জন্যে দূরে কোথাও ঘুরে আসার তীব্র ব্যাকুলতা জন্মেছিল। এর জন্য কিছু আয়োজনও সম্পন্ন হয়, কিন্তু নানাকারণে এই যাত্রা সম্ভব হয় নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' দ্বিতীয় খণ্ডে 'ডাকঘরের পূর্বে ও পরে' অধ্যায়ে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পত্র ৭০। "অপমান ত অনেক সহিয়াছি— বোধ করি সম্মানও সহ্য করিতে পারিব।"
রবীন্দ্রনাথকে লেখা মনোরঞ্জনের চিঠিটি এখানে মুদ্রিত হল—

Sambalpur
১৬. ১১. ১৩

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মুখুর্য্যে মহাশয়[২] যখন আপনাকে L. L. D[৩] উপাধি দিলেন এখানে কেহ কেহ বল্লেন 'আহা খুব হোলো'— আমার মনে হোলো বিশেষ কিছুই হোলো না। এটা যদি বিলেত যাবার আগে হোতো তাহলে মুখুর্য্যে মহাশয়ের appreciation এবং independence এর কতকটা পরিচয়

১. 'বিশ্বভারতী' (প্রকাশ ৭ পৌষ ১৩৫৮) গ্রন্থভুক্ত।
২. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
৩. মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টতই ভ্রমক্রমে D. Litt উপাধিকে L. L. D বলে উল্লেখ করেছেন।

হোতো। বিলাত থেকে ফেরবার পর আর এ উপাধির বড় বেশী কিছু মূল্য ছিল না। এতে মুখুর্য্যেমহাশয় কেবল নিজের লজ্জা নিবারণ কল্লেন মাত্র।

কিন্তু আজকের কাগজের সংবাদ একেবারে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আজ আমার বুক দশ হাত আমি যে বাঙালী শুধু তাই বলে নয়। আমি আপনার সাক্ষাৎ পরিচিত ও অনুগৃহীত? এর স্পর্দ্ধায় আর আমার রাখতে জায়গা নাই। আজ যখন পাঁচজন আমার কাছে এসে আপনার Nobel Prize পাবার কথা বলে congratulate কচ্চে তখন যেন আমি একটা আপনার পক্ষীয় লোক বলে কত বড় একটা গৌরব অনুভব কচ্চি তা আপনাকে কেমন করে জানাবো।

আপনি মহাশয় একটু সাবধান হবেন। জগৎব্যাপী সুকীর্ত্তি তার ঐশী আশীর্ব্বাদ আপনার কাছে ব'য়ে এনেছে তা ত জেনেচেনই। এ আশীর্ব্বাদ আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করে লোককোলাহল থেকে সরে যান। তা না হলে সর্ব্বদা এই কথারি আলোচনা আপনার কানের কাছে করে করে আপনার Geniousকে কোনোরকমে না effect করে, কেন না—

"তারা তোমার নামে বাটের মাঝে
মাশুল লয় যে ধরি।
দেখি শেষে ঘাটে এসে
নাইক পারের কড়ি" ইত্যাদি--

তাদের আলোচনার মাশুল অলক্ষ্যে দিতে দিতে 'পারের কড়ি'তে কম না পড়ে যায়।— পরিশেষে আমাকে যে গৌরবের অধিকারী করেচেন তার জন্য সংখ্যাতীত ধন্যবাদ গ্রহণ করে আমাকে অনুগৃহীত করেন।

ভবদীয়

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে অপমান সহ্য করার যে উল্লেখ করেছেন, তা স্পষ্টত তাঁর সাহিত্য, সমাজচিন্তা, ধর্মবোধ ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ তুলে চন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট স্বদেশবাসীদের সুদীর্ঘকালের বিরোধিতার দিকে লক্ষ করে লেখা।

মনোরঞ্জন তাঁর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধিদান প্রসঙ্গে যে অভিযোগ করেছেন, তা আংশিক সত্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সংবাদের পরে (২৬ ডিসেম্বর ১৯১৩) অনুষ্ঠিত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের অধিবেশনে ডি. লিট. উপাধিদানের প্রস্তাব গৃহীত হয় এই ঘটনার পূর্বেই। অবশ্য, ইংল্যাণ্ডে ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হবার পর পাশ্চাত্যদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতির সংবাদ নানাভাবে এ-দেশে কিছু কিছু প্রচারিত হয়েছিল।

পত্র ৭১। "সত্য বলিয়াছিলাম বলিয়া দেশের অনেক লোক রাগ করিয়া আমাকে গালি দিতেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদে কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনযোগে অনেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, এঁদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত (৭ অগ্রহায়ণ ১৩২০) এই সংবর্ধনা-সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাষণে দেশবাসী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির পূর্ব-বিরোধিতার কথা স্মরণ করে কিছু রূঢ় মন্তব্য করেন,[১] এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১. 'সঞ্জীবনী' পত্রের ২৮ নভেম্বর ১৯১৩ (১২ অগ্রহায়ণ ১৩২০) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই মৌখিক ভাষণটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা Calcutta

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, আলোচ্য পত্রে তার ইঙ্গিত আছে।

পত্র ৭৩। "বন্দেমাতরমের নামে দেশে যে একটা হুজুগের ঢেউ উঠিয়াছে সেটার ত একটা Psychology আছে— ঘরে বাইরে গল্পে তারই আলোচনা চলিতেছে।..."

ভারতবর্ষের পরাধীনতামোচনের উপায় হিসেবে সন্ত্রাসবাদের পথকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন সমর্থন করেন নি, সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তাঁদের পথ রবীন্দ্রনাথের কাছে নীতিহীন বলে মনে হয়েছে। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রকে এঁরা গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপে দেশমাতার শৃঙ্খলমোচনের নামে দেশে 'হুজুগের ঢেউ' বয়ে যায়— এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের এই মতই প্রকাশ পেয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জনে সন্ত্রাসবাদের পথকে রবীন্দ্রনাথ কী দৃষ্টিতে বিচার করেছিলেন, তাঁর নানা প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে তার পরিচয় আছে। দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর আক্রমণের খবরে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ১০ পৌষ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে জগদানন্দ রায়কে আমেরিকা থেকে একটি চিঠিতে[১] লিখছেন—

"কাল হঠাৎ সকালে খবরের কাগজে পড়া গেল দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর কে একজন বোমা ছুঁড়ে মেরেছে। পড়ে আমার মনটা অত্যন্ত পীড়িত হচ্ছে। আমরা মনে করি পাপকে আমাদের কাজে লাগাব, কাজ ত গোল্লায় যায় তারপর সেই পাপটাকে সামলায় কে? এ যে

Municipal Gazette (13 Sept. 1941)-এ 'The Poet's Reply to the Nobel Prize Deputation' নামে (Part II, pp. xxii) এই ভাষণটি পুনর্মুদ্রিত।

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬, পত্র ১১

চালুনিতে করে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা। পৃথিবীতে যারা সদুপায়ে অর্থ উপার্জন করাটাকে বিলম্বজনক ও কষ্টসাধ্য মনে করে তারাই সিঁধ কেটে বড় মানুষ হতে চায়। আমাদের হতভাগ্য দেশে আমরা যথার্থ ত্যাগস্বীকার করে দেশের কাজ করতে কষ্ট বোধ করি বলেই আমাদের ওখানেই একদল বীরপুরুষ বোমা ছুঁড়ে দেশ উদ্ধার করতে চায়। এই বোমা কোন্‌খানে গিয়ে পড়ে বল দেখি? একেবারে স্বদেশলক্ষ্মীর মঙ্গলঘটের উপরে। আমাদের দেশে দুর্গতি ত নানা আকারেই বিরাজ করচে, তার উপরে আবার এই সয়তানটাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিলে কে? একে ত সহজে বিদায় করতে পারবে না। এখন থেকে ক্ষণে ক্ষণে অকস্মাৎ কোন্ অন্ধকার থেকে এ হঠাৎ আমাদের উপর এসে পড়ে আমাদের ভাঙা কপালকে আরো ভাঙবে।"

'ঘরে বাইরে' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে সবুজপত্রে প্রকাশিত হবার সময়েই (১৩২২ বঙ্গাব্দ) এর নানারকম প্রতিকূল সমালোচনা হতে থাকে। এই উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য চরিত্র সন্দীপকে রবীন্দ্রনাথ দেশের সন্ত্রাসবাদীদের টাইপচরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে স্বদেশভক্ত সন্ত্রাসবাদীদের হেয় করেছেন, এরকম অভিযোগও উঠেছিল।

এই উপন্যাস বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পরিশেষ অংশে (১৯৬১) তা সংকলিত হয়েছে।

"বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যে মাঘের মাঝামাঝি একটা অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছে—"

১৩২২ বঙ্গাব্দে অনাবৃষ্টিজনিত শস্যহানির ফলে বাঁকুড়ায় যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার সাহায্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায়, মাঘোৎসবের পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় করেন। এই

অভিনয়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ 'বৈরাগ্যসাধন' নামে একটি নাট্যভূমিকা লিখে দেন, তা ফাল্গুনীর পূর্বে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বৈরাগ্যসাধনে' কবিশেখরের এবং 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই অনুষ্ঠান-উপলক্ষে 'বাঁকুড়ার নিরন্নদের জন্ম অন্নভিক্ষাকল্পে ফাল্গুনী অভিনয়' নামে একটি অনুষ্ঠানপত্রী প্রকাশিত হয়।

পত্র ৭৫। ৭৪-সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটা' আলোচনা করেছেন। অনুমান করা চলে যে, মনোরঞ্জন এই নাটক সম্বন্ধে আরো কিছু প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকে করায় তার উত্তরে এই চিঠি লেখেন।

পত্র ৭৬। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬-১৭ খৃস্টাব্দে জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণের শেষে দেশে ফেরার পর এই চিঠিটি লেখেন। তিনি কলকাতায় আসেন ১২ মার্চ ১৯১৭ (২৮ ফাল্গুন ১৩২৩)। রথীন্দ্রনাথের 'সম্বলপুর প্রয়াণের' কথা বিষয়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন, তাঁর মাতৃদেবীর জীবদ্দশায়, অর্থাৎ ১৯১৮ খৃস্টাব্দের আগেই রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক তাঁদের সম্বলপুরের বাড়িতে যান।— এ সমস্ত তথ্য এবং পত্রশেষে নববর্ষের উল্লেখ থেকে এই চিঠির রচনাকাল অনুমিত।

"একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় সমুদ্রতীরে ঘুরপাক খাইয়ে আবার আমাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে।"

১৯১৬ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার নিউইয়র্কের James B. Pond, Lyceum-এর পক্ষ থেকে সে দেশে কতকগুলি বক্তৃতা দানের আমন্ত্রণ পান। আমন্ত্রণের শর্ত ছিল— এই প্রতিষ্ঠানের

ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার নানা প্রতিষ্ঠানে চল্লিশটি বক্তৃতা দেবেন এবং প্রতি বক্তৃতার জন্য পাঁচশো ডলার সম্মানদক্ষিণা পাবেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন দূর করার জন্য এই অর্থ বিশেষ সহায়ক হবে, প্রধানত এই আশায় রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ৩ মে ১৯১৬ (২০ বৈশাখ ১৩২৩) আমেরিকার উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে জাহাজযোগে যাত্রা করেন। তিনি আমেরিকার পথে জাপানে তিন মাস ও আমেরিকায় কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্ব চার মাস ছিলেন। নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতাসূচী শেষ হবার আগেই আমেরিকা ত্যাগ করেন, ফেরার পথে আবার তিনি জাপান হয়ে আসেন।

আমেরিকা যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ জাপানে যে তিন মাস ছিলেন, সেই সময় অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন, এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **'The Message of India to Japan'** এবং **'The Spirit of Japan'**।

আমেরিকার নানা জায়গায় ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৬ থেকে ২০ জানুয়ারি ১৯১৭, রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চাশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন অথবা নিজের রচনা থেকে পাঠ করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদ (Cult of Nationalism)। এই উপলক্ষে আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, একত্রিশটি বিভিন্ন শহরে তাঁকে যেতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য শ্রীসুজিত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের **'Passage to Amarica'** গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পত্র ১১। "'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বক্তৃতাটি..."

এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ কলকাতা রামমোহন লাইব্রেরি হলে ৪ আগস্ট

১৯১৭ খৃস্টাব্দে পাঠ করেন, পরে ১১ আগস্ট তারিখে আলফ্রেড থিয়েটারেও পঠিত হয়।

পত্র ১৮। "আপনার আত্মজীবনীর একটি ছোট অধ্যায় পড়ে আমার খুব ভাল লাগল। সন্তোষকে দেব, ওদের শান্তিনিকেতনে বের করবে।" এই রচনাটি শান্তিনিকেতন পত্রের তৎকালীন সম্পাদক সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত দিয়েছিলেন কি না, জানা যায় না। শান্তিনিকেতন পত্রে এটি প্রকাশিত হয় নি। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র করুণাকিরণ আমাদের জানিয়েছেন, তাঁর পিতা আত্মজীবনীটি কোনো কারণে বিনষ্ট করেন।

"এখানে আমাদের কাজ হঠাৎ নানা শাখাপ্রশাখায় অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েচে।"
এই পত্র যে সময়ে লেখা তার অল্পকাল আগে, ৮ পৌষ ১৩২৮ (২৩ ডিসেম্বর ১৯২১) আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাসভায় বিশ্বভারতী সোসাইটির পরিষদ্ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর সংস্থিতি (Constitution)ও গৃহীত হয়। এর আগে ১৮ আষাঢ় ১৩২৬ রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রারম্ভোৎসব সম্পন্ন করে বিশ্বভারতীর কাজ আরম্ভ হয়েছিল।

রায়পুরের কর্নেল নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে সুরুলগ্রামের সন্নিহিত কুঠিবাড়ি কেনেন, সেটিকে কেন্দ্র করে ১৯২২ খৃস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতী কৃষিবিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। অল্পকালের মধ্যেই এই বিভাগের কাজের প্রসারণ ঘটে এবং এটি 'বিশ্বভারতী পল্লীসংগঠনবিভাগ' নামে পরিচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই বিভাগের কর্মকেন্দ্র কুঠিবাড়ি ও তার সংলগ্ন পল্লীর নামকরণ করেন 'শ্রীনিকেতন'।

এই সময়েই বিশ্বভারতীর নিজস্ব গ্রন্থপ্রকাশনা বিভাগ প্রতিষ্ঠার চিন্তাও আরম্ভ হয়।

"আমার এখানে সমুদ্রপার থেকে কেউ কেউ আসচেন তাঁদের কাছ থেকে অনেক কাজ পাওয়া যাচ্চে।"
এই পত্ররচনাকাল পর্যন্ত সমুদ্রপার থেকে যে-সমস্ত বিদেশী কর্মী শান্তিনিকেতনের কর্মের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : J. W. Petavel, W. W. Pearson, C. F. Andrews, L. K. Elmhirst এবং Stella Kramrisch।

১৯১৩ খৃস্টাব্দে Petavel শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দিয়ে কয়েকমাস বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। Pearson ও Andrews উভয়েই ১৯১৪ খৃস্টাব্দে বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। Elmhirst আসেন ১৯২১ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে, তাঁর অর্থানুকূল্য ও সক্রিয় সহযোগিতায় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে Stella Kramrisch শান্তিনিকেতনে কর্মীরূপে যোগ দিয়েছিলেন।

পত্র ৭৯। "আপনি এতবড় অদ্ভুত ভুল করলেন কি করে? আপনার সঙ্গে আমার বর্ণিত হেডমাস্টারের কোন্‌খানে মেলে?"
শান্তিনিকেতন পত্রের ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যায় 'আলোচনা : বিশ্বভারতীর কথা,'[1] শীর্ষক একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"এক সময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেডমাস্টারের নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাশের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাশ হয়ে গেছে।'— তিনি তো

১. 'বিশ্বভারতী' (৭ই পৌষ ১৩৫৮) গ্রন্থভুক্ত।

এলেন, কিন্তু কয়েকদিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন-না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই-বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল— ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাশের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তার বনল তা,. তিনি বিদায় নিলেন। তারপর থেকে আর হেডমাস্টার রাখি নি।"

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রায় আরম্ভে বৎসরকাল প্রধান অধ্যাপকের পদে ছিলেন, এই বইয়ের ১২-সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা চলে, 'শান্তিনিকেতন' পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ঐ রচনাটি পড়ে মনোরঞ্জনের ধারণা হয়, বর্ণিত হেডমাস্টার তিনিই।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কথা' গ্রন্থে "পূর্ব-স্মৃতি" রচনায় লিখেছেন (পৃ. ২৬), "নগেনবাবু [নগেন্দ্রনারায়ণ রায়] রামপুরহাট হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। কুঞ্জবাবুর অবসর গ্রহণের পরে তিনি আশ্রমের অধ্যাপক হন।··· 'স্মৃতি'তে ৮৫ পৃষ্ঠায় কবি এঁরই বিষয় লিখেছেন, মনে হয়।"

"দেশে দেশে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে কলকাতায় শারদোৎসব অভিনয়ের পর (অ্যালফ্রেড থিয়েটার ও ম্যাডান থিয়েটার :

১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২), রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২২ পশ্চিম ভারত ও সিংহল ভ্রমণে বের হন, ডিসেম্বরের শেষের দিকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এভাবে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল, নব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ।

পত্র ৮২। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের গুজরাট ভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী গৌরগোপাল ঘোষ পোরবন্দর থেকে রথীন্দ্রনাথকে ২৭ নভেম্বর ১৯২৩ খৃস্টাব্দে একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, "22nd Nov. এখানকার Club Houseএ গুরুদেব খুব কম কিন্তু selected audienceএর কাছে বিশ্বভারতীর ideal সম্বন্ধে বললেন।··" বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত এই মূল পত্র অনুসারে বর্তমান পত্রের কাল অনুমান করা হয়েছে।

পত্র ৮৫। "···এই পরীক্ষা-পাস করাবার ইস্কুলটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বভারতীর আদর্শসঙ্গত জিনিষ নয়—"
শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের যে আদর্শরূপ রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ছিল, বাস্তবে নানা কারণে তা কোনোদিনই সমগ্রভাবে রূপায়িত হতে পারে নি। প্রথম থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে, পরোক্ষভাবে হলেও, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম যুক্ত হয়ে পড়েছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বরাবরই প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্‌ট্রান্স ও পরবর্তীকালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিত। ছাত্রদের ইন্‌স্পেক্টর অফ্ স্কুলস্-আয়োজিত টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হত। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই, ভাইস চ্যান্সেলর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সরাসরি ছাত্র পাঠানোর অধিকার দেন।

কিন্তু দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা-পাস করানোই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হয়ে উঠুক, রবীন্দ্রনাথ তা কোনোদিনই প্রসন্নমনে স্বীকার করে নিতে পারেন নি; বিশেষত বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরও পরীক্ষা পাসের দিকে বিদ্যালয়ের এরকম নির্ভরতা তাঁকে হতাশ করে। কিন্তু অভিভাবকদের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর আদর্শ বিদ্যালয়ে সর্বাংশে প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি; উপরন্তু বিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষকও অভি-ভাবকদের মতের সমর্থক ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ১৬ জানুয়ারি ১৯২৬ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে লিটন এরূপ মন্তব্য করেছেন: "Visva-Bharati is at present unique and as you say it has grown from within and owes its success to its independence from conventional standards.… I see no reason whatever why it should not some day enjoy a charter of its own and challenge competition with Universities of a different stamp."[১]

পত্র ৮৭। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা দানের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য তাঁকে কলম্বো থেকে শান্তিনিকেতনে

১. শ্রীসনৎকুমার বাগচী-রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ' গ্রন্থের (প্রকাশ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ) "লিটন ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে মূল পত্রের বঙ্গানুবাদ (পৃ. ৫৮-৬০) প্রকাশিত।

ফিরে আসতে হয়। এই সময় ডাক্তার নীলরতন সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী diathermic ray নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা যেতে হয়েছিল। ২৫ জুলাই ১৯২৮ খৃস্টাব্দে তিনি রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখছেন, "নীলরতনবাবু আমার শরীরের জন্যে Diathermic চিকিৎসার পরামর্শ দিচ্চেন তাই প্রশান্তরা কলকাতায় আমাকে টানাটানি করচে।" ৩০ আগস্ট ১৯২৮ রথীন্দ্রনাথকে এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, "আজ ডাক্তারের ডায়াথার্ম্মিক থেকে ছুটি পেয়েচি।..."

এই সময়ে একাধিক ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে তাঁর মাসাধিক কাল শয্যাশায়ী থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুমান করা যেতে পারে, আলোচ্য চিঠিখানি এই সময়ের রচনা।

সুস্থ হয়ে উঠে আবার ইংল্যাণ্ড যাবেন, রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা থাকলেও কার্যত তা সম্ভব হয় নি। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে, প্রায় দুবছর পর হিবার্ট বক্তৃতাদানের (The Religion of Man) জন্য ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন।

"যেখানে দৈবক্রমে জন্মেছি সেই কি আমার সত্য জন্মভূমি ?"
ইয়োরোপের মানুষ তাঁদের সম্পূর্ণ অপরিচিত সুদূর প্রাচ্যজগতের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে একদা তাঁদের আত্মীয়রূপে গভীর শ্রদ্ধা-প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের এই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে, ১৯৩০ সালের ২৬ আগস্ট লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন—

"কোথা থেকে জানি নে আমি এসেচি এই পৃথিবীর তীর্থে; আমার তীর্থদেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েচেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্ম্মাল্য ললাটে পরে যাই তখন সব জাতের

লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে, যখন ভারতবর্ষীয়দের মুখোস পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন এরা মানুষরূপে দেখে তখনি এরা আমাকে ভারতবর্ষীয়রূপেই শ্রদ্ধা করে, যখন নিছক ভারতবর্ষীয়রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলার পথ ভুল বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে।"

এশিয়ার দূরপ্রান্তবর্তী বিচিত্র জনসমাজের সঙ্গে যোগ, তাঁদের আত্মীয়তা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করেছিল। নিজের জন্মভূমিতে সুদীর্ঘকাল তাঁর স্বদেশবাসী একাংশের অস্বীকৃতি, বিরুদ্ধতা, এমন-কি অহেতুক বৈরিতার তুলনায় এই প্রীতি, নিঃসন্দেহে তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। পৃথিবীর সকল দেশই যে তাঁর দেশ, সকল মানুষই তাঁর স্ব-জন, স্বভাবগত তাঁর এই প্রত্যয় দেশান্তরের অভিজ্ঞতায় দৃঢ়তর হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গ বার বার আলোচনা করেছেন, এ-রকম তিনখানি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্‌ধৃত হল।

আর্জেন্টিনার বুয়োনেস এয়ারিস থেকে ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ২২ নভেম্বর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখছেন—

"এখানকার সকলে যে কত গভীর আত্মীয়তার সঙ্গে আমাকে ভালবাসে তা দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। এখানেই আমার বাসা বাঁধা উচিত ছিল, কেননা এরা সত্যই আমাকে চায় এবং আমার কাছ থেকে কিছু সত্য চায়।... জন্মভূমিতে আমাদের আত্মীয়ের কাছ থেকে আমরা সহজেই ভালোবাসা এবং সাহচর্য্য চাই,— কিন্তু আমাদের মানস-আমি, সেও কি মানুষের কাছ থেকে দরদ চায় না, সেও কি মানুষের কাছ থেকে পুরো মূল্য না পেলে নিজেকে দরিদ্র জ্ঞান করে দুঃখ পায় না? সেই আমার মানস-আমি, আমার জন্মভূমিতে অধিকাংশ কালই

লক্ষ্মীছাড়া গৃহছাড়া হয়ে কাটিয়েছি।··· এসব দেশে আমি যে গভীর ভালোবাসা পাই সেটা জন্মগত আত্মীয়তার জিনিস নয়, সে যে মর্মগত আত্মীয়তার জিনিস—তার চেয়ে বহুমূল্য আর কিছু নেই, এই ভালবাসার অজস্র দাক্ষিণ্য দেখে আমি বিস্মিত হই।"

১৯৩০ খৃস্টাব্দে শেষবার ইয়োরোপ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মদিনে প্যারিস থেকে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখছেন—

"আজ আমার জন্মদিন। এখানে যে রবীন্দ্রনাথ আছে সে এখানকার উপকরণ নিয়ে নিজেকে একটা সম্পূর্ণতা দিয়েছে। তার সঙ্গে পঁচিশে বৈশাখের রবি ঠাকুরের মিল হবে না। দেশে ফিরে গেলে তবে আমি তাকে ফিরে পাব, সেখানকার সব কিছুর সঙ্গে। তার মূল্য কিন্তু ঢের কম, ভেজাল দেওয়া জিনিষের মতো। সেখানকার নানা হালকা এবং বাজে পদার্থে তাকে খাটো করেচে—বহু অকিঞ্চিৎকরতার সঙ্গে জড়িত হয়ে সে আত্মমর্যাদা ভুলে যায়। তাই সেখানে মন পালাই পালাই করে। অথচ সেখানে আকাশে বাতাসে রূপে রসে এমন কিছু আছে যা আমার মানস-খাদ্যের প্রাণপদার্থ। আসল কথা আমার বিশ্বপ্রকৃতি আছে সমুদ্রের ওপারে, মানব-প্রকৃতি আছে এপারে। এখানকার মানুষ আমাকে গভীর করে সম্পূর্ণ করে উদ্বোধিত করে, তাই নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারি। তাই আমার জন্মভূমি পূর্বে ও পশ্চিমে দ্বিখণ্ডিত।"

হেমন্তবালা দেবীকে ১৭ আগস্ট ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে একটি চিঠিতে এইরকম জানিয়েছিলেন—

"দেশের অধিকাংশ লোকে আমাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে না, এবং আমার আঘাতে অপমানে যথেষ্ট ব্যথিত হয় না, এই সত্যকে আমি স্বীকার করে নিয়েছি—বুঝেছি দেশের মধ্যে তার স্বাভাবিক কারণ রয়েচে।···

স্বদেশের বাইরে আমার জন্যে সুপ্রশস্ত ও স্থায়ী আসন আছে— যখন জীবলোক থেকে বিদায় নিয়ে যাব তখন আমার ভাগ্যবিধাতাকে অক্ষুণ্ণ প্রণাম নিবেদন করে যেতে পারব— তিনি আমাকে অনেক দিয়েছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে এই মিনতি জানিয়ে যাব যে বাংলাদেশে আর নয়।"

পত্র ৮৮। "…আবার আমার এখানকার সমস্ত কর্ম্মভার নিজে তুলে নিয়েছি—।"

এই সময় বিশ্বভারতীর পুনর্গঠন-উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়, কিন্তু যে সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য এই উদ্‌যোগ, তা সফল হয় নি। শেষে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় বিভাগের পরিচালনভার নিজে নেন (সেপ্টেম্বর ১৯২৮)। এই সংকলনের ৯০-সংখ্যক চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের কর্মভার নেবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন আশ্রমসচিবের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি উদ্‌ধৃত হল—

আশ্রমসচিব সমীপে

সবিনয় নিবেদন

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে দায়িত্বভার সম্পূর্ণরূপে আমি গ্রহণ করিয়াছি। আমার অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত বিদ্যালয়ের কোনো ব্যবস্থাই ঘটিতে পারিবে না ইহা জ্ঞাপন করিলাম। ইতি ২৫ নভেম্বর ১৯২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কানাডা যাত্রার প্রাক্‌কালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন

সমিতির কাছে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর অবর্তমানে প্রতিষ্ঠাতা আচার্যপদের (Founder President) দায়িত্ব পুত্র রথীন্দ্রনাথকে দেবার সিদ্ধান্ত জানান। ৫ মার্চ ১৯২৯ শান্তিনিকেতন সমিতি এক বিশেষ অধিবেশনে এ-সম্বন্ধে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন—

Resolved that the Santiniketan Samiti welcomes the idea and requests Rathindranath Tagore to discharge the President's function during his absence.

শান্তিনিকেতন সমিতির এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে বিশ্বভারতী সোসাইটির সদস্যগণের একাংশ এর বিরূপ সমালোচনা করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের মনোভাব জানা যায় নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ খৃস্টাব্দের এই চিঠিখানিতে[১]—

…"কিছুকাল পূর্ব্বে সংসদের সভায় রথীর প্রতি আমার ভারার্পণ সম্বন্ধে কোনো কোনো সভ্য বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, একি apostolic (?) succession হতে চলল! সে কথা শুনে অবধি বুঝতে পেরেছি আমাদের কর্ম্মে বুলির রাজত্ব বড়ো হয়ে উঠ্‌চে। যে ভার আমার সে ভার আমি প্রাণ দিয়ে পেয়েছি— আমিই জানি সে ভার কার উপরে দেওয়া চলে— কেবল ভোটের মধ্যে এমন মায়ামন্ত্র নেই যার দ্বারা ঠিক মত নির্ব্বাচন হতে পারে, সংসদে যে তা হয় না তার পরিচয় সর্ব্বদাই পাই, নতুবা গ্রন্থপ্রকাশ সমিতিতে প্রভাতের নির্ব্বাচন কোনোমতেই সম্ভবপর হত না। অসুস্থ শরীরেও যে-ভার আমি নিজের পরে নিয়েছি, তার দরদ কতখানি তা সেইসব সভ্যেরা কখনই বুঝবেন না যাঁরা বিশ্বভারতীর জন্ত যথার্থভাবে কিছুই ত্যাগ করেন নি। আমি যখন রথীর পরে ভার দিয়েছি— ভোটওয়ালা সভ্যদের সেই

১. দেশ, ১১ চৈত্র ১৩৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

দরদ না থাকতেই তারা বিচারের অধিকারী। রথীর সঙ্গে আমার আত্মীয় সম্বন্ধ আছে বলেই রথী বাধা পেত এবং বাধা পেয়েছে, সেই বিপদের সম্ভাবনা আমি স্বীকার করতে রাজি নই— ডিমক্রাসির জয়পতাকা শূন্যআকাশে অভ্রভেদী করবার উপলক্ষেও না। কিন্তু আমি বেশিদিন বাঁচব না— এবং অচিরকালের মধ্যেই ডিমক্রেসীর জয়পতাকা আমার সৃষ্টির বুক ফুঁড়ে আকাশে উড়বে। Apostolic successionএর কোনো আশঙ্কা নেই, আমি নিজের টাকা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে প্রাণপাত করে তার পথ বন্ধ করে দিয়েছি। আমার অবর্তমানে কি ঘটবে সে আমার অগোচর নেই। ইতিমধ্যে যে ডিমক্রাসি নিজে কিছুই দেবে না তারই ইচ্ছাসাধনের পথ প্রশস্ত করবার জন্যে আমি চললুম বিদেশে— ভিক্ষার ঝুলি এবং ক্ষীণ প্রাণ নিয়ে।..."

বিদেশভ্রমণের শেষে দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী পরিচালনা বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিনিকেতন-সচিবকে যে চিঠি লিখেছিলেন, অতঃপর তা মুদ্রিত হল—

ওঁ

আশ্রম সচিব মহাশয় সমীপে

নিবেদন—

যে পর্য্যন্ত এই শান্তিনিকেতনের সমস্ত কর্ম্মপরিচালনার ভার আমি পুনরায় প্রত্যক্ষভাবে নিজে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে না পারি ততদিন পর্য্যন্ত নিজে দায়িত্বস্বীকার করিয়া ইহার ব্যবস্থাভার শ্রীমান রথীন্দ্রনাথের প্রতি অর্পণ করিলাম। তিনি আমার প্রতিনিধিরূপে কাজ চালাইবেন। আশা করি সংসদ ইহাতে সম্মতি দিয়া আমার শ্রম ও চিন্তার লাঘব করিবেন। ইতি ৪ শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র ৮৯। পত্রশেষে 'শুক্লা ত্রয়োদশী'র উল্লেখ থেকে এই চিঠির তারিখ নিরূপণ করা হয়েছে।

"রথীরা এখনো আসিয়া পৌছায় নাই।"
১৯২৮ খৃস্টাব্দের ১৭ মে রথীন্দ্রনাথ প্রধানত চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য সপরিবারে ইউরোপ গিয়েছিলেন, ৯ নভেম্বর ১৯২৮ তাঁরা স্বদেশে ফিরে আসেন।

পত্র ৯০। "রথী ফিরে এসে কাজে লেগে গেছে। শ্রীনিকেতনের ভার সম্পূর্ণ তার উপরে।"
১৯২৮ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে ইউরোপ থেকে ফিরে রথীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন-সচিবপদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পত্র ৯১। "নাগপুর দিয়ে আসা সম্ভব হল না।"
১৯৩০ খৃস্টাব্দের ২ মার্চ হিবার্ট বক্তৃতাদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এই সময়ে তিনি ইউরোপ রাশিয়া ও আমেরিকা ভ্রমণ করে ৩১ জানুয়ারি ১৯৩১ বোম্বাইয়ে নামেন। বোম্বাই থেকে তিনি ইম্পিরিয়াল মেল ট্রেন ধরে এলাহাবাদ হয়ে কলকাতায় আসেন।

পত্র ৯৪। "অসুস্থ শরীর নিয়ে চলে গিয়েছিলুম বোটে,"
হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ২২ অক্টোবর ১৯৩৩ তারিখের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "শরীরটা ভালো নেই। ভাবছি বোটে করে গঙ্গাযাত্রা করব। খড়দহের সামনে বোট বাঁধা আছে।"

এরপর ৫ নভেম্বর ১৯৩৩ তারিখে আর একটি চিঠিতে লিখছেন, "দুর্ব্বল শরীর নিয়ে গিয়েছিলুম বোটে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সংগ্রহ করে দুর্ব্বলতর

অবস্থায় ফিরে এসেছি— কিছুকাল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের প্রয়োজন।"

"বিছানা থেকে মুক্তি পেলেই উঠ্‌তে হবে রেলগাড়িতে—"

বোম্বাই নগরীতে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইবাসী রবীন্দ্র-অনুরাগীদের আগ্রহে ও সরোজিনী নাইডুর বিশেষ উদ্‌যোগে রবীন্দ্র-সপ্তাহপালনের আয়োজন হয়। ২৩ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রসপ্তাহ-অনুষ্ঠানে 'শাপমোচন' ও 'তাসের দেশ' নাটক দুটি বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী ও কর্মীরা অভিনয় করেন, রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের এবং কলাভবনের ছাত্র ও অধ্যাপক-অঙ্কিত চিত্রের একটি প্রদর্শনী হয়, কারুশিল্পের নিদর্শনও এই প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই যাত্রায় বিশ্বভারতীর দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ কর।

Visva-Bharati News, February 1934 সংখ্যায় প্রকাশিত 'With Rabindranth in Bombay' শীর্ষক রচনায় এই ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

"স্টেট্‌সম্যানে যে সংবাদ পেয়েছেন সেটা আমার স্বাস্থ্যলাভের সংবাদ নয় সেটাতে আমার দুর্গ্রহের তাড়না সূচনা করচে।"

ঐ সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদটি সম্ভবত এই—

Two new Tagore Plays

Successful production in aid of Visva Bharati

A crowded house witnessed the successful production of Rabindranath Tagore's two new and unpublished

plays, 'Chandalika' and 'Tasher Desh' at the Madan Theatre last evening under the direction of the Poet···

The plays will be repeated today and on Friday.

—**The Statesman, Calcutta**
13th Sept. 1933

কলকাতার অভিনয় সম্বন্ধে *Visva-Bharati News*, Oct-Nov 1933 সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের প্রাসঙ্গিক অংশ—

Rabindranath's latest playlet 'Tasher Desh' was staged in Calcutta on the 12th, 13th and the 15th September last. Along with it Gurudeva read his new play 'Chandalika' in its entirety···

ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও প্রধানত বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথকে এই সমস্ত কাজে এগিয়ে আসতে হয়।

"চিঠি পেলেই উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বাভ্যাস আজও আছে সেইজন্য চিঠি যাতে না পাই সেই ব্যবস্থা করা হয়েচে—"

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন থাকায় রথীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করেন, রবীন্দ্রনাথকে লেখা সব চিঠিই সরাসরি তাঁর কাছে না পাঠিয়ে প্রথমে তাঁর একান্তসচিব সেগুলি দেখবেন, তার পর গুরুত্ব বুঝে তিনি প্রয়োজনীয় চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাবেন।

পত্র ৯৬। এই চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন একান্তসচিব

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর হস্তাক্ষরে লেখা, শেষে রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করেছেন।

"বাংলাদেশের দুর্গতির লক্ষণ প্রতিদিন পরিস্ফুট হয়ে উঠছে;···
এই সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নানাকারণে দূষিত হয়ে উঠেছিল। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা, কংগ্রেসের ভিতরে নীতিগত ব্যবধান ও দলাদলি, মন্ত্রীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীগত সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা—এ-সবের মধ্যে দুর্গতি-লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'আমার এই শেষ কয়দিন আমার আপন কর্মক্ষেত্রের একপ্রান্তে বসে শান্তিতে যাপন করতে ইচ্ছে করি'—এ-রকম ইচ্ছা প্রকাশ করলেও দেশের এই দুর্দিনে তাঁর পক্ষে নিরাসক্তভাবে বসে থাকা সম্ভবপর হয় নি। ২৮ নভেম্বর ১৯৩৮ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে তিনি জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লিখেছিলেন[১] তার মধ্যে তাঁর উদ্‌বেগের পরিচয় আছে। চিঠিটির অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত হল—

My dear Jawaharlal

I asked you to come and meet me not because I had any definite plan to discuss or any request to make. I merely wanted to know your own opinion about Bengal whose present condition puzzless me and makes me dispair. My province is clever but morally untrained and supercilious in her attitude towards her neighbours, she breaks into violent hysteric fits

১. প্রতিলিপি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

when least crossed in her whims. I know her weakness but I cannot maintain my detachment of mind and passively acquiesce in her doom of perdition…

পত্র ৯৮। "ক্লান্ত শরীর নিয়ে এই পাহাড়ে এসেছি।"
এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রায় একমাস মংপুতে ড. মনোমোহন সেন ও মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথের এই অবকাশ যাপনের বিবরণ দিয়েছেন।

"গীতা সম্বন্ধে আপনার বইখানি পেলুম।"
M. Banerjee, Advocate, 'Readings from the Gita' (First part) written originally for Gangadhar Sahitya Parisat on 20. 7. 1936. পুস্তিকাখানি বিনামূল্যে আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

পত্র ৯৯। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মজীবনে প্রবেশ-উপলক্ষে আশীর্বাদ।

পত্র ১০১। ৮ নভেম্বর ১৯৩৯ তারিখের *The Statesman* সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্রসহ এই খবরটি প্রকাশিত হয়—

Dr. Rabindranath Tagore was the guest of honour at a party given by Mr. N. R. Sarkar, Finance Minister, Bengal, at the latter's Calcutta residence. The poet is seen above on his arrival at the party, accompanied by his host.

সংবাদপত্রে প্রচারিত এই খবর পড়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ নভেম্বর ১৯৩৯ তারিখ সংবাদপত্রের কর্তিত অংশসহ রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠি লেখেন—

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ Statesmanএ এই ছবিটি দেখে আমার একটি দুঃখের কথা মনে পড়লো। আমার প্রথম পাঁচটি মেয়ের বিয়েতে আপনাকে ডাকতে সাহস করিনি। কেননা ভয় ছিল পাছে কোনো কারণে হয়ত আপনার কোনো বিশেষ অসুবিধা হয়। শেষ দুটী মেয়ের বিয়েতে সাহস করে আপনাকে ডেকেছিলুম। আপনি আসেন নি। মধ্যে মধ্যে কাগজে দেখেছি আপনি সময়ে সময়ে বিবাহাদিতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেচেন। আজ এই ছবিটি দেখেও মনে হোলো এ সৌভাগ্য থেকে কেবল আমিই বঞ্চিত হয়েচি। নলিনীরঞ্জন সরকার ধনী লোক কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি আন্তরিকতার দিকে থেকে তাঁর চেয়ে আমার আদর অভ্যর্থনা কোনো অংশে কম হোতো না বরং বেশীই হোতো। কিন্তু আপনি এলেন না। আমি ধনী নই আমি দরিদ্র, নলিনীরঞ্জন লক্ষপতি— মনে হয় হয়ত এই দারিদ্র্যই আমার সৌভাগ্যের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি যা কত আশা করে পাইনি, নলিনীরঞ্জন মহাশয় তা' সহজেই পেলেন।

কথাটা নতুন নয়— তবে আপনার কাছে ধনী ব'লে আকৃষ্ট হই নি। তাই আপনার কাছে এ অবহেলার কথা মনে হ'লে মনের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করি। শুধু ধনীর সঙ্গে কোনো বন্ধনে কখনও আসি নি, আসতে চাইও নি। ইতি ভবদীয়

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি মনোরঞ্জনের পূর্বোদ্ধৃত চিঠির উত্তরে লেখা।

১ নভেম্বর ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে নলিনীরঞ্জন সরকার রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কলকাতার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে যে চিঠি লেখেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ—

"আপনি ৫ই নভেম্বর কলিকাতা আসিবেন লিখিয়াছেন। এবার এখানে আসিয়া যদি আমার বাড়িতে একবার পদধুলি দিবার অবসর হয় তাহা হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। সে সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং আলাপ আলোচনা করিবার একটু সুযোগ কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে করিয়া দিতে চাই। ৫ই অথবা ৬ই নভেম্বর বিকালে যে কোনও দিন আপনার সুবিধা অনুসারে স্থির করিতে পারি।..."

নলিনীরঞ্জনের এই অনুরোধক্রমেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর যে ক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায়, তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখছেন—

"অনেক সময় এমন দুর্নিবার কারণ ঘটে যে আমার কাজের খাতিরেই অনুরোধ কাটিয়ে উঠতে পারি নে।"

নলিনীরঞ্জন তৎকালে দেশের আর্থিক জগতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির তখন তিনি প্রধান ব্যক্তি। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে নতুন ভারত শাসন আইন-অনুসারে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রীসভায় (ফজলুল হক-মন্ত্রীসভা) তিনি অর্থমন্ত্রী পদে ছিলেন। পরবর্তীকালে ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের (Executive Council) সদস্য হন। নলিনীরঞ্জনের সহায়তা বিশ্বভারতীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ২৯ আগস্ট ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি চিঠিতে নলিনীরঞ্জন লিখছেন—

"আমি আগামীকাল গোয়ালিয়র রওনা হইতেছি, কোন সুযোগ পাইলেই বিশ্বভারতী সম্পর্কে কিছু কাজ করিয়া আসিবার চেষ্টা করিব। বিশ্বভারতীর কোন উপকার করিবার সুযোগ পাইলে আমি তাহা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি; কারণ সকলের সমবেত শুভবুদ্ধির উপর এই প্রতিষ্ঠানের দাবী ভুলিবার নয়। Dr. Jenkins[1]-এর সঙ্গে আমার এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই; তবে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা ফিরিয়া তাঁহার সহিত আপনাদের সম্পর্কে আলাপ করার ইচ্ছা আছে। তখনই বিশ্বভারতীর বিষয়টি শেষ করিয়া ফেলিতে চাই; এবারকার বাজেটে বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন, Health Centre প্রভৃতি সব বিভাগের জন্য যাহাতে grant রাখিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব।..."

ইতিপূর্বে ১৯৩৭ সালে বাংলাদেশের বাজেটে নলিনীরঞ্জন বিশ্বভারতীর জন্য Capital Grant-এর সংস্থান রেখেছিলেন, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে তাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে এই তথ্য জানা যায়। শুধু এই সময়েই নয়, পরবর্তীকালেও নলিনীরঞ্জন নানাভাবে বিশ্বভারতীর সহায়তা করেছেন।

সুতরাং, বিশ্বভারতীর প্রয়োজনেই, ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নলিনীরঞ্জনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, নলিনীরঞ্জনের দুর্দিনে বিশ্বভারতী তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান করে যে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাতে তিনি সামাজিকভাবে বিশেষ উপকৃত হন।

১. তৎকালীন বাংলা সরকারের Director of Public Instruction.

সুবোধচন্দ্র মজুমদার (১৮৭৮ ? - ১৯৩০) রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জ্ঞাতিভ্রাতা। সুবোধচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন আষাঢ় ১৩০৯ বঙ্গাব্দে। শ্রীশচন্দ্রের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুবোধচন্দ্রের পরিচয় ঘটে, এরকম অনুমান করা যায়। তিনি প্রধানত ইংরেজি ও ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষকতা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন পীড়িতা মধ্যমা কন্যা রেণুকার স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় তাকে নিয়ে হাজারিবাগে ছিলেন (১৯০৩ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে), সেইসময় সুবোধচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ত্যাগ করে দিল্লীতে নব-প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আবার আশ্রম বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনেন। অক্টোবর ? ১৯০৩ খৃস্টাব্দে (আশ্বিন ১৩১০) রবীন্দ্রনাথ অবলা বসুকে একটি চিঠিতে লিখছেন, “ইংরাজি শিক্ষার সুবিধার জন্য আমি সুবোধকে আবার দিল্লি হইতে টানিয়া আনিয়াছি। সুবোধ ইংরাজি ভাল পড়াইত। দিল্লিতে সে হেডমাস্টার হইয়া আমাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছিল। আমি তাহাকে জবরদস্তি করিয়া এখানে ফিরাইয়াছি।…”

অনুমান করা যায়, ১৩১০ বঙ্গাব্দের পূজাবকাশের পর সুবোধচন্দ্র আবার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহে নিয়ে গিয়ে তাঁদের জমিদারির সদর কাছারির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে নিয়োগ করেন। ৩ বৈশাখ ১৩১৪, রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি চিঠিতে লিখছেন, “এই বৎসর হইতে সেখানে [শিলাইদহে] সুবোধচন্দ্রের রাজত্ব।” কিন্তু শিলাইদহের কাজেও সুবোধচন্দ্র বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেন নি। সেই বছরই পৌষ মাসে শিলাইদহে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তাঁর কন্যা লতিকার (লতু) মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুশোকে

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সুবোধচন্দ্র শিলাইদহ ত্যাগ করেন। ২ মাঘ ১৩১৪ রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে শ্রীশচন্দ্রকে জানাচ্ছেন, "সুবোধ অত্যন্ত অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে এখানে ফিরিয়া আসিয়া কাজে যোগ দিতে অক্ষম এইরূপ আমাকে জানাইয়াছে—বোধকরি জয়পুরে অথবা দিল্লীতে কোনো কাজের আশা পাইয়া থাকিবে।"

শিলাইদহ ত্যাগ করে সুবোধচন্দ্র জয়পুর রাজ্যের কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকালই সেখানে কাজ করে ফিরে আসেন এবং কাটোয়ায় প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর সে-কাজও ছেড়ে দিয়ে আবার জয়পুর রাজ্যের কাজে ফিরে যান। পরবর্তীকালে সুবোধচন্দ্র জয়পুর-রাজসরকারের কাজে বিশেষ উন্নতি করে রাজ্যের প্রধান সচিবপদে (Secretary Mahakma Khas) প্রতিষ্ঠিত হন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুবোধচন্দ্রের যোগাযোগ পরবর্তীকালেও অক্ষুণ্ণ ছিল। সুবোধচন্দ্র তাঁর তিন পুত্রকেই শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

নব পর্যায় বঙ্গদর্শন, সমালোচনী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাময়িকপত্রে সুবোধচন্দ্রের কিছু সাহিত্যচর্চার নিদর্শন আছে। তাঁর রচিত তিনখানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য : 'পঞ্চপ্রদীপ' (১৩১৮), 'সিপন' (১৩২৪), 'আমাদের গ্রাম' (১৩৩২ ?)।

•

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

পত্র ১। সুবোধচন্দ্র ২৭ কার্ত্তিক ১৩০৯ (১৩ নভেম্বর ১৯০২) তারিখে শমীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যান, কুঞ্জলাল ঘোষকে ঐদিনই বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী লিখে পাঠানো হয় (বর্তমান গ্রন্থভুক্ত পত্র,

পৃ. ১৬৩-৮০)। বর্তমান পত্রের রচনাকাল এর থেকেই অনুমান করা হয়েছে।

"কুঞ্জবাবু সম্বন্ধে কোনপ্রকার পূর্ব্বসংস্কার তোমরা মনে রাখিয়ো না—"
কুঞ্জলাল ঘোষের সঙ্গে বিদ্যালয়-পরিচালনা বিষয়ে তৎকালীন অধ্যক্ষসভার সদস্যদের (মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার) মতবিরোধ প্রসঙ্গ এই গ্রন্থের মনোরঞ্জনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৬ সংখ্যক পত্রের গ্রন্থপরিচয়ে (পৃ. ২৩০-৩৩) আলোচিত হয়েছে।

"Religious Systems এবং Origin of Aryans বই দুখানি পাঠাইলাম— "
উল্লিখিত প্রথম গ্রন্থটি বিষয়ে সম্ভাব্য চারখানি গ্রন্থের নাম করা গেল। এগুলির মধ্যে যে-কোনো একখানি বই রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে থাকতে পারেন।

Sonnenschem-রচিত, 'Religious Systems of the World / A Contribution to the Study of Comparative Religion' (1892), F.W. Hopkins, 'The Religion of India' (1895), M. Monier Williams, 'Religious Thought and Life in India' (4th edn. 1891), A. Barth, 'The Religions in India' (1889)।

অপর গ্রন্থটি I. 'Taylor. রচিত 'The Origin of the Aryans' (1889)।

⁝

"তাড শীঘ্র সম্পূর্ণ করিয়া দিবে। যত শীঘ্র পারি আমি ছাপার বন্দোবস্ত পাঠাইব।"

বিদ্যালয়ের আরম্ভকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি টেকনিক্যাল বিভাগ স্থাপন করার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ত্রিপুররাজ মহারাজ-কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে ১৩ শ্রাবণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে একটি চিঠিতে লিখছেন—

"বেশ শান্তির সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ চলিয়া যাইতেছে। কেবল অর্থাভাবে ও যন্ত্রাভাবে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না।" সেই বছরই, ৭ চৈত্র জানাচ্ছেন, "কারখানার উপযুক্ত একটি বড় ঘর বানাইতেছি— একজন বন্ধু আমাকে engine ও অন্যান্য যন্ত্র দিবেন কথা দিয়াছেন।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও জগদানন্দ রায়কে লেখা চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টার পরিচয় জানা যায়।

বিদ্যালয়ে হাতের কাজ শেখার ব্যবস্থা প্রথম পর্বে আরম্ভ হলেও অর্থাভাবে মাঝে মাঝে বন্ধ রাখতে হয়। পরবর্তীকালে, বিশ্বভারতী-পর্বে বিদ্যালয়ে তাঁত ও কাঠের কাজ শেখানোর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়।

পত্র ২। "আসন্ন ঝড়ের মুখেই তুমি বিদ্যালয়কে ছাড়িয়া আসিয়াছিলে। ইতিমধ্যে তাহার উপর দিয়া বিপ্লব চলিয়া গেছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্নী ও মধ্যমা কন্যার অসুস্থতার জন্য দীর্ঘকাল বিদ্যালয় থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হন। তাঁর অনুপস্থিতিকালে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তিনি অনেক রকম ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করলেও শৃঙ্খলা আনা সম্ভব হয় নি। সুবোধচন্দ্র যখন প্রথমবার বিদ্যালয় ছেড়ে যান (১৯০৩ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে), তখন রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ রেণুকাকে নিয়ে হাজারিবাগে, জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পরিচালন-দায়িত্ব অর্পিত, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের

শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন নি। রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে চিঠিপত্রে নানারকম পরামর্শ দিয়ে বিদ্যালয়ের স্থিতি ও শৃঙ্খলা ফেরানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন— আলোচ্য পত্রে সেই 'বিপ্লব'-কালের কথা তিনি স্মরণ করেছেন।

"—বন্ধুরাও ক্রমশ আকৃষ্ট হইতেছেন···"
বিদ্যালয়ের সূচনায় স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি ছাত্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেও দু-এক বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরিচিত বন্ধুমণ্ডলী ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ তাঁদের সন্তানদের এই বিদ্যালয়ে পাঠাতে আরম্ভ করেন। এইসময় বিদ্যালয়ের নিদারুণ অর্থকষ্ট চলছিল। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো সুহৃদ অর্থ-সাহায্য দিয়েও বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন।

এই চিঠি লেখার কয়েক মাস আগে ১৯০৩ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে, জগদীশচন্দ্র বসু, মোহিতচন্দ্র সেন ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। অনুমান করা যায়, এইসমস্ত বন্ধুদের কথাই রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে উল্লেখ করছেন।

পত্র ৩। আলোচ্য চিঠিখানিতে ভবেন্দ্রবাবুর বিদায়-প্রসঙ্গ ও রথীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পালনের উল্লেখ আছে।

১৮ কার্তিক ১৩১০ তারিখে লেখা একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখছেন, "ভবেন্দ্রবাবু ও গোপালবাবু এই দুটি বিজ্ঞাপনের লোক একেবারেই অযোগ্য। নিশিকান্ত এলে ভবেন্দ্রবাবুকে বিদায় করে দিতে হবে।"

ভবেন্দ্রনাথকে বিদায়দানের সময় ও রথীন্দ্রনাথের জন্মদিবস (১৩ অগ্রহায়ণ) —এই দুই তথ্যের ভিত্তিতে পত্ররচনার কাল অনুমিত।

"কই— সেই ইংরাজী রীডার কপি করিয়া পাঠাইলে না ?"

উল্লিখিত 'ইংরাজী রীডার' সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'ইংরাজি সোপান' (প্রকাশ ৭ মে ১৯০৪) বইয়ের পাণ্ডুলিপি। যে প্রণালীতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষা শেখানো হত তা পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পর্যায়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমার ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে বিশেষ সহায়তা লাভ করেন।

রাজেন্দ্রবাবু, ভবেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু :

রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্মী ও শিক্ষক, পরবর্তীকালে শিলাইদহে ঠাকুর পরিবারের দেবত্র সম্পত্তির নায়েব ও সেখানকার মাইনর স্কুলের শিক্ষক।

ভবেন্দ্রনাথ ১৩১০-১১ বঙ্গাব্দে কিছুকালের জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

নগেন্দ্রনারায়ণ রায় শিক্ষকরূপে ১৩১০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে যোগ দেন। প্রথম থেকেই তাঁকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৩১১ বঙ্গাব্দের পূজাবকাশে তিনি অন্যত্র চলে যান। 'দেশ' শারদীয় ১৩৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য। বর্তমান গ্রন্থে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৭৯-সংখ্যক পত্র-পরিচিতিতে (পৃ. ২৯৭-৯৮) তাঁর প্রসঙ্গ আছে।

"মাঝে মাঝে দিনু ও সন্তোষকে অধ্যাপনা সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে ভুলিয়ো না।"

এইসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এফ.এ., বি.এ. প্রভৃতি পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিতেন। শিক্ষক-

পরীক্ষার্থীরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সময়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে কিছু কিছু ক্লাস নিতেন।

"...যে কয়দিন তিনি আইন পড়ার উপলক্ষ্যে কামাই করিয়াছেন সে কয়দিনের বেতন কাটিবার প্রয়োজন নাই।"

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুপস্থিতি ঘটলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেতন কাটার নিয়মের দৃষ্টান্ত এখানে যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অভিভাবক ছাত্রের বেতন দিতে বিলম্ব করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দণ্ডদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকেই জানা যায়। ২৫ পৌষ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "—বিদ্যালয়ের নিয়মিত ব্যয় প্রতি মাসে আমাকে বহন করিতে হয়— একটা হিসাব করিয়া না চলিলে এক দিন বিদ্যালয়কে গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে উপনীত করা হইবে। অতএব বেতন সম্বন্ধে আমি অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়ম দৃঢ়ভাবেই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ প্রতি মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বেতন প্রত্যাশা করিব— দশ দিনের পর হইতে প্রত্যহ এক আনা দণ্ড গ্রহণ করা হইবে— সেই মাস পূর্ণ হইলেও বেতন না পাইলে পর মাসের ১৫ই তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় করিতে বাধ্য হইব। ছুটির সময়কার বেতন বাদ পড়িবে না।"[১]

'সাধারণী', 'নবজীবন' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র অচ্যুতচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। অচ্যুত বিদ্যালয়ে

১. দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ১০, পৌষ ১৩৯০, পৃ. ৯-১৫।

কিছুকাল অনুপস্থিত ছিল, অক্ষয়চন্দ্র পুত্রের অনুপস্থিতিকালের বেতন না দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

পত্র ৪। পত্রে উল্লিখিত দেশের সমসাময়িক সমস্যাবিষয়ে কলকাতা টাউন হলে বক্তৃতাটি "অবস্থা ও ব্যবস্থা"। রবীন্দ্রনাথ শুক্রবার, ২৫ আগস্ট ১৯০৫ (৯ ভাদ্র ১৩১২) তারিখ এই বক্তৃতাটি দেন। চিঠির শেষে বৃহস্পতিবারের উল্লেখ আছে। অনুমান করা হয়েছে, অন্তত এক সপ্তাহ আগে, ১৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার এই চিঠি লিখেছেন।

"মহারাজের টেলিগ্রাফ পাওয়া গেল…"
ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের টেলিগ্রাফ।

পালিত, সর্ব্বেশ, অরুণ, দেবল :
বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র যতীন্দ্রনাথ পালিত, সর্বেশচন্দ্র মজুমদার, অরুণচন্দ্র সেন, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল।

"রথী সন্তোষদের পড়া চলে? সেই জর্মান বন্ধুর কাছে জর্মান শিক্ষার চেষ্টা করচে কি?"
এইসময় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের গিরিডির বাসভবনে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র কিছুকাল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ২০ কার্তিক ১৩১১ তারিখে শ্রীশচন্দ্রকে জোড়াসাঁকো থেকে যে চিঠি লেখেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল—
"ব্রাহ্ম:

আমার পিতার শরীর ভাল নয়। এখন আমার কোথাও নড়বার জো নেই।… যে পর্য্যন্ত না ডেকে পাঠাই রথী সন্তোষদের তোমার কাছে রেখেই পড়িয়ো। তাদের এইটুকু বোলো যেন সমস্তদিনের কর্ত্তব্যের একটা কাল-পর্য্যায় ঠিক করে নিয়ে সেই অনুসারে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যায়। সংস্কৃত তর্জমা ও ব্যাকরণটা প্রত্যহই যেন চলে তাছাড়া

Buddhist India পড়ে ইংরাজিতে তার প্রত্যেক অধ্যায়ের একটা সংক্ষেপ মর্ম্ম লেখে। রামায়ণ মহাভারতটা বেশ অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন-পূর্ব্বক তার থেকে উদ্ধারযোগ্য তথ্যগুলি যেন উদ্ধার করে। এবং জার্ম্মান শিক্ষার প্রতিও অবহেলা না করে।..."

এইসময়ে শ্রীশচন্দ্রকে লেখা আরো কয়েকটি চিঠিতে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রকে জার্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে জানা যায়, ঐ সময় গিরিডি-নিবাসী Ehlers নামে এক জার্মান প্রতিবেশীর কাছে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন।

"সেই জমি নেবার কথা তোমার ন দাদাকে বলেছ ত ?"
এই প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৫৯-সংখ্যক চিঠি ও তার টীকা (পৃ. ২৮০-৮৩) দ্রষ্টব্য।

পত্র ৫। "সুরেনের একটি পুত্র লাভ হয়েছে—"
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবীরেন্দ্রনাথ (২৫ অক্টোবর ১৯০৫-২৪ জানুয়ারি ১৯৫৩)।

"শ্রীশবাবুকে বোলো গিরীন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে...স্টেশন থেকে ৪।৫ মাইলের মধ্যে যত সম্ভব জমি... সংগ্রহ করে রাখবার চেষ্টা যেন নিশ্চয়ই করেন—"
ছোটনাগপুরের নিসর্গসৌন্দর্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ তাঁর যৌবনকাল থেকেই। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী বালিকা ইন্দিরা দেবী ও ভ্রাতুষ্পুত্র বালক সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগে যে অবকাশ যাপন করেছিলেন তার একটি মনোরম আলেখ্য 'দশদিনের ছুটি' নামে ১২৯২ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যা 'বালক' পত্রে প্রকাশ করেন।

এরপর ১৩১০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ পীড়িতা মধ্যমা কন্যা রেণুকার ব্যাধি নিরাময়ের জন্য যখন হাজারিবাগ যান, 'সম্ভবত তখনই তাঁর মনে ঐ অঞ্চলে একটি নিভৃত বাসস্থান নির্মাণের ইচ্ছা অঙ্কুরিত হয়। ৩ ভাদ্র ১৩১০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে লিখছেন,

"হাজারিবাগের কাজ যদি তুমি পাও আমার জন্য বরাকর নদীতীরে শালবনবেষ্টিত একটি বৃহৎ ভূখণ্ড সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। এরূপ একটি জমি আছে— নিবারণবাবু ও গিরীন্দ্রবাবু তাহা আমার জন্য জোগাড় করিবেন আশা দিয়াছিলেন— কিন্তু তাঁহাদের নীরবতা ও নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া সন্দিহান হইয়াছি। ১০০।২০০ বিঘা জমি যদি পাই তবে আমি সেখানে আমাদের একটি বন্ধুপল্লী বসাইব। তাহা আমাদের তপোবন হইবে। তোমারও একটি কুটীর তাহার মধ্যে থাকিবে। সকলে মিলিয়া চাষবাস করিয়া গোরুবাছুর রাখিয়া বিশ্রব্ধ আলাপে এবং ভাবের চর্চ্চায় সুখে থাকিব। যদি এরূপ ভাল জায়গা অল্প নিরিখে স্বাস্থ্যকর নির্জন স্থানে তোমার জানা থাকে তবে নিশ্চয় আমার কথা স্মরণ করিয়ো— আমি এইরূপ আশ্রমের জন্য ব্যাকুল হইয়া আছি।..."

সুবোধচন্দ্রকে লেখা আলোচ্য চিঠিতেও দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের মনে হাজারিবাগ অঞ্চলে জমি কেনার আগ্রহ অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত। এর পরও প্রায় দু বছর রবীন্দ্রনাথ ছোটনাগপুর অঞ্চলের নানা জায়গায় ভূমি সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষ-চন্দ্রকে কৃষিকর্মে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এই গ্রন্থের ৫৯-সংখ্যক চিঠির টীকায় (পৃ. ২৮০-৮৩) রথীন্দ্রনাথকে কৃষিকর্মে প্রতিষ্ঠিত করা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

অক্ষয়। অক্ষয়কুমার বসু। ১৩১১ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে অল্পকাল শিক্ষকতা করেন।

গিরীন্দ্রবাবু। গিরীন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পীড়িতা কন্যা রেণুকাকে নিয়ে মার্চ ১৯০৩ খৃস্টাব্দে যখন হাজারিবাগে যান তখন গিরীন্দ্রবাবুর অতিথিরূপে তাঁর বাড়িতে ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে হাজারিবাগ থেকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, গিরীন্দ্রবাবু আমাদের যত্নে আচ্ছন্ন করে রেখেচেন। তিনি এ পর্য্যন্ত আমাদের কোন অভাব ঘটতে দেন নি— আমরা তাঁরই বাড়িতে আছি।"

শরৎ। শরৎকুমার চক্রবর্তী। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার (বেলা) স্বামী।

পত্র ৬। "তোমার বিপদের সংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইয়াছি।"
সুবোধচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা রমার অকালমৃত্যুর বিষয় এখানে উল্লেখ করেছেন।

সমীর। সমীরচন্দ্র মজুমদার। সুবোধচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র।

"একবার প্রমথর সঙ্গে সেই বিবাহ প্রস্তাবটার পুনরালোচনা করিয়া দেখিয়ো।"
দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা মীরা দেবীর বিবাহদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল যাবৎ নানা সূত্রে পাত্রের সন্ধান করছিলেন। বর্তমান পত্রে প্রমথ চৌধুরীর যোগাযোগে পাত্র-সন্ধানের প্রসঙ্গ জানা যায়।

কেদার দাসগুপ্ত। কেদারনাথ দাসগুপ্ত (১৮৭৮-১৯৪২) বাংলাদেশে স্বদেশী-আন্দোলনের সময় কলকাতায় ৭ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী সামগ্রীর একটি দোকান খোলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সূত্রে তাঁর পরিচয় হয়। পরে কেদারনাথ দেশবাসীকে

স্বদেশীভাবে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় 'ভাণ্ডার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর উপর ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ায় তিনি স্বদেশ ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে চলে যান। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারকল্পে কেদারনাথ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় 'Union of East and West' নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উদ্যোগে লণ্ডনে ও আমেরিকায় বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনীত হয়, ১৯১২ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন তখন এই সমিতি তাঁকে সংবর্ধনা জানান।

কেদারনাথ দাসগুপ্ত ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগের বিষয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড ও সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থের 'ভাণ্ডারের কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৩০-সংখ্যক চিঠির টীকাতেও (পৃ. ২৫৬-৫৭) বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচিত।

B. L. Chowdhury।

বনোয়ারীলাল চৌধুরী (?)। দ্রষ্টব্য, শ্রীসিদ্ধার্থ ঘোষ -সংকলিত, সুকুমার রায় -রচিত 'বিলেতের আরো চিঠি', সংখ্যা ৬।— 'এক্ষণ' গ্রীষ্ম ১৩৯১, পৃষ্ঠা ৭, ৬৯।

পত্র ৭। তারিখহীন। চিঠির শেষে 'শুক্রবার ১৩১৩' এরূপ উল্লেখ আছে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের শেষভাগে যে এই চিঠিটি লেখা হয়েছে তা 'তাঁর ইচ্ছা তিনি গ্রীষ্মাবকাশের অবশিষ্ট কয়দিন বোলপুরে যাপন করেন'— এই বাক্য থেকে অনুমিত।

'বুধবারে আমার প্রবন্ধপাঠের কথা হচ্ছে'— ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩, বুধবার, রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ওভারটুন হলে 'শিক্ষাসমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই চিঠিখানি এর পূর্ববর্তী শুক্রবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে লেখা, এ রকম অনুমান করা হয়েছে।

"মোহিতবাবু, তাঁর স্ত্রী ও দুই শিশুকন্যা..."
মোহিতচন্দ্র সেন, সুশীলা সেন, মীরা ও উমা।

"যে ঘরে মীরা, পিসিমা আছেন সেইখানেই তাঁদের থাকবার বন্দোবস্ত করতে হবে,...
পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবী ও কন্যা মীরা যে ঘরে ঐসময়ে ছিলেন সেটি শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রবেশমুখে 'নতুন বাড়ি'র একখানি ঘর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ও পুত্রকন্যাদের বসবাসের জন্য খড়ের চালার এই মাটির ঘর ক'খানি তৈরি করিয়েছিলেন। মৃণালিনী দেবীর দূর-সম্পর্কিত পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবী রবীন্দ্রনাথের মাতৃহীন শিশুসন্তানদের অভিভাবিকা হিসেবে এই ঘরে থাকতেন।

"প্রজ্ঞার আমিষ আহারের বইটা (অর্থাৎ ২য় খণ্ড) চেয়ে পাঠিয়েছে..."
প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা, স্বামী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। উল্লিখিত গ্রন্থ 'আমিষ ও নিরামিষ আহার', প্রকাশ ১৩ আশ্বিন ১৩১৪, হাওড়া। নূতন সংস্করণ, সম্বলপুর, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ। নিরামিষ বিভাগ ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড; আমিষ বিভাগ ৩য় খণ্ড, সংক্ষিপ্ত।

"আমার বাসস্থানটি এতদিনে বোধহয় অনেকটা সমাপ্তির দিকে গেছে..."
'নতুন বাড়ি'-সংলগ্ন রবীন্দ্রনাথের আবাসগৃহ 'দেহলি' নির্মাণের প্রসঙ্গ।

পত্র ৮। "এক লক্ষ্মীছাড়া শিবাজি মেলা নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আটক পড়েছে, [পড়েছি] কাজেই তার পরে শুক্রবারে প্রবন্ধ পাঠ করে শনিবারে আমি খালাস পাব।"

দেশবাসীকে স্বদেশচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য মহারাষ্ট্রে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে সখারাম গণেশ দেউস্কর কলকাতায় মহারাষ্ট্রের এই শিবাজী উৎসবকে বঙ্গদেশে প্রচলনে উদ্‌যোগী হন। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ "শিবাজী উৎসব" কবিতা রচনা করেন, আশ্বিন ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রে তা প্রকাশিত হয়।

শিবাজী মোঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মহারাষ্ট্রে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন; সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ভারত-বাসীর গৌরব বোধ না করারই কথা। সম্ভবত এইজন্য, শিবাজীকে অখণ্ড ভারতবর্ষের সংহতির পথিকৃৎরূপে গ্রহণ করা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে সংশয় ছিল।

শিবাজী উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় পান্তির মাঠে (বর্তমানে বিধান সরণীর বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রাবাস অঞ্চল) ৪ জুন থেকে ৮ জুন ১৯০৬ স্বদেশী শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্রের তিন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি— বালগঙ্গাধর তিলক, গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে ও মুঞ্জের উপস্থিতিতে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে কলকাতায় এই উৎসব পালিত হয়। মূল অনুষ্ঠান হয় মঙ্গলবার ৫ জুন, অশ্বিনীকুমার দত্তের সভাপতিত্বে। রবীন্দ্রনাথ-রচিত "শিবাজী উৎসব" কবিতাটি পাঠ করেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবে যোগ দেন নি। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল-রচিত 'রবিজীবনী' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড (১৩৯৭) দ্রষ্টব্য। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'কংগ্রেস' (দ্বিতীয় সং ১৩২৮) ও শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউমা মুখোপাধ্যায়ের *India's*

Fight for Freedom গ্রন্থে তৎকালীন আন্দোলন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

পত্রে যে প্রবন্ধ পাঠের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, তা তাঁর "শিক্ষাসমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধ, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ (৬ জুন ১৯০৬) বুধবার ওভারটুন হলে পঠিত এবং 'ভাণ্ডার' পত্রের জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরেন বৃহস্পতিবার ২৪ জ্যৈষ্ঠ।

"উমাচরণকে তা হলে ৮ই পাঠাতে হবে।··· তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো নইলে সে ভয় পাচ্ছে।···"

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপককে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন (দ্রষ্টব্য, শারদীয় দেশ ১৩৪৯, পৃ. ৪০২), "বর্ধমানে আমার ভৃত্য উমাচরণ [নন্দী] পুলিশের কবলে অন্তর্ধান করাতে আমি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি— বাহনবিহীন গণপতির মত আমার অচল অবস্থা— আশা করি সুবোধচন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিয়া যথাসময়ে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে— কাল বৃহস্পতিবারে দার্জিলিং মেলে কলিকাতা ছাড়িব— তাহার মধ্যে বাহনটি যদি না পৌঁছে তবে দুস্তর প্রবাসসমুদ্রে সহায়হীন অবস্থায় ভাসিয়া পড়িব।···"

···"জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষায়··· কেবল উপেন আর সুজিতকে ·· পাঠান সঙ্গত হবে।"

বাংলাদেশে ১৯০৫-০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে প্রথম থেকেই বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের জন্য তিনি প্রশ্নপত্রও রচনা করেন, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে তা সংকলিত হয়েছে।

এই চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, বিদ্যালয়ের কোনো কোনো ছাত্রকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। পত্রে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর মধ্যম ভ্রাতা সুজিতকুমার চক্রবর্তীকে সে বছর রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষার্থীরূপে পাঠানোর জন্য অনুমোদন করেছেন। অনুমান করা যায়, এই ব্যবস্থা স্বল্পকালই স্থায়ী হয়।

"তারকবাবুরা আমাকে ধরেছেন··· সানোসান যদি তাঁদের টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জুজুৎসু শেখান···।"

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অন্যতম উদ্যোক্তা, প্রখ্যাত আইনজীবী স্যর তারকনাথ পালিত ১৯০৬ খৃস্টাব্দে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে কারিগরি শিক্ষার একটি বিদ্যালয় কলকাতায় আপার সার্কুলার রোডে স্থাপন করেন; পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠান যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং এর নতুন নামকরণ হয় 'কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজি'।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সেইসময় রবীন্দ্রনাথ জুজুৎসু শিক্ষা ব্যবস্থার যে আয়োজন করেন, তার দৃষ্টান্তে তারকনাথ তাঁর টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষিত করতে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন।

সানো সান। কুসুমতো॥ জাপানী জুজুৎসু-শিক্ষক সানো সান সম্বন্ধে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৩৪-সংখ্যক পত্রের পরিচিতি অংশে (পৃ. ২৫৯) সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র সত্যরঞ্জন বসু 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' (১৩৬৮) গ্রন্থে "আশ্রম-স্মৃতি" রচনায় সানো সান ও কুসুমতো সম্বন্ধে যে স্মৃতিকথা লিখেছেন তা উদ্‌ধৃত হল—

"আমরা জুজুৎসু-বিশারদ সানো সান-এর কাছে জাপানী মল্লবিদ্যা শিক্ষা করি। কী সুগঠিত গৌরবর্ণ দেহ অথচ সাধারণ জাপানীদের মত খর্বাকৃতি নয়। শান্ত প্রকৃতি মৃদুভাষী, কত যত্ন নিয়েই কুস্তি

শেখাতেন। বিশেষ ধরনের— মোটা মো-স্মৃতি খদ্দরের মত মোটা 'কিমানো' পরতে হত সে সময়ে।…"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রও সানো সানের কাছে জুজুৎসু শিক্ষা করেন। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের "স্বদেশী আন্দোলন" অধ্যায়ে রথীন্দ্রনাথ তাঁদের জুজুৎসু শিক্ষার কথা বর্ণনা করেছেন।

পূর্ব-উল্লিখিত গ্রন্থে সত্যরঞ্জন বসু কুসুমতো সম্বন্ধে লিখেছেন— "জাপানী ছুতার কুসুমতো সান্ কাঠের কাজ শেখাবার জন্যে এসেছিলেন সানো-সান্-এর আগে। তাঁর কাজের একাগ্রতা ও একক করণ-পদ্ধতি আমাদের খুবই তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল। কাজের সময় কথাবার্তা একদম বলতেন না। আমরা ছিলাম তাঁর কাঠের [কাজের ?] জোগানদার। তাঁকে কুসুমবাবু বলে সকলে ডাকতো। বেশ আলাপী ও সদাহাস্যমুখ। অল্পদিনের মধ্যেই দুখানা নৌকা তৈরী করলেন। কাঠ বাঁকানো ও জোড়া দেওয়ার পদ্ধতি নতুন ধরনের। একখানার তলদেশ চেপ্টা— নামকরণ হল 'চিত্রা', আর একখানা 'সোনার তরী' শিরতোলা তলদেশ। কুসুমবাবু কিছুদিন আগরতলায় আর্টিজেন স্কুলে কাঠের কাজ শিখিয়েছিলেন।"

সত্যরঞ্জন, নরেন খাঁ। সত্যরঞ্জন বসু, ত্রিপুররাজ্য থেকে আগত তৎকালীন ছাত্র।[1] 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে (১৩৬৮) "আশ্রম-স্মৃতি" প্রবন্ধে সত্যরঞ্জন রবীন্দ্রনাথ ও সে-যুগের শান্তিনিকেতন-আশ্রমের একটি আলেখ্য রচনা করেছেন।

নরেন্দ্রনাথ খাঁ তৎকালীন ছাত্র।

পত্র ৯। "মীরার Sohrab Rustam পড়া শেষ হইলে তাহাকে টেনিসনের Enoch Arden পড়াইতে শুরু করিয়ো।"

Mathew Arnlod-এর *Sohrub Rustum* এবং Tennyson-এর *Enoch Arden* জাতীয় কাব্য সাধারণত শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও এ ধরনের বিষয় পড়াতে দ্বিধা করেন নি। তিনি নিজে ক্লাস নেওয়ার সময় Sohrab Rustum কবিতার যে পাঠনপ্রণালী তৈরি করেছিলেন, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্রবীক্ষা' দ্বাদশ সংকলনে (৭ পৌষ ১৩৯১) তা সংকলিত হয়েছে। 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ' (৭ই পৌষ ১৩৮৮) সংকলনগ্রন্থের পরিশিষ্ট ৪ (পৃ. ১৬৫-২২৪) অংশে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি শিক্ষাদান-প্রণালী বিষয়ে তৎকালীন কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংকলন করা হয়েছে।

পত্র ১০। এই চিঠি লেখার তারিখ নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলির উপর নির্ভর করে অনুমান করা হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র সেনকে ১৩ কার্তিক ১৩১৩ বঙ্গাব্দে বোলপুর থেকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, "ভূপেন্দ্রবাবু অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায় বর্দ্ধমানে পড়িয়া আছেন— কাল তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম।...

আমি অগ্রহায়ণে বিদ্যালয় [খুলিলে] দিন পনেরো কাজকর্ম চালাইয়া দিয়া বোটে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছি—"

২৭ কার্তিক ১৩১৩ বঙ্গাব্দে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোলপুর থেকে লিখছেন,

"যদি আপনাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তবে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে একবার পদ্মার আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব।"

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কিছুদিনের জন্য শিলাইদহ অঞ্চলে বিশ্রামের জন্যে গিয়েছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের চলে যাওয়ার যে প্রসঙ্গ এই চিঠিতে আছে, তা তাঁর অসুস্থতার জন্য সাময়িক অনুপস্থিতি। ভূপেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজ থেকে বিদায় নেন ১৩১৫ বঙ্গাব্দে।

কাওয়াগুচি। জাপানদেশীয় পণ্ডিত ও পরিব্রাজক। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে কলকাতায় এসে থাকার সময়ে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। কাওয়াগুচির লেখা *Three Years in Tibet* নামে ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সত্য। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৯-১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীর পুত্র।

"আমার প্রাসাদ কতদূর এগোলো ?"
'দেহলি' বাড়ির দোতলার ঘর বলে অনুমান করা যেতে পারে।

পত্র ১১। "মহারাজের স্টেটে তুমি কর্মে প্রবেশ করিয়াছ শুনিয়া আমি অত্যন্ত সুখী ও নিরুদ্বিগ্ন হইলাম।"
সুবোধচন্দ্র ১৯০৮ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে যখন শিলাইদহে ছিলেন, ঐ সময় একটি শোচনীয় দুর্ঘটনায় তাঁর শিশুকন্যা লতিকার মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২৪ পৌষ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখছেন,
"এখানে সুবোধের ঘরে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ভূপেশ সর্বদাই একটা পিস্তলে গুলী ভরিয়া বীররসের চর্চা করিয়া এবং নিরীহ চখাচখিগুলিকে ক্ষত ও হত করিয়া আনন্দ অনুভব করে। সুবোধের এক আত্মীয় ভূপেশের হাত হইতে সেই ভরা পিস্তল লইয়া সুবোধের ছেলেমেয়েদের খেলাচ্ছলে ভয় দেখাইতেছিল— তাহারা তখন ভূপেশের কোলে বসিয়াছিল, গুলি ছুটিয়া গিয়া লতুর কপালের মধ্যে প্রবেশ

করে। তখন সুবোধ আমার কাছে বোটে কাজে নিযুক্ত ছিল। ফিরিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই লতুর মৃত্যু হইয়াছে।"[1]

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে ২ মাঘ ১৩১৪ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "সুবোধ অত্যন্ত অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে এখানে ফিরিয়া আসিয়া কাজে যোগ দিতে অক্ষম এইরূপ আমাকে জানাইয়াছে— বোধ করি জয়পুরে বা দিল্লীতে কোনো কাজের আশা পাইয়া থাকিবে।"

সুবোধচন্দ্র দেশীয় রাজ্য জয়পুরে কাজে যোগ দেন।

"আমি এখানকার গ্রাম্যসমাজ স্থাপনার চেষ্টায় এখনো আবদ্ধ আছি।…" কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪) পর থেকে রবীন্দ্রনাথ কয়েকমাস শিলাইদহ অঞ্চলে বাস করছিলেন, এই নিদারুণ মৃত্যুশোক অন্তরে নীরবে সহ্য করেও তিনি 'গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজস্থাপন' চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৫০-সংখ্যক পত্রের পরিচয় (পৃ. ২৭১-৭৫) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য পত্রে গ্রাম্যসমাজ স্থাপনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গ থেকে যে 'উৎসাহী যুবকে'র কথা লিখেছেন, তিনি পল্লীউন্নয়নকর্মে পরবর্তী-কালে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী কালীমোহন ঘোষ। অপর যে যুবকের প্রসঙ্গ আছে, তাঁর পরিচয় জানা যায় নি।

ভূপেশ। ভূপেশচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র রায়ের অনুজ।

পত্র ১২। "যদি শাখাপরিষৎ স্থাপন করবার উদ্যোগ কর…"
অনুমান করা যায়, সুবোধচন্দ্র জয়পুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা

১. দেশ, রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯

স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে সেখানে যাওয়ার জন্ম আহ্বান করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং বাংলার বাইরেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধে (প্রকাশ, 'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১৩১২। 'আত্মশক্তি' গ্রন্থভুক্ত) লিখেছেন—

…"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয় লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতেছেন। এই পরিষদ্‌কে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রহণ করিয়াছেন।…"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা বাংলাদেশের বাইরে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে স্থাপিত হয়।

এই চিঠি থেকে এরকম অনুমান করা চলে, জয়পুর-অঞ্চলের প্রবাসী বাঙালিসমাজ পরিষদের শাখা স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিলেন। সুবোধচন্দ্র তাঁদের পক্ষ থেকে এই সভাস্থাপনে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ও সহায়তার আশায় তাঁকে জয়পুর যেতে অনুরোধ করেন, কিন্তু নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না বলে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তা আহ্বান করার উপদেশ দেন।

পত্র ১৪। অধ্যাপক বকিল।

বোম্বাইয়ের অধিবাসী, পার্শী, জাহাঙ্গীর জীবাজী ভকিল ১৯২৪ খৃস্টাব্দে বিশ্বভারতীতে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। কিছুকাল তিনি বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগ 'শিক্ষাভবনে'র অধ্যক্ষতা করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অধ্যাপক ভকিলের ইংরেজি এবং বাংলাভাষাতেও কিছু কিছু রচনা তৎকালে সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে নানা কারণে, অধ্যাপক ভকিল শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিয়ে বোম্বাইয়ে ফিরে যান। আলোচ্য চিঠিতে, রবীন্দ্রনাথ ভকিলের বিশ্বভারতীর কর্মে থেকে যাওয়ার কোনো কোনো অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্মসচিব প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে ২৭ ভাদ্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন—

"নতুন ব্যবস্থায় যাদের বিদায় করতে হবে তাদের জানান দিতে যতই দেরি করবে ততই বৃথা লোকসান বাড়ানো হবে। ভকিলের মতো অধ্যাপক, যাদের কাজ প্রায় কিছুই নেই, অথচ মাইনে বড়ো কম নয়, তাদের আর বহন করা আর্থিক হিসাবে ভাল নয় অন্য হিসাবেও অশোভন।"

জাহাঙ্গীর ভকিল সম্ভবত ১৯২৮ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে বোম্বাই প্রদেশে ফিরে যান। পরে তাঁর পত্নীর সহযোগিতায় শান্তিনিকেতনের আদর্শে তিনি পুনাতে 'Childrens' Own School (পরবর্তীকালে Pupils' Own School) নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

…"চলেছি য়ুরোপে— ইংলণ্ডে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আছে।"

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতাদানের জন্য ১৯২৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ড যাত্রা স্থির ছিল। শারীরিক কারণে এই ইউরোপ যাত্রা স্থগিত করে কলম্বো থেকে তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২৩ জুন ১৮৬৭ - ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৯) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় তাঁর এক নিকট-আত্মীয়, জোড়াসাঁকো সেরেস্তার কর্মচারী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। হরিচরণ তখন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে সেকালের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। যদুনাথের অনুরোধক্রমে রবীন্দ্রনাথ এইসময় তাঁকে লেখাপড়ার জন্য কিছুকাল আর্থিক সহায়তা করেন।

১৩০৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদুনাথের অনুরোধে পতিসর কাছারিতে জমিদারি সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করেন। সেই বছর ভাদ্র মাসেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকরূপে পতিসর থেকে হরিচরণকে বোলপুরে নিয়ে আসেন।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে হরিচরণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী 'সংস্কৃত প্রবেশ' (১-৩ ভাগ) রচনা করেন। এই পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রকাশকালে (১৯০৪ খৃ) সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

…"বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিত হইলে পর, সেখানকার ছেলেদের যখন সংস্কৃতশিক্ষার সুপ্রণালী অনুসরণ আবশ্যক বোধ করিলাম, তখন আদর্শস্বরূপ সংস্কৃত প্রবেশ কিয়দংশ লিখিয়া, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে উহা শেষ করিবার জন্য সমর্পণ করিয়া দিলাম।"

'সংস্কৃত প্রবেশ' পুস্তক রচনাকালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা ভাষার একটি অভিধান রচনায় প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দ থেকে হরিচরণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকর্মের অবসরকালে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রণয়ন আরম্ভ করেন। এই কাজ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আর্থিক অসংগতির কারণে হরিচরণকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে, ১৩১৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে কলকাতার একটি কলেজে

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাস

কাজ নিতে হয়। এই সময় তাঁর অভিধান সংকলনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ হরিচরণকে তাঁর অভীষ্ট কর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। হরিচরণ তিন মাস পর শান্তিনিকেতনে ফিরে পুনরায় স্বস্থানে স্বকার্যে অভিনিবিষ্ট হন। এর পর সুদীর্ঘকাল নিরলস পরিশ্রম করে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে তিনি এই বৃহৎ কোষগ্রন্থ সংকলন সমাপ্ত করেন। এরপরও দশ বৎসর তাঁর পক্ষে গ্রন্থমুদ্রণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নি; এইসময় তিনি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংস্কারে প্রবৃত্ত ছিলেন।

এই অভিধান রচনা ও প্রকাশ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন এখানে সেটি সংকলিত হল—

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আপনাদের অধ্যাপক হরিচরণ একখানি বাংলা অভিধান রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন— আপনারা যাহা চান ইনি তাহাই করিয়া তুলিতেছেন। ব্যাপারখানি প্রকাণ্ড হইবে। একবার দেখিয়া দিবেন। যদি পছন্দ হয় তবে এটা লইয়া কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিবেন। বাংলাসাহিত্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হয় না এমন শব্দও ইহাতে স্থান পাইয়াছে সেইটে আমার কাছে সঙ্গত বোধ হয় না। মোটের উপর এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে। ইতি ২০শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিধান সংকলনের কাজ সমাপ্ত করলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের আনুকূল্য কামনা করে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন—

"শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত বিশ বছর ধরিয়া বাংলা অভিধান রচনায় নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ অভিধান বাংলায় নাই। এই পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে আমরা প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছি। এই বৃহৎকর্ম্ম সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রকাশ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশের পাঠক-সাধারণ এই কার্য্যে আনুকূল্য করিয়া বাংলা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিবেন একান্তমনে ইহাই কামনা করি।" (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭)

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রকাশের ব্যয়বহন বিশ্বভারতীর পক্ষে সেই সময়ে সম্ভবপর না হওয়ায়, হরিচরণ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ও অপরিসীম সাহস সম্বল করে নিজেই এই গ্রন্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে প্রকাশ করতে থাকেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়, শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে।

'আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক'— রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনা হরিচরণের মধ্যে যথার্থভাবে সত্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর কর্মের ক্ষেত্রে তিনি আজীবন সাধকের ব্রতই উদ্‌যাপন করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেই হরিচরণ এইভাবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে যে-সমস্ত শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপের প্রয়োজন সর্বদাই দেখা দিত। হরিচরণ কখনো পরিচালন-ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না; সম্ভবত এই কারণে এবং কতকটা হরিচরণের স্বভাবগত সংকোচের ফলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ বিরল। এ-পর্যন্ত তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি

পত্রেরই সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপভাবে হরিচরণেরও মাত্র একখানি পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের স্মৃতি, শান্তি-নিকেতন আশ্রম-জীবনের কথা, তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা, এ-ছাড়া অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধনিবন্ধ তখনকার অনেক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন -প্রসঙ্গ এবং আত্মস্মৃতিমূলক রচনাসমূহের অধিকাংশই 'রবীন্দ্রনাথের কথা' (১৯৪৫ ?) ও 'কবির কথা' (১৩৬১) এই দুটি গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন-প্রসঙ্গে তাঁর রচনা যে-সমস্ত সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়, সেগুলির একটি নির্বাচিত পঞ্জী এখানে দেওয়া গেল—

শান্তিনিকেতন পত্র : আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৩

প্রবাসী : অগ্রহায়ণ ১৩৪৮; জ্যৈষ্ঠ, মাঘ, চৈত্র ১৩৪৯; বৈশাখ, ভাদ্র ১৩৫০; মাঘ ১৩৫৫; অগ্রহায়ণ ১৩৫৬; মাঘ ১৩৬৩; ফাল্গুন ১৩৬৪

মাতৃভূমি : শ্রাবণ, আশ্বিন ১৩৫২

দেশ : ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯; ১৫ মাঘ ১৩৫০; ১০ মাঘ ১৩৫৪; ৪ মাঘ ১৩৫৫

গাঙ্গেয় : বৈশাখ ১৩৬৩

শ্রীসুদর্শন : ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

এগুলি ছাড়াও দ্রষ্টব্য, ১ বৈশাখ ১৩৫১ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে হরিচরণকে 'সশ্রদ্ধ অর্ঘ্যদানে'র উত্তরে তাঁর পঠিত ভাষণ 'আশীর্বাদ'।

বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে (পৃ. ২০২-০৯) 'শান্তিনিকেতন'

পত্রের আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমার পরিচয়' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগের পরিচয়রূপে মুদ্রিত হল।

সংযোজন

বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট ১ অংশের বিবরণে (পৃ. ১৮২), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথকে লিখিত কোনো পত্র পাওয়া যায় নি, এরূপ বলা হয়েছে। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে হরিচরণের রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্র (তারিখহীন) পরে লক্ষগোচর হওয়ায় সেটি এখানে মুদ্রিত হল।

ওঁ

সুখচর

১লা বৈশাখ

শ্রীচরণেষু

গুরুদেব, আজকার দিনে আমার অন্তরের প্রণাম গ্রহণ করুন এবং নববর্ষের স্নেহাশীষ প্রদান করুন।

আশা করি, আপনার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। আমার শরীর বর্ত্তমানে বড়ই খারাপ। নিবেদন ইতি

সুখচর পোঃ প্রণত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪ পরগণা

কুঞ্জলাল ঘোষ 'সহায়শ্রেণীভুক্ত' কর্মীরূপে শিবনাথ শাস্ত্রী -প্রতিষ্ঠিত কলকাতার সাধনাশ্রমে (প্রতিষ্ঠা ১৮৯২ খৃস্টাব্দ) ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে যোগ দেন ও পরে 'সংকল্পাধীন পরিচারক'রূপে আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বীরভূম জেলার নলহাটির অধিবাসী ছিলেন, এরূপ জানা যায়। ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রীর কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

কুঞ্জলাল ঘোষ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে, আনুমানিক কার্তিক মাসের শেষে অথবা অগ্রহায়ণের আরম্ভে, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯০২ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, "কুঞ্জবাবু শীঘ্রই বোলপুরে যাইবেন। আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপনাকার্য্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।...

বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার আমি আপনাদের তিনজনের উপর দিলাম— আপনি জগদানন্দ ও সুবোধ। এই অধ্যক্ষসমিতির সভাপতি আপনি ও কার্য্য-সম্পাদক কুঞ্জবাবু। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা পাশ করাইয়া লইবেন এবং সকল কাজেই আপনাদের নির্দ্দেশমত চলিবেন।..."

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ যখন পীড়িতা মধ্যমা কন্যার স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় শান্তিনিকেতন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই পর্বে, বিদ্যালয়-পরিচালন-দায়িত্ব অনেকাংশে কুঞ্জলালের উপর অর্পণ করা হয়। অধ্যাপনার কাজেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

কুঞ্জলালকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি মাত্র একখানিই পাওয়া গিয়েছে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ইতিহাস-আলোচনায় ২৭ কার্তিক ১৩০৯ বঙ্গাব্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

কুঞ্জলাল অল্পকালই এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনুমান করা যায় কোনো কারণে তাঁর কাজে রবীন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হন। বিদ্যালয় থেকে কুঞ্জলালের বিদায়গ্রহণপ্রসঙ্গে মোহিতচন্দ্র সেন ১০ জুলাই [১৯০৩] তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, "কুঞ্জবাবুকে বিদায়পত্র দিয়াছেন শুনিয়া দুঃখিত এবং আশ্বস্ত দুই হইলাম। আমাদের এ সাধনায় 'গড়িতে ভাঙ্গিয়া গেল বারবার'। সেইজন্যে দুঃখ। যা' হোক কুঞ্জবাবু শ্রাবণের আরম্ভেই যাবেন এটা সুখবর। ভেঙ্গে যখন গেল তখন জীর্ণ রাবিস্ যতশীঘ্র স্থানান্তরিত হয় ততই ভাল।"

২৪ জুলাই শুক্রবার [১৯০৩] মোহিতচন্দ্র আর-একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, "রমণীবাবুর কাছে শুন্‌লাম যে যদুবাবু কুঞ্জবাবুকে বোলপুরে বিদায় দেবার সময় শ্রাবণের মাহিনা ও furniture বাবদে ৮০্ অতিরিক্ত দিবেন বলিয়াছেন।..."

কুঞ্জলাল ঘোষ ১৩১০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসের শুরুতেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

কুঞ্জলাল ঘোষকে ২৭ কার্তিক ১৩০৯ বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে লেখা কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী এই চিঠিখানির বিষয়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, "বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য প্রণালী সম্বন্ধে আমি বিস্তারিতভাবে ইঁহাকে লিখিয়াছিলাম। এই লেখা আপনারাও পড়িয়া দেখিবেন— যাহাতে তদনুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইঁহাকে সেইরূপ সাহায্য করিতে পারেন।" 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (প্রকাশ ৭ই পৌষ ১৩৫৮) গ্রন্থে কুঞ্জলালকে

লেখা এই চিঠি বিষয়ে যে পরিচয় মুদ্রিত, তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল—

"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর-বৎসরই লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সৌজন্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে; 'রবীন্দ্রজীবনী'কার অনুমান করেন, 'ইহাই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম constitution বা বিধি।' এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন— 'শান্তিনিকেতনের কাজে ১৯০৮ সালে যোগ দিই। কী আদর্শ লইয়া রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং কিভাবে তিনি ইহার পরিচালনা চাহেন এখানে আসিয়া তাহা জানিতে চাহিলে তিনি একখানি সুদীর্ঘ পত্র আনিয়া আমাকে দেন। পত্রখানি কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী, এবং আগাগোড়া নিজের হাতে লেখা। তাহাতে ছাত্রদের প্রতিদিনকার কর্তব্যগুলি রীতিমতো হিসাব করিয়া-করিয়া লেখা। তখন বিদ্যালয়ের একেবারে প্রাথমিক পর্ব। তখনই যে তাঁহার অন্তরে শিক্ষাজীবনের পরিপূর্ণ মূর্তিটি দেখা দিয়াছিল এই পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি লেখা কবিগুরুর পত্নীবিয়োগের মাত্র দিনদশেক পূর্বে— খুব উদ্‌বেগের একটি সময়ে, পত্রশেষে তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। তবু এই পত্রে যে সূক্ষ্ম বিচার ও খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি দেখি তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।'"

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত

…"হেমেন্দ্রবাবুর পুত্র প্রেমানন্দের…" পৃ ১৬৫।

রায়পুরের হেমেন্দ্রনাথ সিংহের পুত্র, বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র প্রেমানন্দ সিংহ। পরবর্তীকালে প্রেমানন্দ বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার কারণ হয়।

"শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংশ্রব প্রার্থনীয় নহে।" পৃ. ১৭২।

'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (১৩৫৮) গ্রন্থে এই অংশের পুলিনবিহারী সেন -লিখিত টীকা নিম্নরূপ—

"বাংলা ১২৬৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জমির পাট্টা লইয়াছিলেন; ১২৯৪ সালে 'নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্ত একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে' ও তাহার অনুকূলকার্যসম্পাদনার্থে মহর্ষি এই সম্পত্তি ট্রস্টীদিগের হাতে অর্পণ করেন ও এই আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থে আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'এই ট্রস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্মের উন্নতির জন্ত ট্রস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।' পরে ১৩০৮ সালে মহর্ষির অনুমতিক্রমে তাঁহার ধর্মদীক্ষা-বার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন; এ ক্ষেত্রে 'আশ্রম' বলিতে উক্ত ট্রস্ট অনুযায়ী পূর্বাগত ব্যবস্থা, ও 'বিদ্যালয়' বলিতে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম বুঝিতে হইবে। পরে আশ্রম ও বিদ্যালয় সাধারণত সমার্থক হইয়াছে।"

"সম্প্রতি নানা উদ্বেগের মধ্যে আছি⋯"। পৃ ১৭৯।

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র রচনাকালে (২৭ কার্তিক ১৩০৯) তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী মৃত্যুশয্যায়। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে।

গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রে প্রকাশের সূচী

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, ৯৯ ও ১০৩ -সংখ্যক বাদে ১০১ খানি পত্র 'স্মৃতি' (১৯৪১ ?) গ্রন্থ থেকে সংকলিত। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রখানি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কথা' (১৯৪৫ ?) গ্রন্থ থেকে গৃহীত। কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা পত্র বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ও পরে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (৭ই পৌষ ১৩৫৮) সংকলন-গ্রন্থে মুদ্রিত।

সুবোধচন্দ্র মজুমদারের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র ছাড়া অন্যান্য পত্রগুলি 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত ; নীচে তার সূচী দেওয়া হল—

পত্র	প্রকাশ কাল
১	অগ্রহায়ণ ১৩৬৭
২	চৈত্র ১৩৬৭
৩	মাঘ ১৩৬৭
৫-৬	বৈশাখ ১৩৬৮
৭	ফাল্গুন ১৩৬৭
৮	পৌষ ১৩৬৭
৯	আষাঢ় ১৩৬৮
১০	শ্রাবণ ১৩৬৮
১১	আশ্বিন ১৩৬৮
১২	জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
১৩	পৌষ ১৩৬৭
১৪	ভাদ্র ১৩৬৮

ব্যক্তিপরিচিতি

'গ্রন্থপরিচয়' অংশের বিভিন্ন স্থানে যে-সমস্ত ব্যক্তিপ্রসঙ্গ আছে, এখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা-সহ সেগুলির নির্দেশ এবং যথাস্থানে কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া যায় নি ব'লে সেগুলি এখানে দেওয়া হল। গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো কোনো ব্যক্তির পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

অক্ষয়। অক্ষয়কুমার বসু। দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৩২৪

অক্ষয়বাবু। অক্ষয়চন্দ্র সরকার। পৃ. ২৩৪-৩৫

অচ্যুত। অচ্যুতচন্দ্র সরকার। পৃ. ২২৮, ৩২১-২২

অজিত। অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮)। তরুণবয়সে রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ করে এবং রবীন্দ্রসান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অজিতকুমারের যে গভীর শ্রদ্ধা জন্মে, তার ফলে বি. এ পাস করবার পরই তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। সমস্ত দিক থেকে ছাত্রদের হৃদয় উদ্‌বোধিত করার ক্ষমতা অজিত-কুমারের যেমন ছিল তার সঙ্গে একমাত্র তাঁর সুহৃদ সতীশচন্দ্র রায়ের তুলনা করা চলে। রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারের প্রতিভার কথা নানাভাবে স্মরণ করেছেন। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে উভয়ের মধ্যে নিবিড় যোগের বিবরণ পাওয়া যাবে। অজিতকুমার রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা রূপে স্বীকৃত। তাঁর সম্বন্ধে পরিচয়ের জন্য 'ভারতকোষ' প্রথম খণ্ডে পুলিনবিহারী সেন লিখিত অজিতকুমার চক্রবর্তী 'নিবন্ধ' এবং ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্যসংখ্যা 'দেশ' পত্রে 'ভক্ত ও কবি' দ্রষ্টব্য।

অরু। অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র।

অরুণ। অরুণচন্দ্র সেন। পৃ. ৩২২

প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। পৃ. ৩২৭

প্রমথ। প্রমথ চৌধুরী।

প্রেম'প্রেম সিংহ। প্রেমানন্দ সিংহ। পৃ. ২২৭, ৩৪৫

প্রেমদাস। পৃ. ২৭০

পিসিমা। রাজলক্ষ্মী দেবী। মৃণালিনী দেবীর দূর-সম্পর্কিত পিসিমা। ১৯০২ খৃস্টাব্দে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা দেবীর অভিভাবকতা ও তত্ত্বাবধানের জন্ত শান্তিনিকেতনে আসেন। 'নতুন বাড়ি'তে রাজলক্ষ্মী দেবী শমীন্দ্র ও মীরাকে নিয়ে থাকতেন, রথীন্দ্রনাথ থাকতেন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে।

বকিল। জাহাঙ্গীর বকিল। পৃ ২৪৫, ৩৩৬

বড়দাদা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বড়দিদি। সৌদামিনী দেবী।

বিজয়বাবু। বিজয়রত্ন মজুমদার। সাহিত্যিক, ওড়িশার সম্বলপুরের ব্যবহারজীবী ছিলেন। পৃ ৩৭০

বিদ্যার্ণব। শিবধন বিদ্যার্ণব। পৃ ২২৫-২৭

বেলা। মাধুরীলতা, রবীন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা।

ব্যোমকেশ। ব্যোমকেশ মুস্তফী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই ব্যোমকেশ মুস্তফী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মসূত্রে নিবিড়ভাবে যুক্ত হন। প্রতিষ্ঠানের গৃহনির্মাণ থেকে আরম্ভ করে গ্রন্থাগার চিত্রশালা ইত্যাদি স্থাপনায় তাঁর নিরলস পরিশ্রম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ১৩০২ বঙ্গাব্দে ব্যোমকেশ পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচিত হন, পরবর্তীকালে সহকারী সম্পাদকরূপে কর্মভার গ্রহণ করেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থলে পরিষদের শাখা-সভা স্থাপন করে তিনি তাঁর উদ্যোগ ও কর্মকুশলতার পরিচয়

দিয়েছেন। সাহিত্যকর্মে, সাময়িকপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনায় তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

বৌ-ঠাকরুণ। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহধর্মিণী যুগলমোহিনী দেবী। দ্র. সুবোধচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, সংখ্যা ৪, ৫।

বৌমা। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের সহধর্মিণী শৈলবালা দেবী। দ্র সুবোধ-চন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, সংখ্যা ১৩।

ভবেন্দ্রবাবু। ১৩১০।১১ বঙ্গাব্দে কিছুকালের জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। মোহিতচন্দ্র সেনকে ১৮ কার্তিক ১৩১০ বঙ্গাব্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে ভবেন্দ্রনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃ ৩২০

ভোলা। সরোজচন্দ্র মজুমদার। শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র, রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র। সরোজচন্দ্রের মৃত্যুর (১০ আষাঢ় ১৩১৭) পর প্রকাশিত 'সরোজ-স্মৃতি' গ্রন্থে (প্রকাশ, আশ্বিন ১৩১৮) তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় সংকলিত হয়েছে। ষোল বৎসর বয়সে সরোজচন্দ্রের যখন মৃত্যু হয় তখন তিনি প্রবেশিকা বর্গের ছাত্র ছিলেন।

ভূপেনবাবু। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের শিক্ষক।

ভূপেশ। ভূপেশচন্দ্র রায়। পৃ. ৩৩৪

মনোরঞ্জনবাবু। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ. ২১৩-১৭

মীরা। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী। পৃ. ২২৯

মেজ বৌঠান। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী।

মোহিতবাবু। মোহিতচন্দ্র সেন। পৃ. ২৪৮, ২৫২

যোগেন্দ্রবাবু। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৭৬

রথী। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ২১৮

রবীন্দ্রনাথ সিংহ। পৃ. ২২৮

রমণী। রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৯-১৯১৯)। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ জামাতা। কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের উচ্চকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ট্রাস্ট ডীড সম্পন্ন করেন (১২৯৪ বঙ্গাব্দ), রমণীমোহন তার অন্যতম ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ ১৩১০ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠন করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও মোহিতচন্দ্র সেনের সঙ্গে রমণীমোহন তার সদস্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনোনয়নে রমণীমোহন ১৩১০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন, কিন্তু বিশেষ কারণে কার্যকাল শেষ হবার আগেই কলকাতা পৌরসভার কাজে ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা পৌরসভার সহ-সভাপতি পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

রাজেন্দ্রবাবু। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্মী ও শিক্ষক। পরে, শিলাইদহে ঠাকুর পরিবারের দেবত্র সম্পত্তির নায়েব ও সেখানকার মাইনর স্কুলের শিক্ষক। পৃ ৩২০

রাণী/রেণুকা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা। পৃ. ২২৭, ২২৪

রেবাচাঁদ (অণিমানন্দ)। পৃ. ২২১-২২

লরেন্স সাহেব। পৃ. ২৪১-৪৩

শমী। শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ২২৯, ২৬৮

শরৎ। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃ. ২৫৩, ৩২৫

শ্রীশবাবু। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। পৃ. ২৭৫

শ্রীশবাবুর দ্বিতীয়া কন্যা। অরুণা দেবী। পৃ. ২৬৫

শৈলেশ। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। পৃ. ২৫৮-৫৯

সত্য। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৯-১৯৩৩)। পৃ. ৩৩৩

সত্যরঞ্জন। সত্যরঞ্জন বসু। পৃ. ৩৩১

বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের পক্ষ থেকে পুলিনবিহারী সেন ১৯৭৮ খৃস্টাব্দে তৎকালীন উপাচার্য মহাশয়ের কাছে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের প্রস্তাব করেন। শিক্ষকগণের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগদানের কাল অনুসারে কয়েকখণ্ডে চিঠিপত্রগুলি পর পর প্রকাশিত হবে, এই রকম স্থির হয়। তাঁর এই পরিকল্পনা বিশ্বভারতী অনুমোদন করেন এবং পুলিনবিহারী সেন শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের শিক্ষক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও জগদানন্দ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পরবর্তী খণ্ডে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা চিঠিপত্র সংকলনের দায়িত্ব বর্তমান সংকলয়িতাদের উপর অর্পিত হয়।

'চিঠিপত্র' ত্রয়োদশ খণ্ডে পূর্ব-উল্লিখিত চারজন শিক্ষকের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সঙ্গে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র-কন্যার কাছে লেখা কয়েকখানি চিঠিও অন্তর্ভুক্ত হল। যে চারজন শিক্ষকের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হল, এঁরা ১৯০১-০৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত মূল পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। মনোরঞ্জন তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী 'স্মৃতি' গ্রন্থে (প্রকাশ ১৯৪১) সংকলন করেছিলেন। 'স্মৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত হয় নি, এরূপ একখানি চিঠি (১০৩-সংখ্যক), এ ছাড়া শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবীকে

লেখা রবীন্দ্রনাথের তিনখানি চিঠি, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'Santiniketan Reminiscence', রবীন্দ্রনাথকে লেখা মনোরঞ্জনের একখানি চিঠি ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর একখানি চিঠি শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে।

সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি মূল পত্র (৪-সংখ্যক) রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। 'কথাসাহিত্য' পত্রের অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ থেকে আশ্বিন ১৩৬৮ সংখ্যায় অবশিষ্ট পত্রাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়: এগুলির মূল সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নি। যে আকারে পত্রগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এখানে তারই অনুসরণ করতে হয়েছে। 'স্মৃতি'গ্রন্থ এবং 'কথাসাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত অনেক চিঠিই বর্তমান গ্রন্থ সংকলনকালে পুনর্বিন্যস্ত। তারিখহীন চিঠিগুলি বিন্যাসের সময় পত্ররচনার স্থানকালের যে অনুমান করা হয়েছে, 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে যথাস্থানে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আছে। সংকলিত চিঠিগুলির কোনো ক্ষেত্রেই কোনো অংশ বর্জন করা হয় নি।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত মূল পত্রাবলী সহ বিভিন্ন উপাদান রবীন্দ্রভবন-কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে। পুলিনবিহারী সেন এই কাজে নানাভাবে উৎসাহিত করে গিয়েছেন, অনুরূপভাবে নানাভাবে সহযোগিতা করে গিয়েছেন শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত, বর্তমান সংকলনভুক্ত ৫৭-সংখ্যক ছিন্ন পত্রখানির সম্ভাব্য পাঠোদ্ধার করে দিয়েছেন শ্রীকানাই সামন্ত ও পুলিনবিহারী সেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজের সূচনা থেকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীশঙ্খ ঘোষ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের কর্মভার নিয়ে থাকার সময় সমগ্র পাণ্ডুলিপি পূর্বাপর ধৈর্যসহকারে দেখে সম্পাদনা বিষয়ে

যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যথাসাধ্য তার অনুসরণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল অনেকগুলি পত্ররচনার কাল নির্ধারণ করতে সহায়তা করেছেন ; এ ছাড়া আমাদের অজ্ঞাত বেশ-কিছু তথ্যের সন্ধানও দিয়েছেন। কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রের অবিকল প্রতিলিপি পাওয়া গিয়েছে শ্রীসুনীল দাসের সৌজন্যে। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি তথ্য জানিয়ে সহায়তা করেছেন। শ্রীসুবিমল লাহিড়ী এই গ্রন্থ মুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে যথারীতি সম্পাদনাকর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের অনুকূলতায় গ্রন্থনবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ ও প্রুফের আদান প্রদান সহজতর হয়েছে। অন্যান্য অনেক বিষয়ে অনেকের সাহায্য গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে উল্লিখিত। এঁদের সকলের প্রতি সংকলয়িতাগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

সংকেত

মূল পত্রের বানান পূর্বাপর রক্ষা করা হয়েছে। শুধু কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির অবিকল প্রতিলিপি পরে পাওয়ায়, মুদ্রিত অংশের সকল ক্ষেত্রে মূল বানান অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় নি, গ্রন্থশেষে শুদ্ধিপত্রে মূল বানানের রূপটি দেখানো হল। ছিন্ন পত্রের পাঠের সম্পূর্ণতার জন্য এবং অর্থবোধের জন্যও যে-সমস্ত জায়গায় যোগ করতে হয়েছে সেখানে তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহৃত।

পত্র-সংখ্যার নীচে ছোটো হরফে ছাপা তারিখ চিঠির অংশ নয়। তারিখ সম্পর্কে সংশয় থাকলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় পোস্টমার্ক থেকে তারিখ নেওয়া হয়েছে। এইরূপ জায়গায় তারিখটি তারকাচিহ্নিত, ডাকঘরের নির্দেশও দেওয়া আছে। একটি ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই 'পোস্টমার্ক' বলতে চিঠি ডাকে দেওয়ার স্থান এবং তারিখ ধরতে হবে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানির পোস্টমার্কে চিঠিখানি পাওয়ার স্থান ও তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	১০	অমি	আমি
২৮	৩	সম্পূর্ণভাবে	সম্পূর্ণভাবে
৬১	৮	বৃ্যহে	ব্যূহে

পত্র ৮৬. পৃ. ১১২। পত্ররচনাস্থল কলিকাতা স্থলে শান্তিনিকেতন হবে। রবীন্দ্রনাথ ৩ নভেম্বর ১৯২৭ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন। ৬ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে থাকার প্রমাণ আছে। ৮ তারিখে তিনি এখান থেকে অনেককে চিঠি লিখেছেন। শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল এই তথ্য আমাদের জানিয়েছেন।

কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত পত্র। প্রথম ও চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংশোধন তিনটি মুদ্রণপ্রমাদ, বাকি সমস্তই মূল পত্রের বানান।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৩	২	উন্মত হইয়াছে	উন্মত হইয়াছেন
	৫	পূর্বেই	পূর্ব্বেই
১৬৪	৬	কার্য	কার্য্য
	২২	লঘুচিত্ত	লঘুচিত্তে
১৬৫	৮	ভালো	ভাল
	১৯	লেখা	খেলা
১৬৬	৭	নির্ধারিত	নির্দ্ধারিত
	১০	কোনো	কোন
১৪৭	১৭	মুহূর্তে	মুহূর্ত্তে
	১৮	মুহূর্তেই	মুহূর্ত্তেই
	২১	কোন সূত্রে	কোন্ সূত্রে
১৬৮	২১	সর্বাপেক্ষা	সর্ব্বাপেক্ষা
১৭০	১৪	ভো	

১৭২	১০	তরকারির	তরকারীর
১৭৩	১৭	কোনো	কোন
	২৩	পোষ্টকার্ড	পোষ্টকার্ড্
১৭৪	১৫	কোনো	কোন
১৭৫	৩	ক্রমশ	ক্রমশঃ
	৭	স্বতঃউৎসারিত	স্বতউৎসারিত
	১২	সর্বদা	সর্ব্বদা
১৭৬	১১	চাপানো	চাপান
	২২	সর্বদা	সর্ব্বদা
	২৩	কাহারও	কাহারো
		দাবি	দাবী
১৭৮	২৩	করানোই	করানই

গ্রন্থপরিচয়

২২৯	২১	তারিখথীন	তারিখহীন
২৩২	১০	সুরু হয়ে	শুরু হয়
২৪৬	৩	কিছুকাল ওকালতি-কর্মে প্রতিষ্ঠালাভ করার চেষ্টা করেন' স্থলে হবে-	কিছুকাল শিক্ষকতা করেন এবং আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।
২৭১	৯	মজুমদার	মজুমদারের
২৭৩	১৯	[তথ্যর]	[তথ্য]
২৭৪	১৩	পূজার	পূজার
২৭৭	২৪	অশ্রাব্য	অগ্রাহ্য
২৯৩	২০	দুর্ভিক্ষ	দুর্ভিক্ষ
২৯৭	১৬	বণিত	বর্ণিত
৩১৪	১৭	উল্লেখ	উল্লেখ